ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাও
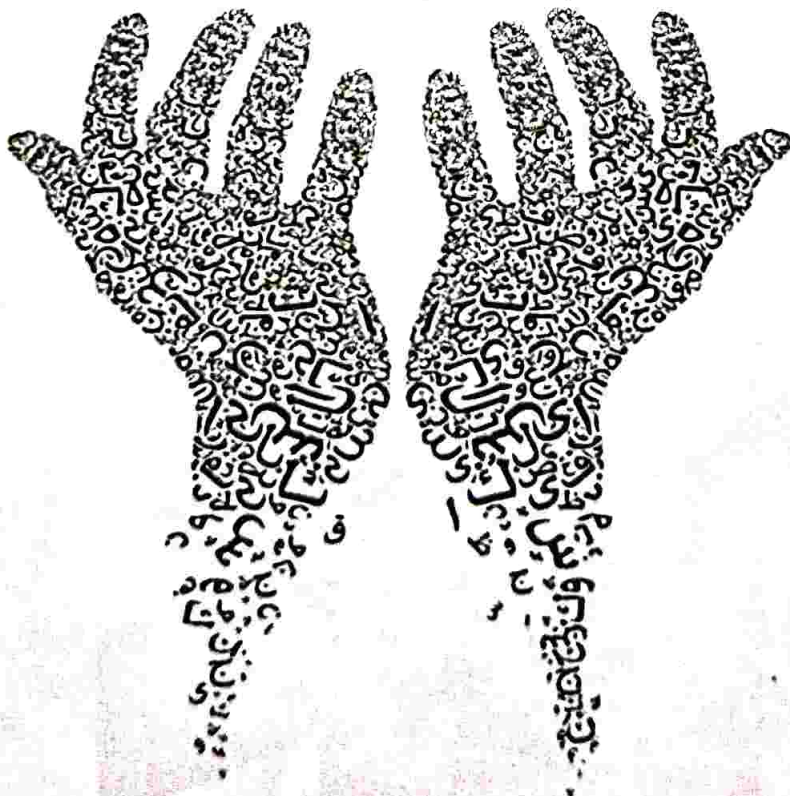
মাহমুদুল হাসান।
জন্ম ২৩ জুন ১৯৮২। গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত শাহরাস্তি থানার দেবকরা গ্রামে। পিতা মো. আবুল হোসেন ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক; সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। যেখানেই গেছেন লেফট-রাইট আর দড়াম আওয়াজের স্যালুট তার পিছু পিছু ছুটেছে। পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের ইচ্ছে ছিল তাকে সেনা অফিসার বানানোর। কিন্তু নাতিকে হাফেয বানানোর অসিয়ত ছিল মরহুম দাদা ওসমান গণির। মা ফেরদৌস বেগমের আশাও ছিল তাই। সুতরাং রাইফেল-উর্দির স্বপ্নকে চিরতরে বিদায় দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল হিফজখানায়। ভর্তি হতে হয়েছিল ঢাকা জেলার শেষ প্রান্তে সাভারের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা- জামেয়া মাদানিয়া রাজফুলবাড়িয়ায়। হিফজ শেষ করে কিতাব বিভাগের প্রথম ক্লাশে পড়া অবস্থায় দীর্ঘ এক বন্ধ কেটেছিল দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে। সে বাড়ির বুক সেলফ থেকে প্রথমে নানা রকম বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল তার। চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দিয়েছিল বুক সেলফের সেই বইগুলো। পরে নজরুল ইসলাম পথিক নামের নিভৃতচারী এক সাহিত্যিক সুহৃদের মাধ্যমে লেখালেখির হাতেখড়ি ও প্রাথমিক কসরতটা হয়েছিল।
উপরি উক্ত মাদরাসা থেকেই তিনি ২০০৫ সালে দাওরায়ে হাদিস পাস করেছেন। শিক্ষকতাও করেছেন সেই মাদরাসায়। এখনো নিয়োজিত আছেন একই পেশায়।

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হুসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাও

মূল
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর
মাওলানা মাহমুদুল হাসান
শিক্ষক, মাহাদুর রাবেয়া দারুল উলুম গোয়ালদী
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

মূল
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মাওলানা মাহমুদুল হাসান

প্রকাশনা
৮৮ [অষ্টআশি]

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০২০

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৪০০ টাকা মাত্র

ইহদা

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হাফেজ হাবিবুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ
এর সুস্থতাপূর্ণ দীর্ঘ হায়াত কামনায়।
–অনুবাদক।

সূচি

আমাদের কথা

মাথার উপর আসমান, পায়ের নীচে জমীন। এই দুয়ের মাঝে আছে অসংখ্য সৃষ্টি। এসব আল্লাহ ﷻ বানিয়েছেন আমাদের জন্য। মানুষের জন্য। এজন্য সূর্য আমাদেরকে আলো ও তাপ সরবরাহ করে। রাতের অন্ধকারে চাঁদ দেয় কিরণ। খেতের ফসল, নদী-নালার মাছ ও বিভিন্ন স্থলজ প্রাণী আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। পানি আমাদের তৃষ্ণা মেটায়। বাতাস আমাদের জীবন সচল রাখে।

প্রশ্ন হচ্ছে দুনিয়ার সবকিছু মানুষের জন্য, তা হলে মানুষ কীসের জন্য? এই প্রশ্নের জওয়াব আল্লাহ ﷻ কুরআন মাজীদে এভাবে দিয়েছেন–

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

> আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য। [সূরা যারিয়াত : ৫৬]

কিন্তু মানুষ তার সৃষ্টিরহস্য ভুলে গেছে। তারা এখন দুনিয়া উপার্জন নিয়ে ব্যস্ত। উলামায়ে কেরাম তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় মূল কাজে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করছেন।

যেসব আলেমে দীন এই সময়ে ইসলামের দাওয়াতী কাজে খুব জোরদার মেহনত করছেন, তাঁদের মধ্যে সৌদী আরবের ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী অন্যতম। তাঁর অনেকগুলো বইয়ের বাংলা অনুবাদ ইতোমধ্যে আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছি। আল-হামদু লিল্লাহ। এখন তাঁর লেখা পুস্তক– رِحْلَةُ حَيَاةٍ এর অনুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

আশা করি, আমাদের অনূদিত লেখকের অন্যান্য বইয়ের মত এটিও পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে এবং মুসলমান পাঠক আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে অগ্রসর হবেন।

পাঠকের হাতে যেকোন বই তুলে দিয়ে আমরা Feedback (প্রতিক্রিয়া) জানার জন্য অপেক্ষায় থাকি। এজন্য আমাদের বই পড়ে আপনার অনুভূতি জানিয়ে বাঁধিত করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

অনুবাদক ও অন্য যাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে এই বই আলোর মুখ দেখল, তাদের সবার জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ থাকল। আল্লাহ ﷻ তাদেরকে আরও ভালো ভালো কাজ করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

বইটি পড়ে কেউ যদি আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতের দিকে ফিরে আসেন, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
১৫/০২/১৪৪১ হি. (১৫/১০/১৯ ইং)

আস্তিক-নাস্তিক চিরন্তন দ্বন্দ্ব

চমৎকার একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। গল্পটি অবিশ্বাসীদের নিয়ে। যারা স্বীকার করে না আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্ব। মানতে চায় না তাঁর শ্রেষ্টত্ব। বিশ্বাস করে না তাঁর এককত্ব। চমৎকার এই গল্পটিতে রয়েছে তাদের ভ্রান্ত দাবীর অসারতার প্রমাণ। রয়েছে নাস্তিকদের বিপক্ষে পূর্বসূরী আলেমদের মোকাবেলার দাস্তান। কেমন ছিল সে যুগের নাস্তিকেরা? কেমনই বা ছিলেন আমাদের পূর্বসূরীরা? কোন কৌশলে তারা দমন করতেন নাস্তিকদের? এখনও কি আছে সেই নাস্তিকদের উত্তরসূরীরা? কেমন হতে পারে তাদের সাথে বর্তমান বিতর্কের ধরণ? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে গল্পটিতে।

নাস্তিকদের হাতে আছে এখন ইন্টারনেট, ব্লগ, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়াসহ নানাবিধ প্রচার মাধ্যম। যেগুলোর মাধ্যমে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ছাড়াচ্ছে বিষবাষ্প। চালাচ্ছে অপপ্রচার। পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলেমদের থেকে পাওয়া কৌশলকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমরা নস্যাৎ করতে পারি তাদের সেসব চক্রান্ত? তাদের মোকাবেলায় কীভাবে সংগ্রহ করতে পারি শরঈ প্রমাণাদি? গল্পটির পরতে পরতে রয়েছে তার অনুপম শিক্ষা।

তাহলে বলছি সেই সত্য সুন্দর গল্পটি—

ফিকাহ শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম আবু হানিফা ﵀। সোমানীয়দের সাথে চলছে তার বিতর্ক। এরা ছিল নাস্তিক। আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদে অবিশ্বাসী। আকস্মিক দুর্ঘটানায় সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র জগত সংসার— এমনই ছিল তাদের দাবি। এই আকাশ-মাটি, গ্রহ-নক্ষত্র, এই

পাহাড়, সাগর, ঝর্ণা, নদী সবই সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার হঠাৎ সৃষ্টি। নিপুন এই সৃষ্টিরাজির নেই কোন স্রষ্টা– এমনই তাদের বিশ্বাস।

ইমাম আবু হানিফা ﵀ তাদের দাবি অস্বীকার করলেন। কিন্তু তারা অনড়। বিষয়টি নিয়ে দুপক্ষের মাঝে চলতে থাকল কথা কাটাকাটি। আলোচনা হতে লাগল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

ইমাম আবু হানিফা ﵀ বললেন, বেশ, আগামী দিন এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত হল, এটি হতে হবে বাদশাহর দরবারে।

নাস্তিকেরা রাজি হল। পরদিন অনুষ্ঠান স্থলে সবাই হাজির। তবে এখনো আসেননি ইমাম আবু হানিফা ﵀। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা নেই তার। নাস্তিকের দল চরম বিরক্ত। তারা মুসলমানদেরকে বলতে লাগল, কোথায় তোমাদের ইমাম? এখনও আসছেন না কেন তিনি? তিনি তো দেখছি ওয়াদা রক্ষাকারী নন। অথচ তাকেই তোমরা তোমাদের ইমাম বলে মানো?

আসলে ইমাম আবু হানিফা ﵀ ইচ্ছে করে দেরি করছিলেন। জ্ঞানীদের কোন কাজই জ্ঞান-শূন্য নয়। অবশেষে তিনি এলেন। তাকে দেখে নাস্তিকেরা বলে ওঠল, কী ব্যাপার, আপনি এতো দেরি করলেন কেন? আপনি তো বলে থাকেন আল্লাহ আছেন। আপনি তাঁকে ভয় করেন। বিশ্বাস করেন যে, একদিন দাঁড়াতে হবে তাঁর সামনে। দিতে হবে সব কাজের হিসাব। আজ কোথায় গেল আপনার সেসব বিশ্বাস?

ইমাম আবু হানিফা ﵀ বললেন, ভাইয়েরা! আপনারা শান্ত হোন। দয়া করে আমার বিলম্বের কারণটা শুনুন। আসলে আমি এখানে আসার জন্য যথাসময়েই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে এসে দেখলাম কোনো নৌকা নেই।

নৌকা না পেলে আপনি এলেন কিভাবে? জানতে চাইল এক নাস্তিক।

সে এক আশ্চর্য ঘটনা। ইমাম আবু হানিফা ﵀ বলতে লাগলেন। নৌকা না পেয়ে আমি আশেপাশে দেখছিলাম। দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে

বিচলিত হচ্ছিলাম। কোনোভাবে যেন একটা নৌকার ব্যবস্থা হয়ে যায়– মনে মনে আল্লাহ ﷻ-র কাছে সেই দোআ করছিলাম। ঠিক তখনি ঘটল আশ্চর্য সেই ঘটনাটি। হঠাৎ প্রচন্ড ঝড় শুরু হল। সাথে বজ্রপাত। আচানক বিশালাকায় একটি বজ্র আঘাত হানল একটি গাছের ওপর। বজ্রটি এতোটাই বৃহৎ ছিল যে, মনে হচ্ছিল গোটা একটা বাড়িই সে ভস্ম করে দিতে পারবে। বজ্রের আঘাতে গাছটি দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। তার এক অংশ পড়ল তীরে। আরেক অংশ নদীতে। তারপর দেখলাম একটি লোহার খন্ড এসে হাজির। কোথা থেকে সেটি এলো বুঝতে পারলাম না। এরপর দেখি গাছের একটি ডাল এসে সেই লৌহ খন্ডটির ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেটি পরিণত হয়ে গেল ধারালো এক কুঠারে। সবকিছু খুবই দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল। গাছের যে অংশটি নদীতে পড়েছিল কুঠারটি স্বয়ংক্রীয়ভাবে তাতে আঘাত করতে লাগল। দেখতে দেখতে তৈরী হয়ে গেল ছোট্ট একটা নৌকা। এরপর নদীর পানিতে ভেসে এলো দুটি তক্তা। সাথে এলো গাছের চিকন দুটি ডাল। অতঃপর এদের একটি অপরটির সাথে মিলে গেল। আমি অপলক চোখে দেখেই যাচ্ছিলাম। আচানক তক্তা দুটি নৌকার ডানে বামে জুড়ে গিয়ে তৈরী হল পাল। এভাবেই তৈরী হয়ে গেল পূর্নাঙ্গ একটি নৌকা। এরপর নৌকাটি আমার কাছে এলো। আমি তাতে ওঠে বসলাম। নৌকাটি একাই চলতে লাগল। আমাকে নদী পার করে দিল। তাই আমার আসতে খানিকটা বিলম্ব হয়ে গেল। আচ্ছা, চলুন আমাদের মূল আলোচনা শুরু করা যাক– এ জগত সংসার কিভাবে সৃষ্টি হল? এটি কি হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় সৃষ্টি হয়েছে, নাকি এর রয়েছে কোনো স্রষ্টা?

নাস্তিকেরা বলল, চুপ করুন। আপনি আমাদের এ কেমন ঘটনা শোনালেন? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? নাকি পাগল হয়ে গেছেন আপনি?

না, আমি মোটেই পাগল হইনি। আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি।

তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, একাকি একটি পূর্ণাঙ্গ নৌকা তৈরী হয়ে যাবে? আচ্ছা, যদি আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করে নেই যে, হ্যাঁ, সত্যিই বজ্রপাতে একটি গাছ দিখন্ডিত হয়ে এক অংশ নদীতে

আরেক অংশ তীরে পড়ে ছিল। তদুপরি কোনো সুস্থ বিবেক কি করে এ কথা মেনে নেবে যে, গাছের সেই দু'টি অংশ থেকে সয়ংক্রীয়ভাবেই নৌকা তৈরী হয়ে গেছে। একটি নৌকা তৈরী করতে প্রয়োজন হয় কত কিছুর। আলকাতরা লাগানো, দাড় টানা, পাল ওঠানো– এসবের জন্য প্রয়োজন হয় কত মানুষের। এসব ছাড়া একটি নৌকা একাকী কি করে হঠাৎ তৈরী হয়ে যেতে পারে? এটা কিভাবে সম্ভব?

ইমাম আবু হানিফা ﵀ বললেন, সুবহানাল্লাহ! ক্ষুদ্র একটি নৌকা হঠাৎ আপনা আপনি সৃষ্টি হয়ে গেছে– এটা আপনারা মানতে পারছেন না, অথচ আপনাদের দাবি আসমান-জমিন, পাহাড়-সাগর, বন-বনানি, নদী-নালা, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মানব-দানব– এ সবকিছুর কোন স্রষ্টা নেই। আপনারা বলছেন এগুলো হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা ﵀'র বুদ্ধিদৃপ্ত এই জবাবে নাস্তিকেরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সত্যিই আল্লাহ ﷻ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

ইউরোপ : নাস্তিক্যবাদের আঁতুড়ঘর

প্রিয় ভাই-বোনেরা! আফসোস! ইউরোপ হল নাস্তিক্যবাদের আঁতুড়ঘর। সেখান থেকে এটি ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র মুসলিম জাহানে। ইউরোপের দেশগুলোতে এই মতাবাদের সূচনা ও বিকাশ অসম্ভব নয়। কারণ, এসব দেশের অধিবাসীরা ধর্ম বিমুখ। তারা ঈসা আ. কে আল্লাহ ﷻ-র পুত্র জ্ঞান করে। অথচ আল্লাহ ﷻ-র সন্তান থাকার বিষয়টিকে কোনো সুস্থ বিবেক কখনো সায় দিতে পারে না। তাছাড়া সেখানকার মানুষগুলো প্রবৃত্তি-পূজারী। বিশেষ করে যুবক-

যুবতীরা। তারা নানাভাবে তাদের যৌন পিপাসা নিবারণে ব্যস্ত। ধর্মের প্রতি নেই তাদের কোনো আগ্রহ। তাই তারা নাস্তিক্যবাদকে আপন করে নিয়েছে। কারণ, তারা নিজ খেয়াল-খুশি মতো চলতে চায়। জগতের সব সুখ-শোভা ভোগ করতে চায়। চায় যা ইচ্ছা খেতে। যা খুশি পান করতে। যেভাবে ইচ্ছা যৌন ক্ষুধা মেটাতে। যখন ইচ্ছা ঘুমাতে। যখন ইচ্ছা জাগতে।

সুতরাং, তাদেরকে যদি বলা হয় যে, এটা হারাম। ওটা নিষিদ্ধ। এটা খেও না। ওটা পান করো না। পরকালে তোমাকে আল্লাহ ﷻ-র সামনে দাঁড়াতে হবে। এ অন্যায় কাজগুলো তুমি কেন করছ– এগুলোর ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। তোমার কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। তারা এসব উপদেশ কানে তোলবে না। কারণ এগুলো মানতে গেলে তারা তাদের স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করতে পারবে না। তাই তারা আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্ব অস্বীকারের পথ বেছে নিয়েছে। কারণ, তাদের বল্গাহীন জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ গতিময়তা অটুট রাখার জন্য এটিই একমাত্র সহজতর উপায়। তাদের নাস্তিক্যবাদের প্রতি আকৃষ্টির এটিই প্রধান কারণ।

একটি পরিসংখ্যান

বর্তমানে ইউরোপের দেশগুলোতে নাস্তিক্যবাদের দ্রুত প্রসার ঘটছে। মনে পড়ছে, প্রায় দশ বছর আগে আমি ইউরোপের একটি দেশে গিয়েছিলাম। দেশটির পতাকা ছিল ক্রুশখচিত। অর্থাৎ, সেটি একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র। আমি দেশটির প্রতিটি মোড়ে মোড়ে গির্জার উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। তুমি যদি সে দেশটির রাস্তাঘাটগুলো ঘুরে বেড়াও তাহলে এর প্রতিটি বাকে বাকে ঈসা ﵇-র প্রতিকৃতি দেখতে পাবে। যদিও এগুলো ঈসা ﵇-র বাস্তব প্রতিকৃতি নয়।

আমি সে দেশের একটি পরিসংখ্যান দেখলাম। পরিসংখ্যানটি সেদেশের কিছু জনগণের ওপর জরিপ চালিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। জরিপকালে তাদের কাছে যে প্রশ্নগুলো রাখা হয় তা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন এমন ছিল–
আপনার ধর্ম কি?

মাত্র ১৩% লোক এর জবাবে বলেছিল, তাদের ধর্ম খিস্টান।

আপনি কি জীবনে কখনো গির্জায় গিয়েছেন? হতে পারে সেটা শিশুকালে কিংবা ছাত্রাবস্থায় অথবা বিবাহ উপলক্ষ্যে বা অন্য কোনো সময়?

মাত্র ৭% লোক জবাব দিয়েছিল যে, তারা জীবনে একবার হলেও গির্জায় গিয়েছে।

আপনি কি প্রতি সপ্তাহে গির্জায় যান?

মাত্র ১% লোক এর জবাবে 'হ্যাঁ, বলেছিল।

সেখানে অবস্থানকালে আমাদের কাছে প্রত্যেক জুমার দিন আসর সালাতের পর বৃটেন, ফিলিপাইন ও আমেরিকার অনেক নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করতে আসত। তাদের বয়স অধিকাংশেরই বয় ছিল ৩০ বা ৪০ এর ঘরে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম জীবনে কতবার গির্জায় গিয়েছেন?

জবাবে তারা বলতো- একবারও না।

তাই তাদের নাস্তিক্যবাদের প্রতি ধাবিত হওয়া আমাকে অবাক করে না। তাদেরকে ধর্মবিমুখ দেখে আমি আশ্চর্য হই না। কিন্তু হে আমার ভাই! হে আমার বোন! তোমার আছে ইসলামের মতো মহান সত্য ধর্ম। যা আল্লাহ ﷻ-র কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্মও বটে। যে ধর্মে বলা হয়েছে অন্তরে বিশ্বাসের কথা। জান্নাত-জাহান্নামের কাথা। পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা। যে ধর্মে আছে কোরআনের মতো মহাসত্য গ্রন্থ। অতএব, এই ধর্ম ছেড়ে তুমি যদি নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ো, তাহলে বুঝতে হবে তুমি কঠিন রোগে আক্রান্ত। যার দ্রুত নিরাময় দরকার।

আমিও পারি সৃষ্টি করতে

বহুদিন আগের কথা। তখন কিছু মানুষ নাস্তিক্যবাদে এতোটাই চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, কেউ কেউ নিজেকেই স্রষ্টা বলে ধারণা করতে শুরু করেছিল। এমনই এক ভ্রষ্ট নাস্তিক একদিন এক আলেমের কাছে এসে বলল, আমিও পারি সৃষ্টি করতে, আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন?

তুমিও সৃষ্টি করতে পারো? প্রশ্ন আলেমের।

হ্যাঁ। নাস্তিকের দম্ভভরা জবাব।

আলেম তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, বেশ, তাহলে কিছু একটা সৃষ্টি করে দেখাও তো।

নাস্তিকটি একটি বৃহদাকায় গাছের কাছে গেল। তাতে একটি গর্ত খুড়ল। গর্তটির ভেতর এক টুকরো গোস্ত রাখল। তারপর গর্তটি ঢেকে দিল। এবার সে আলেমকে বলল, শায়েখ, ঠিক এক মাস পর আমি এখানে এসে আপনার সাথে দেখা করব।

এক মাস পর লোকটি এলো। আলেমকে নিয়ে সেই গাছের কাছে গেল। লোকটি গর্তের ঢাকনাটি সরাল। দেখা গেল, গোশতের টুকরাটি কিছু কীটে পরিণত হয়ে গেছে।

ওই লোকটি তখন আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেখলেন, এই কীটগুলো আমি সৃষ্টি করেছি। আমিই এগুলোর স্রষ্টা।

আলেম বললেন, আচ্ছা, তাই নাকি? তার মানে আপনার দাবি হল, আপনিই এগুলোর স্রষ্টা?
হ্যাঁ।

বেশ, তাহলে বলুন তো আপনি কতগুলো কীট সৃষ্টি করলেন?

তা তো জানি না।

আশ্চর্য! আপনিই সৃষ্টি করলেন, অথচ আপনিই জানেন না এর সৃষ্টি সংখ্যা! আচ্ছা, তাহলে অন্তত এটা বলুন, এখানে ক'টি নারী আর ক'টি পুরুষ কীট রয়েছে?

জানি না।

এটাও জানেন না? আচ্ছা এই যে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কীট হাঁটছে। কিছু ডাল বেয়ে উপরে ওঠছে। কিছু নিচে নামছে। আপনি যেহেতু এগুলোর স্রষ্টা, তাই বলুন তো কোথায় এদের গন্তব্য? তারা আজ কী খাবে? কবে এরা মারা যাবে?

আমি এসবের কিছুই জানি না।

কী আশ্চর্য! আপনি নিজেই তাদের সৃষ্টি করেছেন, অথচ তাদের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছেন না।

নাস্তিকটি তখন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার দাবির অসত্যতা প্রমাণিত হল। বস্তুত, আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।

অতএব, যারা আল্লাহ ﷻ-র প্রভুত্বে নির্ধারিত বিষয়সমূহের কোনোটিকে নিজের সৃষ্টি বলে দাবি করে, তাদেরকে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বলা যায় না। যে সমাজে এসব লোকের বসবাস সেই সমাজও তাদেরকে মেনে নেয় না।

এক সাহাবির ইসলাম গ্রহণের গল্প

যুবায়ের বিন মুতঈম رضي الله عنه। রাসুল ﷺ-র একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। ঘটনাটি তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার। একদিন তিনি মদিনায় প্রবেশ করলেন। উদ্দেশ্য রাসুল ﷺ-র সাথে সাক্ষাত করা। তিনি মসজিদে নববীর কাছাকাছি এলেন। রাসুল ﷺ তখন সাহাবীদের

নিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন। সালাতে তেলাওয়াত করছিলেন সূরা তূর।

যখন তিনি সূরার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন–

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ﴾

> তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? [সূরা তূর : ৩৫]

যুবায়ের বিন মুতঈম رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর কসম, আয়াতটি শোনার পর থেকে আমার মনে বারবার এ প্রশ্নটিই ঘুরপাক খাচ্ছিল– সত্যিই কি আমরা আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছি? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা?

অবশেষে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিভাবে চিনেছ প্রভুকে

একবার এক আরব বেদুইনকে প্রশ্ন করা হল, তোমার প্রভুকে তুমি কিভাবে চিনেছ?

জবাবে সে বলল, এই যে গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আসমান, এই যে পাহাড়-পর্বতে ঘেরা জমিন, এই যে অবিরাম বয়ে চলা নদ-নদী, এই যে উত্তাল উর্মিমালার সাগর-মহাসাগর– এগুলো কী নিপুণ স্রষ্টা মহান আল্লাহর পরিচয় দেয় না? এভাবেই তারা মহান প্রভুর অনুপম সৃষ্টিরাজি দিয়ে তার অস্তিত্বের সত্যতার প্রমাণ পেশ করতেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

﴿وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۖ حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

> তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি; এমনিভাবে আমি মৃতদের বের করব যাতে তোমরা চিন্তা কর। [সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৭]

আয়াতের একটি অংশে বলা হয়েছে, আমি এই মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। বাতাস বহন করে মেঘমালা। আর এই মেঘমালাকে নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ ﷻ। তাই তো আমরা আল্লাহ ﷻ-র পবিত্র নাম, গুণাবলি ও সৃষ্টির মাঝেই খুঁজে পাই তাঁর সুমহান পরিচয়।

নাস্তিক ও বালক

একবার এক নাস্তিক এক বালককে প্রশ্ন করল। তুমি কি মুসলমান?

হ্যাঁ, আমি মুসলমান। বালকটি জবাব দিল।

তার মানে তুমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করো?

হ্যাঁ, অবশ্যই আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।

তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ?

না।

তাঁকে স্পর্শ করেছ?

না।

তাঁর ঘ্রাণ অনুভব করেছ?

না।

যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাও

তাঁর স্বাদ উপলব্ধি করেছ?

না।

নাস্তিকটি বলল, তাহলে তুমি আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বের প্রমাণ কি করে পেলে? তুমি কখনো তাকে দেখনি, শোনোনি, স্পর্শ করোনি। কখনো অনুভব করোনি তাঁর ঘ্রাণ। উপলব্ধি করোনি তার স্বাদ। এর মানে হল তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় তোমার প্রভুর সত্যতার প্রমাণ দেয় না।

এই বলে নাস্তিকটি মুখের কোণে বিজয়ের হাসি টানল। সে ভাবল বালকটিকে সে কুপোকাত করে দিয়েছে। কিন্তু বালকটি ছিল প্রখর মেধাবী। সে নাস্তিককে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনার কি বিবেক আছে?

হ্যাঁ। অবশ্যই। নাস্তিকের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

আপনি কি সেটা দেখেছেন?

কি?

ওই বিবেক নামক বস্তুটাকে।

না।

ওটাকে স্পর্শ করেছেন কখনো?

না।

ওটার আওয়াজ কানে শুনেছেন?

না।

ওটার ঘ্রাণ অনুভব করেছেন?

না।

ওটার স্বাদ উপলব্ধি করেছেন?

না।

তার মানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রমাণাদি দ্বারা আপনার বিবেক আছে বলে প্রমাণিত হয় না। তাহলে তো আপনি পাগল।

নাস্তিক বলল, না, আমি সুস্থ বিবেকের অধিকারী।

কি করে জানলেন যে আপনার বিবেক আছে? প্রশ্ন বালকটির।

কিছু নিদর্শন দেখে বুঝতে পারি যে, আমার বিবেক আছে।

তাহলে পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান অসংখ্য অগণিত নিদর্শন দেখেও আমরা কেন বিশ্বাস করবো না যে, এগুলোর স্রষ্টা আছেন?

বস্তুত নিদর্শন বস্তুর অভ্যন্তরীণ পরিচয় বহন করে থাকে। যেমন, ধরো তুমি কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক লোককে উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় হাঁটতে দেখলে। অথবা দেখলে সে বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছে। কিংবা রাস্তায় শত শত গাড়ি চলছে আর সে অসতর্ক অবস্থায় রাস্তা পার হচ্ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাকে বিবেকহীন পাগল জ্ঞান করবে। এর অর্থ তো এই নয় যে, তুমি তার মাথার খুলিটা খুলে তার বিবেক আছে কি নেই তা পরখ করে দেখেছ। তারপর বলেছ যে, তার বিবেক নেই। সে একজন পাগল। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এমন নয়।

আসলে তুমি তার মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ দেখোনি। তার মাঝে সুস্থ বিবেক বিদ্যমানের নিদর্শন পাওনি। তাই যখনি তুমি কোন পাগল ব্যক্তি দেখতে পাও, তখন তার কাজকর্ম ও চালচলনের নিদর্শন দেখেই বুঝতে পারো– লোকটি পাগল।

যদি কেউ তোমাকে প্রশ্ন করে– আল্লাহ ﷻ আছেন, কি করে বুঝলে?

জবাবে বলবে– বুঝেছি তাঁর মহান নিদর্শনসমূহ দেখে। আসমান-জমিন, নদী-নালা, পাহাড়-সাগর সবই তাঁর নিদর্শন। সমগ্র সৃষ্টিকুল তাঁর নিদর্শন। পবিত্র কোরআন তাঁর নিদর্শন। বিদ্যমান এ সকল নিদর্শন এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ ﷻ আছেন।

এটা খুবই আফসোসের বিষয় যে, আজ ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে বহু নাস্তিক আল্লাহ ﷻ-র অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। এ অবস্থাতেই

পরপারে পাড়ি জমাচ্ছে। এই নাস্তিকদের অধিকাংশই আত্মহত্যার মাধ্যমে তাদের জীবনের ইতি টানছে। কেউবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্যে জীবনের শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তাই প্রার্থনা আল্লাহ ﷻ-র কাছে, তিনি আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের দলভুক্ত করুন। আমাদেরকে দীনের ওপর অবিচল রাখুন। যেখানেই থাকি আমাদেরকে তার অনুগ্রহের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করুন।

নেই কোনো রব আল্লাহ ছাড়া

ইসলাম-পূর্ব যুগে মানুষের আকিদা ছিল ভ্রান্ত। বিশ্বাস ছিল বাতিল। কল্পনা ছিল অলিক। চিন্তা-চেতনা ছিল অসার। তারা লিপ্ত ছিল মূর্তির উপাসনায়। সে যুগে এক কবি ছিল। নাম তার ইমরুল কায়েস। সুনামে সুখ্যাত ছিল সে। একদিন তার কাছে এক ব্যক্তি এলো। বলল, ইমরুল কায়েস! তুমি কি জানো, অমুক ব্যক্তি তোমার বাবাকে হত্যা করেছে?

কি? সে আমার বাবাকে হত্যা করেছে?

হ্যাঁ।

তাহলে জেনে রাখো, ইমরুল কায়েস এখন তার থেকে এর প্রতিশোধ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। একথা বলেই সে মদ পান করতে লাগল। মুখে বারবার আওড়াতে লাগল– اَلْيَوْمُ خَمْرٌ وَغَدًا اَمْرٌ (আজ মদ, কাল কাজ)

অর্থাৎ, আজ আমি করব আনন্দ, কাল নেব পিতৃহত্যার প্রতিশোধ। তার এই বাক্যটি পরববর্তীতে প্রবাদে পরিণত হয়ে যায়।

পরেরদিন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তৎকালীন আরব পৌত্তলিকদের মাঝে একটি

রীতির প্রচলন ছিল। তারা কোনো কাজ করার পূর্বে মূর্তির সামনে প্লেটসদৃশ কিছু একটা রাখত। যেগুলোর কোনোটিতে লেখা থাকত– اِفْعَلْ (করো) আর কোনোটিতে লেখা থাকত- لَا تَفْعَلْ (করো না)। একটি ছিদ্র দিয়ে তারা সেগুলো মূর্তির সামনে নিক্ষেপ করত। তারপর সেখান থেকে একটি পাত্র তুলে এনে তাতে 'করো' বা 'করো না' যা-ই লেখা থাকত তা তাদের মূর্তির আদেশ হিসেবে মেনে নিত। এবং সে অনুযায়ী কাজ করত।

তাদের বিশ্বাস ছিল, তাদের উপাস্য মূর্তিগুলো অদৃশ্যের সবকিছু সম্পর্কে অবগত। তাই তারা সেগুলোর উপাসনা করত। আল্লাহকে ছেড়ে সেগুলোর কাছে মনের কামনা বাসনা পেশ করত। এগুলোর নামে পশু জবাই করত। প্রদীপ জ্বালাত। এগুলোকে প্রদক্ষিণ করত।

তুমি যদি ইসলাম-পূর্ব আরব ইতিহাসের দিকে তাকাও, তাহলে কা'বা ঘরের চারপাশে শত শত মূর্তির উপস্থিতি দেখতে পাবে।

তৎকালিন কাফেররা সেগুলোর পূজা-আর্চনা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল এই মূর্তিগুলোই তাদেরকে অনিষ্ঠ থেকে দূরে রাখবে। রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করবে। তাদেরকে অদৃশ্যের গোপন সংবাদ জানাবে। পাথরের তৈরী এই মূর্তিগুলোর প্রতি তাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। আল্লাহ ﷻ তাদের এ বিশ্বাসকে অসার প্রমাণিত করেছেন।

যাই হোক ইমরুল কায়েসও সে নিয়ম মেনেই এই প্লেটগুলো মূর্তির সামনে রেখেছিল। যখন সে একটি প্লেট ওঠাল। তখন দেখতে পেলো তাতে লিখা আছে– لَا تَفْعَلْ (করো না)। অর্থাৎ, তোমার পিতার হন্তারককে হত্যা করো না।

সে প্লেটগুলোকে আবার একত্রিত করল। এবার এগুলোর সাথে কিছু টাকা-পয়সাও রাখল। যেন সে মূর্তিকে উৎকচ দিচ্ছে। কিন্তু হায়! এবারো সেই لَا تَفْعَلْ (করো না) লেখা সম্বলিত প্লেটটি ওঠে এলো। তৃতীয়বারও সে একই কাজ করল। এবার আগের তুলনায় টাকা-পয়সার পরিমান বাড়িয়ে দিল। কিন্তু এবারো لَا تَفْعَلْ (করো না) লেখা সম্বলিত একটি প্লেট ওঠে এলো। যখন সে দেখল যে, প্রতিবারই

لَا تَفْعَلْ (করো না) ওঠে আসছে, তখন সে রেগে গেল। প্লেটগুলো মূর্তির মুখে ছুড়ে মেরে বলল, নিহত ব্যক্তিটি যদি আজ তোমার বাবা হতো তাহলে তুমি ঠিকই আমাকে اِفْعَلْ (করো) বলতে।

একথা বলে সে তার বাবার হত্যাকারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

অজ্ঞতার যুগে আরব পৌত্তলিকদের মাঝে কী সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রচলন ছিল তা বুঝাতেই এ গল্পটির অবতারণা।

অজ্ঞতার যুগের কয়েকটি ঘটনা

আবু রাযা আল-আতারিযি ﷺ বলেন, অজ্ঞতার যুগে আমরা মূর্তি ও পাথরের উপাসনা করতাম। একবার আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের সাথে একটি পাথর ছিল। আমরা সেটির উপাসনা করতাম। হঠাৎ আগুন জ্বালানোর জন্য আমাদের ৩টি পাথরের প্রয়োজন পড়ল। কারণ, পাতিল রাখার জন্য চুলার মুখ হিসেবে কমপক্ষে ৩টি পাথরের প্রয়োজন হয়। যখন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো পাথর খুঁজে পেলাম না। তখন আমাদের উপাস্য পাথরটির ওপরেই পাতিল রেখে সেটাকে চুলা হিসেবে ব্যবহার করলাম। আর বললাম অন্য পাথরের তুলনায় এটি বেশি জ্বলবে।

তিনি আরো বলেন, অজ্ঞতার যুগে আমরা মূর্খতার অতলে ডুবে ছিলাম। ইসলাম এসে আমাদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছে। সে যুগে আমাদের জ্ঞানের দৈন্যতা কতটা চরমে পৌঁছেছিল তার একটি উপমা দিচ্ছি। একবার আমরা সফরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের গোত্রের কেউ একজন চিৎকার করে বলতে লাগল, হে লোকসকল! তোমাদের রব হারিয়ে গেছে। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই তাঁকে খুঁজতে বের হও। রব হারিয়ে যাওয়ার সংবাদে আমরা ভীষণ কষ্ট পেলাম। অপমানিত বোধ করলাম।

সফরের চিন্তা ছেড়ে রবের তালাশে বের হলাম। আমরা সবাই হারানো রবের তালাশে ব্যস্ত; এ সময় কেউ একজন চিৎকার করে ওঠল, আমি কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি। সেটিই হয়তো তোমাদের রব।

তিনি বলেন, তখন আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, আমার গোত্রের লোকেরা একটি মূর্তির সামনে মাথা নত করে বসে আছে। আমি মূর্তিটির সামনে একটি উট জবাই করলাম।

অতঃপর তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি জানি আমার এ কাহিনী শুনে তোমরা হাসবে। যেমন ওমর বিন খাত্তাবের কাহিনী শোনে তোমরা হেসে থাকো।

ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেন, অজ্ঞতার যুগে কখনও কখনও এমন হতো যে, আমি মূর্তি কেনার পয়সা যোগাড় করতে পারতাম না। তখন আমি খেজুর জমাতাম। তা দিয়ে মূর্তি বানাতাম। তার উপাসনা করতাম। এরপর ক্ষুধা লাগলে খেজুরের সেই মূর্তিটিকেই খেয়ে ফেলতাম।

আহা! যে বস্তুটি না পারে কারো উপকার করতে, না পারে কারো ক্ষতি করতে; অজ্ঞতার যুগে তার উপাসনায় কেমন নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ ছিল? এরূপ নির্বোধ শ্রেণির উপস্থিতি পৃথিবীর বুকে আজও বিদ্যমান।

দেশে দেশে ধর্মবিশ্বাস

যেমন, তুমি যদি শ্রীলংকা কিংবা জাপানে যাও তাহলে সেখানে দেখতে পাবে উন্নতি-অগ্রগতির রোল মডেল যে জাপান, প্রযুক্তিতে বিশ্বসেরা যে জাপান, তারা সত্য সঠিক ধর্মের অনুসরণ করছে না। মহান সেই আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করছে না যিনি একক। যার নেই কোনো অংশীদার। সে দেশের অধিকাংশ লোকেরাই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী।

তুমি যদি কোরিয়া বা চীনে যাও, দেখতে পাবে বৈষয়িক দিক থেকে তার কতোটা এগিয়ে। অথচ তাদের উপাস্য বস্তু হল মূর্তি।

তুমি যদি বৌদ্ধদের দিকে তাকাও, দেখবে কতভাবে তারা মূর্তির উপাসনা করছে। মূর্তির নৈকট্য অর্জনে কীভাবে নিজের মূল্যবান জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। বৌদ্ধদের উপাসনার নানা ধরণ রয়েছে। রয়েছে হরেক রকম রীতিনীতি। যেগুলো দেখলে তুমি অবাক না হয়ে পারবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের উপাস্যের স্রষ্টা।

তারা নিজ হাতে স্বর্ণ অথবা পাথর দিয়ে মূর্তি তৈরী করছে। কাজ শেষে সেটির উপাসনায় লিপ্ত হচ্ছে। সেটির সামনে অবনত মস্তকে প্রার্থনা করছে। স্বহস্তে তৈরী মূর্তির কাছে দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চাচ্ছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾

হে লোকসকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। [সূরা হজ, আয়াত : ৭৩]

তিনি আরো বলেন–

﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না। শোনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। [সূরা ফাতির, আয়াত : ১৪]

এ দু আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, হিন্দু-বৌদ্ধ ও প্রতিমা পূজারী অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেসব মূর্তি-প্রতিমার উপাসনা করে থাকে, সেগুলো তাদের উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না।

সত্যিই আশ্চর্য!

আমি যখন চীন, জাপানের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার ও আবিষ্কারকদের বিশেষ ধরণের লাল রঙের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে উপাসনা করতে দেখি। দেখি মূর্তিগুলোর চারপাশে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করতে। তাদের কাছে রোগ মুক্তি কামনা করতে। দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি চাইতে। যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য কাকুতি মিনতি করতে, তখন অবাক না হয়ে পারি না।

তুমি চাইলে এদের সাথে সেসব ব্যক্তিদেরও দেখতে পারো, যারা বিভিন্ন মাজারে যায়। যারা আল্লাহ ﷻ-কে ছেড়ে কবরবাসী মৃতদের কাছে প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায়। বিশেষ করে তারা সেই কবরগুলোর কাছে যায় যেগুলোর উপর উঁচু গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। তারা সেই কবরগুলোকে স্পর্শ করে। ক্ষমা চায়। সুপারিশের আবেদন জানায়। অনুগ্রহ কামনা করে।

ভাই আমার! কেন এসব অনর্থক কাজে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা ব্যয় করছ? তারচে এই টাকাগুলো তুমি শিক্ষাখাতে ব্যয় করো। যোগাযোগ খাতে ব্যয় করো। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করো।

কেন তুমি আল্লাহ ﷻ-কে ছেড়ে সেসব কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা করছ। অপার অনুগ্রহের মালিককে ছেড়ে কেন মৃতের কাছে অনুগ্রহ কামনা করছ? কেন কবরে চুমু খাচ্ছ? কেন কবরের কাছে নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়টি ন্যস্ত করছ?

তুমি যদি এমন করো তাহলে তোমার মাঝে আর মূর্তি পূজারীদের মাঝে কি পার্থক্য বল? মূর্তি পূজারীরা যেমন মূর্তির সামনে মাথা ঝোঁকাচ্ছে। তুমিও তো কবরের কাছে এসে কবরকে স্পর্শ করে কবরবাসীর দয়া কামনা করে ঠিক একই কাজ করছ।

মনে রেখো, ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা হলেন—আল্লাহ ﷻ। তাঁর ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে অংশিদার সাব্যস্ত করলে তিনি ক্রোধান্বিত হন।

আল্লাহ ﷻ বলেন, মসজিদসমূহ আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ ﷻ-র সাথে কাউকে ডেকো না।

তাই, আল্লাহ ﷻ-কে ছেড়ে অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। আর যে মূর্তি-প্রতিমা তার নিজের উপর বসা একটি মাছিও তাড়াতে পারে না, সে কি করে তোমার কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করবে?

রাসুল ﷺ-র সাহাবীরাও এটা বুঝতেন। তাই তো ইসলামের প্রথম দূত মুসআব ইবনে উমায়ের رضي الله عنه কে যখন রাসুল ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মদিনায় পাঠালেন, তখন তিনি সেখানে গিয়ে মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার আহবান জানালেন। তার দাওয়াতে আমর বিন জমূহ-এর চার ছেলে ইসলাম গ্রহণ করল।

আমর বিন জমূহ رضي الله عنه একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তার পা খোড়া ছিল। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই তার সন্তানেররা চাচ্ছিল তাদের বাবাও যেন ইসলামের ছায়াতলে এসে যান। তাদের মা আগেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা তাদের বাবাকে বলল, মদিনা শহরে একজন লোক এসেছেন। তিনি মানুষদেরকে এক আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। আপনি তার কাছে যান।

তিনি বললেন, আমার কাছে মানাফ (তার উপাস্য মূর্তির নাম) আছে। তার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার। কিন্তু ছেলেরা নাছোড় বান্দা। তারা তাকে মুসআব ইবনে উমায়েরের মজলিশে যাবার জন্য পীড়াপীড়া করতে লাগল। অগত্যা তিনি মুসআব ইবনে উমায়ের رضي الله عنه এর কাছে যেতে রাজি হলেন। এরপর তার সেই মানাফ নামক মূর্তিটি নিয়ে দারুণ একটি ঘটনা ঘটল।

আমার প্রভু কোথায়?

আমর বিন জমূহ মদিনার পথ ধরে হেঁটে মুসআব ইবনে উমায়েরের কাছে যাচ্ছিলেন। তখন মদিনা শহরটি বর্তমানের মতো এতো জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। পুরো শহর জুড়ে ছিল কিছু পুরনো বাড়িঘর আর গাছপালা। চলতে চলতে তিনি মুসআব ইবনে উমায়ের

رضي الله عنه এর কাছে গেলেন। তিনি মুসআব বিন উমায়ের رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কীসের দাওয়াত দিচ্ছেন?

আমি এক আল্লাহ ﷻ-র প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি। যার কোনো শরীক নেই। আমি আরো দাওয়াত দিচ্ছি তাঁর সম্মানিত রাসুল ﷺ-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের।

অতঃপর মুসআব বিন উমায়ের رضي الله عنه পবিত্র কোরআন থেকে খানিকটা তেলাওয়াত করে শোনালেন। তার সুমধুর কণ্ঠের তেলাওয়াত তাকে বিমোহিত করল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করলেন না। বললেন, আমি আমার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আমাকে তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। তাই আমি এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে পারছি না।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে তিনি প্রথমেই তার উপাস্য মানাফ নামক মূর্তিটির সামনে দাঁড়ালেন। মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মানাফ! লোকটি চায় তোমাকে ধ্বংস করে দিতে। তুমি কি তার সম্পর্কে জানো? সে আমাকে যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছে, সে ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? কি ব্যাপার তুমি কিছু বলছ না কেন? ওহো, সম্ভবত রাত হয়ে গেছে বলে তুমি রেগে আছো। বেশ, আমি তোমার সাথে সকালেই কথা বলব। এই বলে তিনি ঘুমাতো চলে গেলেন।

গভীর রাতে তার ছেলেরা বাবার সেই মানাফ নামক মূর্তিটি নিয়ে বাড়ির পেছনে আবর্জনার স্তুপে ফেলে দিল।

সকাল হল। আমর বিন জমূহ ঘুম থেকে জেগে মানাফের কাছে গেলেন। দেখলেন সেটি তার স্থানে নেই। তিনি চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, মানাফ! কোথায় গেলে তুমি? মানাফ!

ছেলেদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রভু কোথায়?

ছেলেরা বলল, জানি না।

তিনি বাড়ির চারপাশে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে সেটাকে আবর্জনার স্তুপের মাঝে খুঁজে পেলেন। মূর্তিটি হাতে নিয়ে তিনি তাকে লক্ষ্য

করে বললেন, আহা! তুমি বুঝি নিজেকে মানুষের কৌতুক থেকেও রক্ষা করতে পারো না? অথচ আমি মনে করতাম, তুমি রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তিদাতা। তুমি ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাকারী। তুমি ভাগ্য নির্ধারণাকারী।

মুখে এসব বললেও তিনি কিন্তু ঠিকই মানাফকে আবর্জনার স্তুপ থেকে তুলে আনলেন। সেটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেন। সেটার গায়ে সুগন্ধি লাগালেন। তারপর ঘরে নিয়ে বললেন, মানাফ! তুমি হয়তো গত রাতের ব্যাপরটা নিয়ে আমার ওপর রেগে আছো। তারা তোমাকে অপমান করেছে।

তারপর তিনি পরবর্তী রাতের নিরাপত্তার কথা ভেবে মানাফের গলায় একটি তরবারী ঝুলিয়ে দিলেন। বললেন, একটি বকরীও তার অপমান সহ্য করে না। বুঝতেই পারছো তোমার অপমানে আমি কতটা ব্যথিত হয়েছি। আশা করছি আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছো। এই তরবারীটি তোমাকে দিয়ে গেলাম। এটি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করো।

রাত গভীর হল। তার ছেলেরা মানাফের কাছে এল। সেটির গলা থেকে তরবারীটি সরাল। অতঃপর সেটিকে একটি মরা কুকুরের সাথে বেঁধে পরিত্যক্ত একটি কূপের ভেতর ফেলে দিল।

আমর বিন জমূহ ভোরে ঘুম থেকে জেগে প্রথমেই মূর্তির ঘরে গেলেন। সেখানে তিনি আগের দিনের মতো আজও মূর্তিটিকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, আমার প্রভুর সাথে কে এমন আচরণ করছে?

ছেলেরা আগের দিনের মতো আজও কৌশলী জবাব দিল, বাবা, আমরা তো কিছু জানি না।

তিনি মানাফকে খুঁজতে লাগলেন। একপর্যায়ে কূপের কাছে এসে তার ভেতরে দৃষ্টি দিলেন। দেখলেন, তার কথিত প্রভু মানাফ একটি মৃত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় কূপের ভেতর পড়ে আছে। তিনি তখন বললেন–

وَرَبٌّ يَبُوْلُ الثُّعْلُبَانُ بِرَأْسِه * لَقَدْ خَابَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

(হায়!) এ কেমন প্রভু আমার? খেঁকশিয়াল পেশাব করে যার মাথায়, আর যার ওপর খেঁকশিয়াল করে পেশাব, তার ধ্বংস অনিবার্য।

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন বলেছিলেন–

وَاللهِ لَوْ كَانَتْ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ * أَنتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِيْ قَرْنٍ

শপথ আল্লাহর, যদি তুমি সত্যিই ইলাহ হতে, তাহলে কূপের ভেতর কুকুরের সাথে তোমার অবস্থান হতো না।

এরপর আমর বিন জমূহ মুসআব ইবনে উমায়ের ﵁ এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু।

সম্পর্ক হবে কেবল আল্লাহর সাথে

যে ব্যক্তি তার অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি পেতে, অসুস্থতা ও দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ পেতে আল্লাহ ﷻ-কে ছেড়ে অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সেগুলোর প্রতিই ন্যস্ত করা হয়ে থাকে। আশ্চর্য! আজ বহু মুসলমান আল্লাহ ﷻ-কে ছেড়ে কবর বা মাজারের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে।

এটা সত্য যে, মানুষ মাত্রই উপাসনা প্রিয়। সে কোনো না কোনো বস্তুর উপাসনা করবেই। তাই তো এক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা কি হবে তা আল্লাহ ﷻ ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ ﷻ-র উপাসনা করো। যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

অথচ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কত শত মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করা হচ্ছে। যার পরিসংখ্যান জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

কিছু উদাহরণ

যেমন ভারতের কথা ধরো। সেখানে তুমি এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখবে যারা জাগতিক পদ-পদবী এবং সম্মান ও মর্যাদার বিচারে উচ্চাসনে

অধিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ তারা উপাসনা করছে একটি গাভীর। তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টায় নিজেকে করছে বিলীন। এই গাভীটিই একসময় তার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। এটির ভয়েই তারা কখনও কখনও ছুটোছুটি করছে। তবুও তারা এই নির্বোধ জন্তুটিরই উপাসনা করছে।

কেউ কেউ এই গাভীর উপাসনায় এতো অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছে, হয়তো সে তা নিজের পরিবারের জন্যেও কখনও ব্যয় করেনি। অথচ এটি একটি মামুলি গাভী। যা একটি পশু বৈ কিছু নয়।

খ্রিষ্টানরা ঈসা ﷵ-র উপাসনা করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ সেকথা উল্লেখ করে বলেন—

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

আল্লাহক বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব, তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত— যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো? [সূরা আরাফ : ১৯৪]

ঈসা ﷵ তো আল্লাহ ﷻ-র বান্দাই ছিলেন। অথচ তোমরা তার ইবাদত করছ। তদ্রূপ গাভীও একটি পশু বৈ কিছু নয়। সেটিও আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন—

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। [সূরা ইসরা, আয়াত : ৪৪]

অথচ কেয়ামতের দিন এই গাভীটিও আল্লাহ ﷻ-র কাছে মুক্তি চাইবে। কেননা, কেয়ামতের দিন জিন ও মানুষের মতো পশুদেরও বিচার হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন—

কেয়ামতের দিন শিংযুক্ত বকরি থেকে শিংবিহীন বকরির অধিকার আদায় করা হবে। যদি দুনিয়াতে শিংযুক্ত বকরীটি শিংবিহীন বকরীটিকে আঘাত করে থাকে, তাহলে শিংযুক্ত বকরীটির সেই শিংবিহীন বকরিটিকে দেওয়া হবে। অতঃপর ওই শিংবিহীন বকরি টুঁ মেরে নিজ আঘাতের বদলা নেবে। [সহিহ মুসলিম : ৬৭৪৫]

তাই সেদিন তাদের উপাস্য গাভীও আল্লাহ ﷻ-র কাছে মুক্তি প্রার্থনা করবে। কারণ, সে জানে আজ তাকেও বিচারের সম্মুখিন হতে হবে। কেননা, আল্লাহ ﷻ দুনিয়াতে কাউকে সতর্ক না করে আখেরাতে শাস্তি দেবেন না।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا﴾

যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গালের জন্যেই সৎপথে চলে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গালের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ১৫]

এতদসত্ত্বেও এসব লোকেরা গাভীর উপাসনা করে। আল্লাহ ﷻ-কে ছেড়ে গাভীর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে।

যে মানুষ আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত ছেড়ে দেয়, যে মানুষ আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়, আল্লাহ ﷻ-র কাছে একটি মাছির ডানার সমান মর্যাদাও তার নেই। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন–

وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا أَعْطَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ

আল্লাহ ﷻ-র কাছে যদি এ পৃথিবীর মূল্য একটি মাছির ডানা পরিমাণও হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। [বোখারী : ৪৭২৯]

তাই যেখানে আল্লাহ ﷻ-র কাছে গোটা দুনিয়ারই কোনো মূল্য নেই, সেখানে এই কাফেরের কি মূল্য থাকতে পারে?

সেজন্যেই আমি সবসময় মানুষদেরকে শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক করি।

তাওহীদে বিশ্বাসী হও

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ

যতদিন পর্যন্ত যুলখালাসার পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিমত্ব দোলায়িত না হবে, ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। [বোখারী: ৭১১৬]

যুলখালাসা একটি মূর্তির নাম। অজ্ঞতার যুগে কাফেররা সেটির উপাসনা করত। বর্তমানে দক্ষিণ আরবে যে গোত্রগুলো বসবাস করে এরা দাউস গোত্রের বংশধর। এদের পূর্বপুরুষ যুলখালাসা নামক সেই মূর্তিটির উপাসনা করত। রাসুল ﷺ-র ভবিষ্যত বাণী থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ আবার মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহর একত্ববাদ থেকে তারা দূরে সরে যাবে। নানাবিধ শিরকে লিপ্ত হয়ে তাদের জীবন কাটাবে।

যার কিছু বাস্তবতা এখনই তুমি দেখতে পাচ্ছ। কিছু মানুষ কবরকে অযাচিত সম্মান করছে। কবরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করছে। কবরবাসীর কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করছে। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কান্নাকাটি করছে, মসজিদে গিয়েও যেমনটি কখনও করে না। তাই তুমি যদি আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করতে চাও, তাহলে অবশ্যই প্রথমে পরিপূর্ণরূপে তাওহীদে বিশ্বাসী হও। তারপর একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর ইবাদতে মশগুল হও।

তোমার কান্না ও ভীতি, তোমার প্রার্থনা ও মিনতি সবই যেন হয় এক আল্লাহ ﷻ জন্যেই। আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি জন্যেই দান-সদকা কর। কবর কিংবা মাজারে একটি পয়সাও দেবে না কখনও। কোনো সৃষ্টির উপাসনায় খরচ করবে না একটি কানাকড়িও।

মহান আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা– হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনার সাক্ষাত লাভে ধন্য করুন। আপনার একত্ত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার তওফীক দিন। যারা কোনো না কোনোভাবে আপনার শিরকে লিপ্ত– আপনি আমাদেরকে তাদের দলভূক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

খ্রিষ্টানদের সাথে কিছুক্ষণ

একই আকিদা-বিশ্বাস দিয়ে আল্লাহ ﷻ তাঁর সমস্ত নবী-রাসুলকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

> আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদের পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন; তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪]

সেই সুস্পষ্ট বিষয়টির কথা আল্লাহ ﷻ পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলে দিয়েছেন–

﴿اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ﴾

> তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতিত তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? [সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৩২]

সকল নবী-রাসুলই তাদের জাতির কাছে এই দাওয়াত দিয়েছেন–

তোমরা এক আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই। এ কারণে, যারা মুশরেক বা যারা আল্লাহ ﷻ-কে ছেড়ে অন্যের উপাসনায় লিপ্ত- তাদের কেউ আল্লাহর জন্য পুত্র নির্ধারণ করে, আল্লাহ ﷻ-র সাথে তারা তারও উপাসনা করে।

যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾

ইহুদীরা বলে উযায়র আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলে মসীহ আল্লাহ্র পুত্র; এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা, এরাও পূর্ববর্তী কাফেরদের মতই বলছে; আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টো পথে চলে যাচ্ছে। [সূরা তওবা, আয়াত : ৩০]

উযাইর عليه السلام-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করার পেছনে তাদের যুক্তি হল– তিনি একজন সৎ নবী ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তার কাছে আকাশ থেকে রিযিক আসত। আর পিতা ছাড়া অন্য কেউ তাকে রিযিক দিতে পারে না। তাই উযাইর عليه السلام আল্লাহর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ)।

আর খ্রিস্টানরা ঈসা عليه السلام আল্লাহ ﷻ-র পুত্র সাব্যস্ত করেছে। চলো আমাদের সেই খ্রিষ্টান বন্ধুদের সম্পর্কে খানিকটা জেনে নিই। প্রথমেই বলে রাখি, আমার অনেক খ্রিষ্টান বন্ধু রয়েছে। রয়েছে অনেক খ্রিষ্টান প্রতিবেশিও। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। তাদের প্রতি আমার আন্তরিকতা নিখাঁদ। তাদের অনেকেই আমার সাথে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। হতে পারে আমার সেই খ্রিষ্টান বন্ধুদের কেউ কেউ আমাকে এই মুহূর্তে দেখছেন। আমার বক্তৃতা শুনছেন। আমার লেখা পড়ছেন। নবীজিরও অনেক ইহুদি প্রতিবেশি ছিল। বিভিন্ন সময়ে তিনি মুকাওকিস নামক এক খ্রিষ্টানের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন। সেও কিছু পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করতেন।

একটি ঘটনা

ঘটনাটি আমার এক খ্রিস্টান বন্ধুকে নিয়ে। তখন আমি মিশরে ছিলাম। সেখানে গিয়েছিলাম একটি বইয়ের প্রদর্শনীতে অংশ নিতে। কাজ শেষ হল। এবার ফেরার পালা। বিমানবন্দরে যাবার উদ্দেশ্যে রাস্তায় দাঁড়ালাম। একটি টেক্সিকে ইশারা করতেই সেটি থামল। টেক্সির ড্রাইভার ছিল একজন টগবগে যুবক। ভাড়া ঠিক করে তাতে চড়ে বসলাম। টেক্সিটি বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে চলতে লাগল। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

কেমন আছো?

জি ভালো।

তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

হুমম, কিছুটা ক্লান্ত। কিন্তু একজন পিতাকে তার সন্তানদের জন্য এমন কষ্ট করতেই হয়।

আমি বললাম, তুমি তোমার সন্তানদের জন্য কষ্ট করছ। এর প্রতিদান তুমি পাবে।

গাড়িটি খানিকটা জ্যাম ঠেলে চলছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যুবকটির হাতে ক্রুশের আকৃতিতে একটি উল্কি আঁকা রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম–

এটা কি?

এটা ক্রুশ।

তোমার হাতে এ চিহ্ন কেন?

আমি একজন খ্রিস্টান।

তোমার নাম?

সম্ভবত সে তার নাম ইয়াসির বলেছিল।

আমি বললাম, আচ্ছা ইয়াসির আমি কি তোমার সাথে ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে কিছু কথা বলতে পারি?

জি বলুন।

ঈসা ﷺ আল্লাহর পুত্র– এমনই তো তোমার বিশ্বাস, তাই না?

হ্যাঁ, ঈসা ﷺ আমাদের প্রভুর পুত্র।

তার মানে হল আল্লাহ ﷻ সন্তান গ্রহণ করতে পছন্দ করেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। যার নাম হল ঈসা। ঠিক?

জি, ঠিক।

আচ্ছা, সন্তান গ্রহণ করাই যখন আল্লাহ ﷻ-র পছন্দ; তখন তিনি মাত্র একটি সন্তান গ্রহণ করলেন কেন?

সেটা আমাদের প্রভুর মর্জি।

না, এটা তাঁর মর্জি নয়। বরং তোমরাই তাঁর সম্পর্কে এমনটি বলে থাকো। যদি তোমাদের কথা মতো ঈসা নামক আল্লাহ ﷻ-র কোনো পুত্র থেকে থাকে, তাহলে ঈসা আ.'র কোনো সন্তান নেই কেন? আর যদি ﷻ-র সন্তান থেকে থাকে তাহলে তাঁর মাতা-পিতা নেই কেন? আল্লাহ ﷻ-র উচিত আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে জানানো। যেন আমরা তাঁর সাথে তাদেরও উপাসনা করতে পারি।

যুবকটি বলল, আমার কাছে এর কোনো জবাব নেই। আমাদের প্রভুই ভালো জানেন।

বললাম, বেশ, অন্য প্রসঙ্গে আসি। তোমার বিশ্বাস মতে ঈসা ﷺ আল্লাহ ﷻ-র পুত্র। তিনি অপরাধ করেছিলেন। তাই প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে।

হ্যাঁ। যুবকটির সংক্ষিপ্ত জবাব।

তো কি অপরাধ ছিল তার?

অপরাধটি মূলত আদম ﷺ এর ছিল।

আচ্ছা, আদম ﷺ-র সেই অপরাধটি কি ছিল?

আমাদের প্রভু যখন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি তা খেয়ে ফেললেন। তখন আল্লাহ ﷻ সেই অপরাধের জন্য এমন কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করলেন যার কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তার ওপর সেই অপরাধের কলঙ্ক রয়ে গেল। রয়ে গেল তার সন্তানদের ওপরও। অবশেষে আল্লাহ ﷻ তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তাঁকে শূলিতে চড়িয়ে আদম عليه السلام-র অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করালেন।

এক মিনিট। এখানে অপরাধটা কার বললে? ঈসা عليه السلام-র নাকি আদম عليه السلام-র? জানতে চাইলাম আমি।

আদম عليه السلام এর।

আচ্ছা অপরাধ যদি যদি আদম عليه السلام-র হয়ে থাকে তাহলে ঈসা عليه السلام কেন তার শাস্তি ভোগ করবে? কেন ঈসা عليه السلام-কে শূলিতে চড়ানো হবে। শূলিতে তো আদম عليه السلام কে চড়ানোর কথা।

এর উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু বিষয়টি এমনই।

আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আরেকবার বলবে, আদম عليه السلام যে অপরাধটি করেছিলেন, সেটি কি ছিল? জানতে চাইলাম আমি।

নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া। বলল যুবকটি।

তার মানে আদম عليه السلام শিকড়শুদ্ধ সেই গাছটি উপড়ে ফেলেন নি?

না।

তিনি কোনো ফেরেশতাকে হত্যা করেন নি?

না। সেটি একটি ছোট অপরাধ ছিল। একটি গাছ থেকে ফল খাওয়ার মতো অপরাধ।

বললাম, তাহলে কি এটি এমনই অমার্জনীয় অপরাধ ছিল যে, আল্লাহ ﷻ তার একমাত্র পুত্র সন্তানকে পাঠিয়ে শূলে চড়াতে হবে? তিনি চাইলে তো অন্যভাবে এই অপরাধটি ক্ষমা করতে পারতেন।

যেমন, শীতল পানি পান নিষিদ্ধ করা। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের প্রখর আলোতে বসে থাকা। একশ রাকাত সালাত আদায়ে বাধ্য করা। একেবারে সম্পদের অর্ধেকাংশ যাকাত প্রদানে চাপ প্রয়োগ করা, প্রভৃতি। তাছাড়া অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকাটাও তো জরুরি।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করো, আমি কম্পিউটারে কাজ করছি। কাজটি প্রায় সমাপ্তির পথে আছে। ঠিক এ সময় আমার দশ বছরের ছেলেটি এসে কম্পিউটারের সামনে বসল। সে কম্পিউটার নিয়ে দুষ্টুমি শুরু করে দিল। তার দুষ্টুমির কারণে আমার লেখাগুলো মুছে গেল। আমি এটাকে তার অপরাধ জ্ঞান করলাম। শাস্তি সৃরূপ তাকে আমি ধমক দিয়ে বললাম, এই ছেলে! কম্পিউটার নিয়ে আর কখনও দুষ্টুমি করবে না। তার কৃত ছোট্ট অপরাধের সাথে ধমকের এই লঘু শাস্তিটির সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

কিংবা তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাতে আমি তাকে বললাম, আমি যা লিখেছিলাম তুমি নতুন করে আবার তা লিখে দাও। এটা হল তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু ছেলেটি যদি ইচ্ছে করে কম্পিউটারের ওপর চা ফেলে দেয়। তাহলে এটি একটি বড় অপরাধ। এর শাস্তিটিও খানিকটা গুরু হবে।

এক কথায় অপরাধ যেমন হবে শাস্তিটিও তেমনই হওয়া চাই। লঘু অপরাধের গুরু দন্ড কখনোই কাম্য নয়। তাই আদম আ. যে অপরাধ করেছিলেন, সে অপরাধের একমাত্র শাস্তি কি এই ছিল যে, আল্লাহ ﷻ কর্তৃক তার একমাত্র পুত্রকে শূলিতে চড়ানো। এ ছাড়া কি প্রায়শ্চিত্তের অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না? যদি আদম আ. দুটি অপরাধ করতেন, তাহলে তখন দ্বিতীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করতেন?

আমি আরো বললাম, শোনো ইয়াসির! তুমি বলছো ঈসা ﷺ আল্লাহর পুত্র। তাঁকে শূলিতে চড়ানো হয়েছে। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

আমরা জানি তাঁকে শূলিতে চড়ানো হয়নি। আল্লাহ ﷻ তাঁকে ওঠিয়ে নিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ সে সম্পর্কে নিজেই বলেছেন–

﴿وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا﴾

অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলিতে চড়িয়েছে, বরং তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ যারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া এ বিষয়ে তারা কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। [সূরা নিসা, আয়াত : ১৫৭]

এরপর ইয়াসির আমাকে ঈসা عليه السلام কে শূলিতে চড়ানোর কাহিনীটি শোনাতে গিয়ে বলল, ইয়াহুদিরা এসে তাঁকে বেঁধে শূলির ওপর চড়াল। তাঁকে শূলের সাথে বেঁধে দু'হাত ও দু'পায়ে পেরেক গেঁথে দিল। তার পুরো শরীরে সিরকা ঢেলে তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। পরিশেষে তাকে শূলে চড়াল।

এ সময় তিনি কি ব্যথা পান নি?

হ্যাঁ, তিনি অনেক ব্যথা পেয়েছেন।

বললাম, বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক যিনি। তোমাদের ধারণা মতে যিনি তার পিতা; পুত্রের এ দৃশ্য কি তিনি তখন দেখেছিলেন?

হ্যাঁ। তিনি দেখেছিলেন।

তিনি কি তখন তাঁর বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছিলেন।

তিনি কি তাঁকে এই কষ্ট থেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন?

হ্যাঁ। তিনি সক্ষম ছিলেন।

তাহলে তিনি তাকে কেন রক্ষা করলেন না?

যেন আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।

বললাম, আল্লাহ ﷻ কেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করলেন না? কেন তিনি আদম عليه السلام-র অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাঁর একমাত্র সন্তানকে শূলিতে চড়ালেন?

আমার এ প্রশ্নের কোনো জবাব ইয়াসির দিতে পারল না।

এবার আমি তাকে আরেকটি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, ঈসা আ. কে তো শূলিতে চড়ানো হয়েছে। এখন কি পৃথিবীর সকল মৃত মানুষের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। নাকি মৃতরা তাদের অপরাধ নিয়েই মৃত্যু বরণ করেছে?

না। কোনো মৃতই তার অপরাধ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেনি। বরং ঈসা আ. থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে এবং আসবে আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। ঈসা عليه السلام-র প্রায়শ্চিত্তই সকল মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে।

বললাম, তাহলে আদম আ. থেকে ঈসা عليه السلام পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তারা কি তাদের অপরাধ নিয়েই আল্লাহ ﷻ-র সামনে দাঁড়াবে? এমন হলে আল্লাহ ﷻ ঈসা عليه السلام-কে আরো এক হাজার বা দু হাজার বছর আগে কেন পৃথিবীতে পাঠালেন না? তাহলে তো ক্ষমাটি আরো ব্যাপক হতো। আরো অধিক সংখ্যক লোকের অপরাধ মার্জনা হতো?

সেটা আমার প্রতিপালক জানেন। বলল, যুবকটি।

আমি বললাম, শোনো যুবক! তোমার বিশ্বাস মতে ঈসা عليه السلام আল্লাহর পুত্র। তার মানে হল ঈসা আ. হলেন ইলাহ। আর যিনি ইলাহ হন, তিনি তার মর্জি মোতাবেক যা খুশি করতে পারেন। মনে করো, ঈসা عليه السلام কোনো একটি কাজ করার ইচ্ছা করলেন, আর আল্লাহ ﷻ সেটির বিপরিত করার ইচ্ছা করলেন। যেমন, ঈসা আ. ইচ্ছা করলেন, অমুক ব্যক্তি আগামী কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। আর আল্লাহ ﷻ ইচ্ছা করলেন, আজ বিকেল পাঁচটায় তাকে মৃত্যু দেওয়া হবে। তাহলে এ

সময় কার কথা চলবে? ঈসা ﷵ এর কথা নাকি আল্লাহ ﷻ-র কথা?

যুবকটি বলল, আমার প্রভুর কথা।

কোন প্রভু? তোমাদের প্রভু তো তিনজন– আল্লাহ, তাঁর পুত্র ঈসা ও রুহুল কুদুস।

আমাদের প্রভুর কথা চলবে যিনি ঈসা ﷵ-র পিতা।

তাহলে ঈসা ﷵ কি ইলাহ নন? জানতে চাইলাম আমি।

তাহলে ঈসা ﷵ এর কথা চলবে। বলল যুবকটি।

বললাম, তাহলে প্রভু কি ইলাহ নন? কারণ, সন্তান তো তার প্রভুর কথা মতোই চলে। সন্তানের কথা মতো প্রভু চলে না। সুতরাং বোঝা গেল, তিনি ইলাহ নন। তাছাড়া ইলাহ তো তিনিই হতে পারেন যিনি চা চান তাই করতে পারেন।

তাহলে তাদের সবার কাথাই চলবে। বলল যুবকটি।

এটা কি করে হতে পারে? একই সময় একই ব্যক্তি একই সাথে জীবিত ও মৃত হবে, এটা তো সম্ভব নয়।

তাহলে, তাদের কারো কথাই চলবে না।

এটা তো সম্ভব নয়। কারণ, তারা তিনজনই তো ইলাহ? বস্তুত এখানে আসল কথা হল সেটিই, যেটি আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ﴾

> আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অন্য কোনো মা'বুদ নেই। [সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯১]

এরপর আল্লাহ ﷻ বলেন, যদি আমরা মেনে নিই যে তাঁর সাথে কোনো মা'বুদের অংশিদারিত্ব রয়েছে, তাহলে–

﴿اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ﴾

> (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ) থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের ওপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। [সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯১]

এই আয়াত এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ ﷻ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র। তাঁর কোনো সন্তান নেই। তাঁর রাজত্ব ও প্রভুত্বে কোনো শরিক নেই। কখনও কোনো সমস্যা তাকে গ্রাস করে না। তাই তার কোনো সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না। তিনি সুমহান। তিনি সুউচ্চ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমি তাকে বললাম, শোনো ইয়াসির! আমি তোমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি কি জানো আল্লাহ ﷻ কি বলেছেন? তিনি বলেছেন–

যদি তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তাহলে তিনি তাঁর সৃষ্টি হতে যাকে ইচ্ছা তাকেই গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সন্তানের মুখাপেক্ষি নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। জগতে তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

প্রিয় ভাইয়েরা! ঈসা عليه السلام সম্পর্কে এই হল তাদের ধারণা। তাদের বিশ্বাস। আমি সত্যিই তাদেরকে ভালোবাসি। তাদের কল্যাণ কামনা করি। অনেক খ্রিষ্টান ভাইদের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। যেমনটি আগেও উল্লেখ করেছি। তাদের সাথে আমার হাদিয়া বিনিময় হয়। কথাবার্তা হয়। আমি চাই না তারা এ বিশ্বাস নিয়ে এবং এ কথা বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করুক– হে আল্লাহ, আপনি তিন খোদার একজন। হে আমার রব! আমার উপাসনা কেবল আপনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমি আপনি ছাড়াও আরো দুজন ইলাহকে বিশ্বাস করি। তাদেরও উপাসনা করি।

অথচ এটা সুস্পষ্ট শিরক বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا﴾

তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। হয় তো এ কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহ্বান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহ কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদের গণনা করে রেখেছেন। কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। [সূরা মারয়াম, আয়াত : ৮৮–৯৫]

আল্লাহ ﷻ সন্তান গ্রহণ করেছেন– এ ধারণা পোষণ করা কারো জন্যেই বৈধ নয়। আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। ঈসা عليه السلام মারয়াম عليها السلام-র পুত্র। তিনি একজন নবী। আমাদের মহা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। সাহাবাদের চেয়েও আমরা তাঁকে বেশি ভালোবাসি। আমরা ভালোবাসি আমাদের রাসুল ﷺ-কে। ভালোবাসি ঈসা عليه السلام কে। ভালোবাসি সকল নবী-রাসুলকে। আমরা তাদেরকে আমাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। অন্যান নবী-রাসুলদের মতো ঈসা عليه السلام-র ওপর ঈমান আনাও আমাদের জন্য জরুরি।

কারণ, আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا * غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾

রাসুল বিশ্বাস রাখেন ওই সব বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তার পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৫]

ইনজিল কিতাব খুলে দেখুন

আল্লাহ ﷻ-র পাঠানো নবীদের মাঝে আমরা কোনো ন্যূনাধিক্য স্থাপন করি না। কোনো মুসলমানদের জন্যই এমনটি করা সমীচীন নয়। কেউ যদি বলে যে, সে ঈসা عليه السلام-র প্রতি ঈমান আনবে না কিংবা মুসা عليه السلام-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না– তাহলে এটা তার জন্য জায়েয হবে না। আমরা তাদের সবার ওপরে বিশ্বাস রাখি। তাদেরকে আল্লাহর পাঠানো নবী-রাসুল হিসেবে স্বীকার করি। কোনো নবী-রাসুল আল্লাহর সন্তান– এরূপ কোনো বক্তব্য কোনো আসমানী গ্রন্থে বিদ্যমান নেই। নেই খ্রিস্টানদের ইনজিলেও। আমি আমার খ্রিস্টান বিজ্ঞ ভাইদেরকে আহবান জানাচ্ছি, আপনারা ইনজিল কিতাবটি খুলুন। তাতে খুঁজে দেখুন। সেখানে কোথাও ঈসা عليه السلام আল্লাহ ﷻ-র সন্তান ছিলেন– এমন বক্তব্য খুঁজে পান কি না দেখুন। আমি নিশ্চিত আপনারা কখনই এমন কিছু খুঁজে পাবেন না।

পৃথিবীতে এখন চার ধরণের ইনজিল কিতাব রয়েছে। যার কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল– তা আপনারাই বলতে পারেন না। কোনটি আল্লাহর বাণী বা আদৌও কোনোটি আল্লাহর বাণী কি না– এ ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেন না। সেই চার ইনজিলেরও কোনোটিতে আপনারা এ ধরণের কোনো বক্তব্যের দেখা পাবেন না।

খ্রিস্টানদের আকিদা ভ্রান্ত। তাদের বিশ্বাস গলদ। তদুপরি তারা জানে যে, ঈসা عليه السلام কে আমরা সম্মানিত নবী হিসেবে মানি। তাঁর আদর্শের

অনুসরণ করি। তারা এটাও জানে যে, তিনি তাঁর পরে একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যার নাম হবে আহমদ। তিনি এভাবে বলেছিলেন– আমার পর অচিরেই একজন নবী আসবেন। তার নাম হবে আহমদ।

তিনি তাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার আদেশ দিয়ে গেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ সে সম্পর্কে বলেন–

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي اسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾

স্মরণ কর, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম আহমদ; অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। [সূরা ছাফ, আয়াত : ৬]

তাই মুহাম্মাদ ﷺ-র আগমনের পর সবার জন্য তাঁর অনুসরণ করা আবশ্যক হয়ে গিয়েছে।

মিশর বিজয়ের পর

ইতিহাস পড়ে দেখো, ওমর ইবনুল আস رضي الله عنه যখন মিশর বিজয় করলেন তখন মিশরে কিছু খ্রিস্টানের বসবাস ছিল। তারা ঈসা عليه السلام-র ধর্মের অনুসরণ করত। কিন্তু যখন তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বগুলো বাস্তবে অবলোকন করল। অনুধাবন করল ইসলামের উদারতা। তারা ভাবল, ঈসা عليه السلام-র ধর্মের পরে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে। ঈসা عليه السلام-র ধর্মটি ছিল তাঁর সময়ের মানুষদের জন্য নির্ধারিত। অতঃপর আল্লাহ ﷻ মুহাম্মাদ ﷺ-কে সর্বশেষ নবীরূপে পাঠালেন। তাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত বানালেন। মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল। তারা ঈসা عليه السلام-র অনুসরণ ছেড়ে মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুসরণ করতে লাগল।

শপথ আল্লাহর, আমি অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিস্টান ডক্টর সম্পর্কে জানি। জানি অনেক খ্রিস্টান ইঞ্জিনিয়ার ও পাদ্রী সম্পর্কেও– যারা খ্রিস্ট ধর্ম ছেড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

কোনো খ্রিস্টান পাদ্রি কি ইসলাম গ্রহণ করছে?

একটি প্রশ্ন। আমার সচেতন খ্রিস্টান বন্ধুদের কাছে। আপনাদের কি মনে আছে, সেই পাদ্রির কথা? যিনি ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন?

আপনাদের জবাব অবশ্যই এমন হবে– হ্যাঁ, আমরা এমন কয়েকজন খ্রিস্টান পাদ্রি সম্পর্কে জানি, যারা খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যেমন, শায়খ ইউসুফ ইসতেস। তিনি একজন আমেরিকান পাদ্রি ছিলেন। তার মতো আরো অনেক পাদ্রি রয়েছেন। যাদের লেখা বিভিন্ন বই-পুস্তক রয়েছে। টেলিভিশনে প্রোগ্রাম রয়েছে। ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট রয়েছে। তারা কোনো সাধারণ খ্রিস্টান ছিলেন না। ছিলেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

কোনো মুসলিম আলেম কি ইসলাম ত্যাগ করেছেন?

আরেকটি প্রশ্ন। আপনারা কি কখনও কোনো মুসলমান আলেমকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে দেখেছেন।

এর জবাবে আপনারা অবশ্যই বলবেন– না, আমরা এমন কাউকে দেখিনি।

এখন প্রশ্ন হল- কেন দেখেননি? কেন মুসলিম আলেম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে না। আমি এখানে কোনো সাধারণ ব্যক্তিদের কথা বলছি না। বলছি খ্রিস্ট ধর্মের পাদ্রিদের মতো ইসলাম ধর্মের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের কথা। কেন একজন পাদ্রি খ্রিস্ট ধর্মের অনুসরণীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছে? আপনার কাছে কি এর জবাব আছে? জানি নেই।

শুনুন। এর জবাব হল, তিনি ঈসা ﷺ-র অসিয়ত পালন করতেই এমনটি করেছেন।

তাই আপনিও যদি প্রকৃত অর্থে ঈসা ﷺ-কে ভালোবেসে থাকেন, তাহলে তিনি যে অসিয়ত করে গেছেন তা পালন করুন। কারণ, ঈসা عليه السلام কখনও একথা বলেননি যে, তোমরা আমার আমার ইবাদত করো। তিনি বলেছেন তোমরা আমার অনুসরণ করো।

যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا﴾

অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল: হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূনের বোন, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যভিচারিণী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল, যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বলল, আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। [সূরা মারয়াম : ২৭-৩০]

এটি ঈসা عليه السلام এর কথা ছিল। তিনি কখনও বলেননি যে, আমিই আল্লাহ। বলেননি আমি আল্লাহর পুত্র। বরং বলেছেন– আমি আল্লাহর বান্দা। তোমাদের মতোই আল্লাহর সৃষ্টি।

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন–

﴿قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

তিনি (ঈসা عليه السلام) বললেন, আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি

আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। [সূরা মারয়াম, আয়াত : ৩০-৩১]

হে আমার খ্রিষ্টান ভাইয়েরা! আমার মুসলিম ভাইদের মতো আমি আপনাদেরও কল্যাণকামী। আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। শপথ আল্লাহর, আমি আপনাদের মঙ্গলই কামনা করি। যেমন কামনা করি আমার সকল মুসলিম ভাইদের জন্য।

প্রিয় ভাইয়েরা! সব মানুষের মাঝেই রয়েছে মুক্তির কামনা। রয়েছে তার প্রতিপালকের প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও নিষ্কলুষ আন্তরিকতা। সবাই চায় তার প্রতিপালক তাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন।

আমারও আল্লাহ ﷻ-র কাছে একই প্রার্থনা। আল্লাহ ﷻ আমাকে ও আপনাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন। সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন। তিনি এক ও ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত– এই বিশ্বাস বুকে ধারণ করে তাঁর ইবাদতে মশগুল হবার তাওফীক দান করুন। আমিন।

তরবারির জোরে এসেছে কি ইসলাম?

একটি প্রশ্ন এখন সর্বত্রই শোনা যায়– ইসলাম কি এসেছে তরবারির জোরে? মানুষকে কি নিরূপায় হয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে? নাকি তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে, তৃপ্ত মনে, ভালোবেসে গ্রহণ করেছে ইসলাম?

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামকে কোনো অভিযানে পাঠাতেন। তখন তাদের সাথে থাকতো যুদ্ধাস্ত্র। থাকতো তীর, ধনুক, তরবারী। তারা সফর করত দূর দূরান্তে। যুদ্ধযানে চড়ে পাড়ি জমাতো মাঠ-ঘাট, মরু-প্রান্তর। মুখোমুখি হতো শত্রুপক্ষের। হতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ইসলাম কি এভাবে এসেছে ধরায়?

ইতিহাস তোমার সামনে। পড়ে দেখো। মুসলমানেরা কখনও কখনও কোনো দুর্গ অবরুদ্ধ করত। অবরোধ আরোপ করত কোনো দেশের ওপর। কখনও এক মাস, দু মাস বা আরো বেশি সময় ধরে চলতো এই অবরোধ। যেমন– একবার মুসলমানেরা বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছিল। রাসুল ﷺ অবরোধ করেছিলেন খায়বার। অবরোধ কালীন সময়ে তাদের মাঝে কখনও কখনও তীর বিনিময় চলতো। কখনও বা যুদ্ধ বেঁধে যেতো। হাতাহত হতো। কখনও বা ঘটতো অগ্নিকান্ডের মতো ঘটনাও।

এখন প্রশ্ন হল, ইসলাম কি এসব লড়াইয়ের হাত ধরেই পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে?

এর জবাব আমি দিচ্ছি। প্রথমেই আমি তোমাদের সামনে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ইসলাম কি তরবারির জোরে এসেছে, নাকি অন্য উপায়ে এসেছে– এ পরিসংখ্যান থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি, আমার অভ্যাস হল, আমি প্রতি ছয় মাসে কিংবা এক বছরে কখনও দু বছরে একবার হলেও জুমার খোতবায় মা-বাবার প্রতি সদাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমাকে প্রশ্ন করে, শায়খ! আজকের খোতবাটি আপনি ছয় মাস কিংবা এক বছর আগেও একদিন দিয়েছিলেন? আমি সেদিন আপনার পেছনে জুমার সালাত আদায় করছিলাম। একই খোতবা আজ আবারও দিলেন?

জবাবে আমি বলি, এর দুটি কারণ।

এক.

আমি প্রতিবারই খোতবার ধরণ পরিবর্তন করে থাকি। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, মা-বাবর প্রতি সদাচরণ বিষয়ে আমি আগেও খোতবা দিয়েছিলাম। তবে এবারের খোতবাটিতে আমি এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছি যা আগের খোতবায় বর্ণনা করিনি। তাছাড় দুটি খোতবার হাদিসগুলোও তো এক নয়।

দুই.

মা-বাবার প্রতি সদাচরণ– এ বিষয়ে যতবারই আলোচনা করা হোক না কেন প্রতিবারই এটি অনুভূতিকে নতুন করে নাড়া দেয়। ধরুন, গত বছর যখন আমি এ বিষয়ে আলোচনা করছিলাম তখন একটি কিশোরের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। বর্তমানে সে পনেরো কিংবা ষোলোতে পা রেখেছে। হতে পারে তার বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়েছে। তাই মা-বাবার সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে তার জানা দরকার। দরকার তাকে অসৎ সঙ্গা হতে সতর্ক করাও। কারণ, এ সম্পর্কিত আলোচনাগুলো মানুষ ভুলে যায়।

পূর্বের আলোচনায় ফেরা যাক। ইসলাম কি তরবারীর জোরে এসেছে নাকি অন্য উপায়ে এসেছে– বিষয়টি খানিক আলোকপাত করা যাক।

সুমামা বিন উসালের গল্প

আল্লাহ ﷻ রাসুল ﷺ-কে পৃথিবীবাসীর কাছে পাঠালেন। স্বজাতীয় কুরাইশরাই পরিণত হল তাঁর চরম শত্রুতে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অসহিঞ্চু করে তুললো তাঁর জীবন। রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি নতুন রাষ্ট্র গঠন করলেন।

গোটা মদিনা জুড়ে তখন ছিল পুরনো জড়াজীর্ন সব ঘরবাড়ি। একটির সাথে আরেকটি লাগোয়া। মাঝখানে মসজিদে নববী। মুসলমানদের পাশাপাশি মদিনায় ইহুদি ও মুনাফিকদেরও ছিল বসবাস। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত করত। একারণেই মদিনার সন্দেহভাজন ব্যক্তি কিংবা শত্রুপক্ষের গুপ্তচর অথবা অন্য কোনো কর্মকান্ডের জন্য অপরাধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শুরুতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

একদিনের কথা। কয়েকজন সাহাবি নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তারা মদিনার চারপাশ প্রদক্ষিণ করছিলেন। তারা এক ব্যক্তিকে মদিনার পাশ দিয়ে যেতে দেখলেন। লোকটি ইহরাম পরিহিত ছিল।

লোকটি চলছিল আর বলছিল–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ , اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُه وَمَا مَلَكَ.

আমি হাজির হে আল্লাহ! তোমার দরবারে হাজির। হে আল্লাহ! আমি হাজির। আপনার কোনো শরিক নেই। তবে একটি মাত্র অংশীদার যার মালিক আপনি এবং সে যেসকল জিনিসের মালিক সেগুলোর মালিকও আপনি।

সাহাবীরা তার কাছে এগিয়ে গেলেন। জানতে চাইলেন তার পরিচয়– তুমি কে?

আমি বনু হানিফা গোত্রের নেতা– সুমামা বিন উসাল। লোকটি জবাব দিল।

বনু হানিফা গোত্রের লোকেরা নজদ শহরে বসবাস করত। বর্তমান রিয়াদই হল তৎকালীন নজদ। সাহাবাগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

মক্কায় যাচ্ছি।

সাহাবাগণ ভাবলেন, ভৌগলিক দিক থেকে মক্কার অবস্থান রিয়াদের পশ্চিমে। তাই যে রিয়াদ থেকে মক্কা যেতে চায় সে উত্তর দিক দিয়ে মদিনা অতিক্রম করার কথা নয়। তাহলে উত্তর দিক দিয়ে মক্কা রওয়ানা হওয়া এই ব্যক্তিটি কে? সাহাবিদের সন্দেহ হল। তারা ভাবলেন এ নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হবে। কিংবা তার মনে অন্য কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। তারা তাকে ধরে মদিনায় নিয়ে গেলেন। মসজিদে নববিতে রাসুল ﷺ-র দেখা পেলেন না। তাই তারা তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। সালাতের সময় হল। রাসুল ﷺ মসজিদে এলেন। সালাত আদায় শেষে যথারীতি তিনি সাহাবিদের দিকে ফিরলেন। তারা রাসুল ﷺ-কে এই ব্যক্তির বিষয়টি অবগত করালেন।

রাসুল ﷺ অত্যন্ত সহমর্মিতার সাথে তার পরিচয় জানতে চাইলেন– কে তুমি?

আমি সুমামা বিন উসাল। লোকটি জবাব দিল।

তুমি কি নজদের বনু হানিফা গোত্রে নেতা?

হ্যাঁ।

রাসুল ﷺ তাকে রেখে সাহাবিদের কাছে এলেন। বললেন, তোমরা কাকে ধরে নিয়ে এসেছো জানো?

ইয়া রাসুলাল্লাহ! কে এই ব্যক্তি? সাবাবিরা জানতে চাইল।

ইনি বনু হানিফা গোত্রের নেতা সুমামা বিন উসাল। মক্কা থেকে গম, যব, ভুসিসহ যা কিছু আমদানি হয় সব তার নিয়ন্ত্রণে।

অতঃপর রাসুল ﷺ তার কাছে গেলেন। বললেন, সুমামা! ইসলাম গ্রহণ করো।

জবাবে সুমামা সোজা সাপ্টা বলে দিল– না, আমি ইসলাম গ্রহণ করব না।

রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কি চাও?

সে বলল, যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন।

আর যদি আপনি (এর বিনিময়ে) সম্পদ চান তাহলে যতটা খুশি দাবি করুন। আমার গোত্র আপনার চাহিদা পূরণ করবে । তারা মিলিয়ন দেরহাম দিতেও প্রস্তুত আছে।

রাসুল ﷺ তাকে সে অবস্থার উপর রেখে দিলেন।

পরদিন রাসুল ﷺ মসজিদে এলেন। সাহাবাদের নিয়ে জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। সুমামা সাহাবায়ে কেরামের কার্যকলাপ গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করল। তাদের কোরআন তেলাওয়াত শুনল। রাসুল ﷺ-র প্রতি তাদের বিনম্র আচরণ লক্ষ্য করল।

এভাবে পরের দিন রাসুল ﷺ আবার তাকে বললেন, হে সুমামা! আজ তোমার কী মতামত?

সে বলল, আমার মতামত সেটাই যা (গতকাল) আমি আপনাকে বলেছিলাম– যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি (এর বিনিময়ে) সম্পদ চান তাহলে যতটা খুশি দাবি করুন।

তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। তৃতীয় দিন আবার রাসুল ﷺ তার কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমামা আজ কিছু বলবে?

সে উত্তর দিল, আমি পূর্বে যা বলেছি, এখনও আপনাকে তাই বলব।

তখন রাসুল ﷺ কী করলেন? তিনি কি তরবারীরর মাধ্যমে তার ফয়সালা করলেন? তিনি কি তার ঘাড়ে তরবারী রেখে বললেন, সুমামা! ইসলাম গ্রহণ করো। নয়তো তোমার গর্দান কেটে ফেলব?

না ইসলাম এভাবে বিস্তার লাভ করেনি। কেননা,আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ٭ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যে গোমরাহকারী 'তাগুত'দের মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন, জানেন। [সূরা বাকারা : ২৫৬]

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন–

﴿فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ۚ

যার ইচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করবে, আর যার ইচ্ছা সে কুফুরী করবে। [সূরা কাহফ, আয়াত : ২৯]

ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। মক্কী জিন্দেগীতে রাসুল ﷺ ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলতেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا

হে লোকসকল! পড়– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা সফল হবে। [মুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৪২১৯]

তিনি কখনও কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন না। তাই রাসুল ﷺ যখন দেখলেন যে, সুমামার ইসলাম গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন তিনি সাহাবাদের বললেন, তোমরা সুমামার বন্ধন খুলে দাও। সাহাবিগণ বললেন, আমরা তাকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেব?

রাসুল ﷺ পুনরায় বললেন, সুমামার বন্ধন খুলে দাও।

সাহাবারা সুমামাকে ছেড়ে দিল।

মুক্ত হয়ে সুমামা তো হতবাক। এই মুক্তি তো তার কল্পনারও বাইরে। তার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছিল না। রাসুল ﷺ-র সুমহান চরিত্র ও ক্ষমার মহিমা তার ভুল ভেঙে দিল। তার চোখ খুলে দিল। সে মসজিদের নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করল। অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।

ইসলাম গ্রহণের পর সে রাসুল ﷺ-কে সম্বোধন করে বলল–

ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ, কিছুক্ষণ আগেও আপনার চেহারা ছিল আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত চেহারা; কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহর শপথ,

আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা ঘৃণ্য অপর কোনো দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহর কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অপ্রিয় কোনো শহর ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

বদলে গেল তালবিয়া

সুমামার ইসলাম গ্রহণ নিশ্চয়ই তরবারীর জোরে ছিল না। অতঃপর বিদায়ের পূর্বে সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিন। আমি ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছি।

রাসুল ﷺ তাকে বললেন, তুমি আগে তোমার ওমরা আদায় করো।

সুমামা ওমরা করার জন্য মক্কা গেল। আজ তার মুখে উচ্চারিত তালবিয়ার শব্দগুলো ভিন্ন। আজ সে তার পূর্বেকার শিরকী তালবিয়ার পরিবর্তে পাঠ করল–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

কুরাইশরা তার মুখে নতুন এই তালবিয়া শুনে, তাকে ঘিরে ধরল। তারা বলল, তোমার মুখে নতুন তালবিয়া শুনছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহরর রাসুল। মক্কার কাফেররা ভীষণ ক্ষুব্ধ করল। তারা তাকে অপদস্থ করল এবং খুব মারধর করল।

এটাই ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য। ইসলাম কখনোই মানুষকে তরবারীরর মাধ্যমে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করেনি। রবং যুগে যুগে কাফের-মোশরেকরাই মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করেছে।

খ্রিস্টান ক্রুসেডার কর্তৃক বাইতুল মাকদাস আক্রমণ। বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনুপ্রবেশ করে সেখানে চালানো তাদের ধ্বংসযজ্ঞের কথা আমরা আজও ভুলিনি। কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠি যেমনটি কখনোই করেনি।

আব্বাস رضي الله عنه দেখলেন, কাফেররা সুমামাকে মারধর করছে। তিনি বাঁধা দিলেন। বললেন, তোমরা জানো, তোমরা কাকে মারছো? ইনি বনু হানিফা গোত্রের সরদার। আল্লাহর কসম, তোমরা এমনটি করলে বনু হানিফা গোত্র থেকে একটি দানাও আর তোমাদের কাছে পৌঁছাবে

না। তোমরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছো। সে তোমাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে।

আব্বাস ﵁-র কথায় কাফেররা ভড়কে গেল। তারা তাকে ছেড়ে দিল।

সুমামা তাদের আচরণে খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি তার দেশে ফিরে গেলেন। গোত্রের সবাইকে তার অপমানের কথা জানালেন। বনু হানিফা গোত্রের কাছে খাদ্যশস্যের ভান্ডার। মক্কার লোকেরা এখানকার খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভরশীল। বনু হানিফা গোত্রের লোকেরা ঠিক করল তারা মক্কায় কোনো খাদ্যশস্য পাঠাবে না। তাই করা হল। এতে মক্কায় খাদ্যের অভাব পড়ে গেল। ফলে মক্কাবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ল।

তারা রাসুল ﷺ-র কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! সুমামা আমাদের ওপর খাদ্য-অবরোধ করেছে। রাসুল ﷺ সুমামা ﵁-কে অবরোধ তুলে নিতে বললেন। সুমামা ﵁ খাদ্য-অবরোধ তুলে নিলেন।

রাসুল ﷺ-র দাওয়াত দানের পদ্ধতি এমনই ছিল। আজকের দায়িগণও যা অনুসরণ করছেন।

একটি পরিসংখ্যান

আমি ডক্টর রাগেব আস সারজানির করা একটি পরিসংখ্যান দেখলাম। যেটিতে তিনি মুসলিম শহিদ ও কাফের মৃতের সংখ্যা নিয়ে কাজ করেছেন। পরিসংখ্যানটি এমন–

রাসুল ﷺ-র ৬৩ বছরের জীবনে মুসলমানরা সর্বমোট ৬৫টি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এরমধ্যে ২৭টিতে রাসুল ﷺ নিজে উপস্থিত ছিলেন। আর ২৮টিতে রাসুল ﷺ উপস্থিত ছিলেন না। এ ৬৫টি যুদ্ধে মুসলমান শহীদের সংখ্যা ২৬২ জন। আর কাফেরদের মৃতের সংখ্যা ১০২২ জন। এই অনুপাতে মুসলিমদের ১"%" লোক শহীদ হয়েছেন। আর অমুসলিমদের ১.৫"%" লোক নিহত হয়েছে।

৬৫টি যুদ্ধের উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম কখনও হত্যাযজ্ঞ কামনা করে না।

পক্ষান্তরে, আমরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫ মিলিয়ন ৬ লাখ। আর এই যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৪৫ মিলিয়ন ৮ লাখ! তার মানে মোট সৈন্যসংখ্যা থেকেও নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি। কারণ, এই নিহতদের অধিকাংশই ছিল বেসামরিক লোক।

এ যুদ্ধে এক দেশের সৈন্যরা অন্য দেশে প্রবেশ করে সেখানকার নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সাধারণ জনগণকে নির্বিচারে গুলি করে ও বোমা মেরে হত্যা করেছে। সেজন্যেই নিহতের সংখ্যা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যসংখ্যা হতে এতো বেশি হয়েছে। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধগুলো কখনোই এমন ছিল না।

রাসুল ﷺ যখন কোনো অঞ্চলে সৈন্যদল পাঠাতেন, তখন তিনি বলে দিতেন, তোমরা কোনো মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। হত্যা করবে না কোনো আহত ব্যক্তিকেও ।

যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ

বদরের যুদ্ধে কাফের শ্রেণি পরাজিত হল। বহু সংখ্যক মুসলমানদের হাতে বন্দি হল। রাসুল ﷺ তাদের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করলেন। তিনি বন্দিদেরকে উত্তম আপ্যায়নের নির্দেশ দিলেন।

মুসয়াব বিন উমাইর বলেন, আমরা বন্দিদের পাহারার দায়িত্বে ছিলাম। আমরা তাদেরকে খেজুর খেতে দিয়ে নিজেরা শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। তারা আমাদেরকে বলতো তোমরাও খেজুর নাও।

আমরা বলতাম, না। রাসুল ﷺ আমাদেরকে তোমাদের প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ সাহাবায়ে কেরামের বদান্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন—

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দিকে আহার্য দান করে। [সূরা দাহর, আয়াত : ৮]

ইসলাম যদি তরবারীর মাধ্যমে প্রসার লাভ করত, তাহলে অন্তত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কাফেরদের সাথে প্রতিটি বিষয়ের ফয়সালা তরবারীর মাধ্যমেই করার কথা ছিল। তাই নয় কি? অথচ বাস্তবতা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা

৭৩ বছর ধরে রাশিয়াতে কমিউনিজমের জয়জয়কার চলেছে। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল অস্ত্রের মাধ্যমে। আর এ কথা আমাদের সকলেরই জানা যে, কমিউনিজমের প্রসার লাভ মানে ধর্মহীনতাকে উসকে দেওয়া ও বস্তুবাদের প্রসার ঘটানো।

সেই কমিউনিজম আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে। কারণ, এটি ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মের বিরোধিতা করেছিল। সুতরাং, জোরজবরদস্তি ও শক্তি প্রয়োগ কখনও কল্যাণ বয়ে আনেনি।

ইসলাম প্রসার লাভ করেছে মানুষের পরিতুষ্টি ও গ্রহণযেগ্যতার উপর নির্ভর করে। কারণ, আল্লাহ ﷻ আদেশ দিয়েছেন–

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

> আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে। [সূরা নাহল, আয়াত : ১২৫]

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচার

ইন্দোনেশিয়া। যেটি মুসলিম বিশ্বের একতৃতীয়াংশ। জনসংখ্যা ২৩০ মিলিয়ন। যাদের সবাই মুসলমান। অথচ সেখানে কোনো অস্ত্রধারী প্রবেশ করেনি। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে সেখানে ইসলামের বিকাশ ঘটে। সে দেশের দীন প্রচারকগণ আলেম ছিলেন না। ছিলেন ব্যবসায়ী। কিন্তু তাদের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা দেখে সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা মসজিদ নির্মাণ করে। জনগণ সালাত আদায় করা শুরু করে। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে মুসলমানদের সংখ্যা। বাড়তে থাকে মসজিদ। এভাবেই ইন্দোনেশিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম।

ভারতে ও জার্মানে ইসলামের প্রচার-প্রসার

তাকাও ভারতের দিকে। সেখানেও তো কেউ অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেনি। সেখানে ইসলামের বিকাশ ঘটেছে বণিক ও বিভিন্ন ইসলামি গ্রন্থের মাধ্যমে। বিশ্বের আরো যেসব দেশে বর্তমানে ইসলামের প্রসার ঘটছে সেখানেও অস্ত্রের প্রয়োগ হচ্ছে না। উদাহরণত জামার্নির কথা বলা যায়। জার্মানের রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান বলছে, সেখানে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত এভাবে বাড়ছে যে, গড়ে প্রতি দু ঘন্টায় একজন করে মুসলমান হচ্ছে। এটি ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯ এবং ২০১০ সালের পরিসংখ্যান। এরা কি কোনো অস্ত্রের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে? নিশ্চয়ই না।

এটা হল জার্মানির রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান। যাতে দেখা যায় প্রতিদিন গড়ে ১২ জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। কিন্তু বাস্তবে দৈনিক ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা ১২ জনেরও অধিক। কারণ, আমি সেখানকার মুসলিম ভাইদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাদের ভাষ্যমতে, প্রত্যহ ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যানের চেয়ে আরো বেশি।

সুতরাং, উদারতা ও বদান্যতার মাধ্যমেই ইসলামের প্রসার ঘটেছে– এটি আজ প্রমাণিত সত্য।

তবে, তরবারী বা অস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ঘটেছে একথা বলা যেমন ভুল, তেমনি জিহাদ ছাড়া ইসলামের প্রসার ঘটেছে একথা বলাটাও ভুল।

বরং, দুটির সমন্বয়েই ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মুসলমানদের ক্রমবৃদ্ধি ঘটেছে। অর্থাৎ, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে যেমন ইসলামের প্রসার ঘটেছে। তেমনি মুসলমানদের উত্তম আচরণ, সৌহার্দ্য ও উদারতা দেখেও মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করুন। আমাদের জীবনকে বরকতময় করুন। সর্বদা তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকার তাওফিক দিন।

রাসুল ﷺ- র মো'জেযা

ফজর সালাতের প্রতি গুরুত্ব

রাসুল ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসে বসবাস করতে লাগলেন। মদিনার জীবনে তিনি প্রায়ই সাহাবীদেরকে নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সফর করতেন। এমনি এক সফরের ঘটনা। সাহাবাদেরকে নিয়ে রাসুল ﷺ সফর করছেন। রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারেও উষ্ট্রীদল আরোহীদের নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে। কয়েকজন সাহাবি উষ্ট্রীর রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলছে। কারণ, বাহন-জন্তুর সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। তাই পালা বদল করে উটে আরোহন করতে হতো। এভাবে তারা অতিক্রম করছিলেন দীর্ঘ পথ। গভীর রাত পর্যন্ত সফর প্রলম্বিত হল। সারাদিনের দীর্ঘ পথযাত্রায় সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা মনে মনে কামনা করছিল, রাসুল ﷺ যদি এখন বিশ্রামের কথা বলতেন।

এদিকে রাসুল ﷺ-ও দেখলেন আরোহী এবং বাহন উভয়েই ক্লান্ত। তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামক যাত্রা বিরতি করতে বললেন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ফজরের সালাতের জন্য সবাইকে জাগিয়ে দেয়ায় দায়িত্ব কে নেবে? দীর্ঘ সফরের ধকলে সবাই ক্লান্ত। রাসুল ﷺ সাহাবাদের থেকে জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কে ফজরের সালাতের সময় আমাদেরকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব পালন করবে?

বেলাল رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ইনশাআল্লাহ, আমি এ দায়িত্ব পালন করব।

রাসুল ﷺ তাকেই দায়িত্ব দিলেন। বেলাল رضي الله عنه সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসুল ﷺ-ও ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। বেলাল ﷺ অন্ধকারে সালাত আদায় করছিলেন। পরম প্রিয় রবের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। এভাবে সালাত, কোরআন তেলাওয়াত ও দোআ-প্রার্থনায় রাতের অনেকটা সময় কেটে গেল তার। এখন রাতের শেষ ভাগ। ফজর হতে খুব বেশি দেরি নেই। ঠিক এ সময়ে তিনি উটের ওপর হেলান দিয়ে ফজরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে ফজরের সময় পার হয়ে গেল। প্রভাতের শুভ্র আলোয় আলোকিত হল পৃথিবী। রাসুল ﷺ-ও সাহাবায়ে কেরাম তখনও ঘুমিয়ে আছেন।

হঠাৎ ওমর ﷺ জেগে ওঠলেন। তিনি বললেন, হায়, সূর্যের কিরণ আমাদের জাগ্রত করেছে। জেগে ওঠলেন, রাসূল ﷺ-ও। দেখলেন বেলাল ﷺ গভীর ঘুমে বিভোর। কাছে গিয়ে তাকে ডেকে বললেন, হে বেলাল! আমাদের সাথে তোমার কথা কি ছিল?

বেলাল ﷺ বললেন, আপনাদেরকে যা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমাকেও তাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

রাসুল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম বেলাল ﷺ-র ওপর রাগান্বিত হলেন।

লক্ষ্য করো, রাসুল ﷺ ও সাহাবাদের ফজরের সালাতের প্রতি কতটা গুরুত্ব ছিল। ফজরের সালাত আদায়ের জন্য তারা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এরপর রাসুল ﷺ বললেন—

অন্য কোথাও চলো' এটা এমন স্থান যেখানে শয়তান উপস্থিত হয়েছে।

তখন সকলে সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তবে এক সাহাবী সালাত আদায় করলেন না। রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সালাত আদায় করলে না কেন?

সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার শরীর অপবিত্র। পানির অভাবে পবিত্র হতে পারিনি। অল্প কিছু পানি আছে। যা দিয়ে অযু করা যাবে।

অথচ আমার গোসল করা প্রয়োজন। তাই সালাত আদায় করতে পারিনি।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার পবিত্র হওয়ার জন্য পবিত্র মাটিই যথেষ্ট'।

মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি হল- দু হাত মাটিতে রাখা। তারপর তা দিয়ে মুখমন্ডল ও দু হাত কনুইসহ মাসাহ করা। এ পদ্ধতিকে তায়াম্মুম বলে। তায়াম্মুম করার পর যদি পানি পাওয়া যায় তখন গোসল করে নিতে হয়। যেমনি নবী ﷺ বলেছেন,

'পবিত্র মাটি মুমিনের জন্য পবিত্রকারী; যদি দশ বছরও পানি পাওয়া না যায়। কিন্তু যখন পানি পাবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে এবং পানি দ্বারা চামড়া ভিজিয়ে নেবে'। [সুনানে আবু দাউদ : ৩৩৩]

রাসুল ﷺ লোকটিকে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে বললেন।

স্বল্প পানিতে বরকতের ফোয়ারা

অতঃপর পুনরায় সফর শুরু করলেন। এদিকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে নেই পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা। রাসুল ﷺ আলী رضي الله عنه সহ আরো কয়েকজন সাহাবীকে পানি খোঁজার দায়িত্ব দিলেন। আলী رضي الله عنه ও কয়েকজন সাহাবী উটে চড়ে বিরাণ মরুভূমিতে পানির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তারা পথ চলছিলেন আর চারিদিকে চোখ বুলাচ্ছিলেন। সজাগ দৃষ্টিতে পানির উপস্থিতি তালাশ করছিলেন। হঠাৎ দূরে উটের ওপর বসা এক মহিলাকে দেখতে পেলেন। তারা মহিলাটির কাছে গেলেন। দেখলেন তার কাছে ছাগল ও ভেড়ার চামড়ায় তৈরী বিশাল আকারের দুটি মশক। তারা মহিলার কাছে পানির সন্ধান চাইলেন।

মহিলাটি বলল, একদিন ও এক রাতের পথ অতিক্রম করার পর তোমরা পানির দেখা পাবে। সাহাবায়ে কেরাম মহিলাটিকে বললেন, আপনি আমাদের সাথে চলুন।

কোথায়? মহিলা জানতে চাইল।
আল্লাহর রাসুলের কাছে।

মহিলা জিজ্ঞেস করল, ইনাকেই কি সাবিউন (صابئ) বলা হয়? (তখন স্বধর্ম পরিত্যাগ কারীদের আরবে এ নামে ডাকা হতো।)

সাহাবিরা বললেন, হ্যাঁ, ইনিই সেই ব্যক্তি।

সাহাবায়ে কেরাম মহিলাটিকে রাসুল ﷺ-র কাছে নিয়ে এলেন। রাসুল ﷺ মহিলাটির সাথে কোমল আচরণ করতে বললেন। তিনি মহিলার পানির মশক দুটি নামানোর নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মশক দুটি নামালেন। রাসুল ﷺ তাদেরকে একটি মশকের মুখ খুলতে বললেন। সাহাবিগণ আদেশ পালন করলেন। রাসুল ﷺ আল্লাহ ﷻ-র কাছে বরকতের দোআ করে তাতে ফুঁ দিলেন। এরপর মশকের মুখ আটকে দিলেন।

এবার তিনি দ্বিতীয় মশকটি খুলতে বললেন। সাহাবায়ে কেরাম খুললেন। রাসুল ﷺ আল্লাহ ﷻ-র কাছে বরকতের দোআ করে মশকে ফুঁক দিয়ে সেটির মুখ বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এই মশক দুটি থেকে সকলের পানির পাত্রগুলোকে পূর্ণ করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবিগণ তাদের পাত্রগুলোতে পানি ভর্তি করতে লাগলেন। মহিলাটি অপার বিস্ময় নিয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। সে মনে মনে ভাবছিল, মাত্র দুটি মশকের পানি দিয়ে গোটা একটি সৈন্যদলের পানির প্রয়োজন মেটানো কি করে সম্ভব? সে দেখছিল, সাহাবিরা এসে মশকের নিচে তাদের পাত্রগুলো রাখছেন। মশক থেকে পানি পড়ে তাদের পাত্রগুলো ভরে যাচ্ছে। এভাবে একের পর এক সবাই তাদের সঙ্গো থাকা পাত্র গুলো পূর্ণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে গোটা সৈন্যদলের সকলে এ দুটি মশক থেকে তাদের পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। মহিলাটি অবাক অপলক নেত্রে কেবল সে দৃশ্য অবলকন করল।

রাসুল ﷺ গোসল আবশ্যক সাহবীকে পানি নিয়ে গোসল করতে বললেন এবং সাহাবাদেরকে মশক দুটির মুখ বন্ধ করে মহিলার উটের পিঠে তুলে দিতে বললেন। ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশার্থে তার সাথে উত্তম আচরণ করতে বললেন। সাহাবীদের বললেন নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে খাবার দিতে।

সাহাবায়ে কেরাম মহিলাটির জন্য খাবার সংগ্রহ শুরু করলেন। কেউ খেজুর, কেউ রুটি, কেউ ছাতু নিয়ে এলেন। একটি কাপড়ের মধ্যে খাবারগুলো একত্রিত করা করল। মহিলাটি তার উটে চড়ে বসলেন। যে পরিমাণ পানি সে নিয়ে এসেছিল সবটুকুই তার কাছে রয়েছে। একটুও কমেনি। উপরন্তু সাহাবায়ে কেরম মহিলাটির হাতে খাবার ভর্তি কাপড়ের গাটুরি তুলে দিলেন।

রাসুল ﷺ বললেন, আমরা তোমার পানি সামান্য কম করিনি। এই খাবারগুলো তোমার সন্তানদের জন্য নিয়ে যাও।

সীমাহীন বিস্ময় আর অপার মুগ্ধতা নিয়ে মহিলা তার গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। তবে এটি ছিল তার দেখা জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। মরু পথ করে স্বগোত্র পানে এগিয়ে চলছে সে। মাথায় কেবল বারবার একটি চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে– এটা কী করে সম্ভব? এমন আশ্চর্য ঘটনা কী করে ঘটতে পারে!

মহিলাটি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসুল ﷺ এর এই আচরণ ছিল একজন অমুসলিম নারীর সাথে। এ যেন কোরআনের সেই আয়াতেরই সত্যায়ন–

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾

> আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭]

তিনি মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্যেই রহমত স্বরূপ। তিনি যেমন বড়দের জন্য রহমত, তেমনি ছোটদের জন্যেও রহমত। ক্রীতদাসের জন্য যেমন রহমত, স্বাধীনদের জন্যেও তেমন রহমত। জগতবাসীর জন্য দয়া ও কোমলতা নিয়ে তিনি আগমন করেছেন পৃথিবীতে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

> আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। [আল ইমরান : ১৫৯]

তাই তো মহিলাটি যদিও কাফের, পথভ্রষ্ট ও মূর্তিপূজক ছিল, তথাপি আল্লাহ রাসুল ﷺ তার সাথে উত্তম আচরণ করলেন।

মহিলাটি এমন জনশূন্য, অনুর্বর মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিল, যেখানে কোনোভাবে পথ হারালে মৃত্যু নিশ্চিত। অবশেষে সে তার গোত্রের নিকট পৌঁছলে। তার গোত্রের লোকেরা তাঁবুতে বসবাস করত। তারা তাকে দেখে বলল, কি ব্যাপার, আজ তোমার এতো দেরি হয়েছে কেন?

মহিলাটি বলল, আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যাদুকরকে দেখে এসেছি। অতঃপর সে তাদের নিকট রাসুল ﷺ-র মু'জেযার অনুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরল।

এ ঘটনার বেশ কয়েক দিন পরের কথা। রাসুল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াতের কাজে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠালেন। তারা যতবারই সেই মহিলাটির গোত্রের পাশ দিয়ে যেতেন, পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। তারা ডানে বামে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু মহিলার গোত্রের ওপর আক্রমন করতেন না।

এ দৃশ্য দেখে মহিলা তার গোত্রের লোকদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মনে হয় মুসলিম সৈন্যরা বারবার তোমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে অথচ আক্রমন করছে না এই আশায় যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তাছাড়া আমি স্বচোক্ষে যে নিদর্শন দেখেছি তা তোমরা কীভাবে অস্বীকার করবে?

অতঃপর মহিলার কথায় তার গোত্রের সকলে ইসলাম গ্রহণ করল। সেদিন সেই মরুভূমির বুকে মহিলাটি রাসুল ﷺ-র যে মোজেযা দেখেছিলেন, সাহাবাগণ এরূপ ঘটনা অনেকবারই দেখেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ﴾

আমি আমার রাসুলগণকে নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি। [সূরা হাদিদ, আয়াত : ২৫]

অর্থাৎ, এমন স্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে প্রমানিত হয় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নবী। এজন্য আল্লাহ ﷻ যত নবী পাঠিয়েছেন তাদের সাথে এমন নিদর্শন দিয়েছেন যেগুলো তাদের নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করত। তাই রাসুল ﷺ ও আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ অনুযায়ী সময়োপযোগী মোজেযা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

হাত থেকে পড়া পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ

হোদায়বিয়া সন্ধির দিন প্রকাশ পেয়েছিল আরেকটি মোজেযা। সেকালে হোদায়বিয়ার অবস্থান ছিল মক্কার বহিরাঞ্চলে। বর্তমানে এটি মক্কা আভ্যন্তরীণ একটি এলাকা। রাসুল ﷺ চৌদ্দশত সাহাবি নিয়ে ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে হোদায়বিয়াতে পৌঁছলেন। ঘটনার বর্ণনায় জাবের رضي الله عنه বলেন–

হোদায়বিয়া সন্ধির দিনে সাহাবীগণ খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। রাসুল ﷺ-র সামনে অজু করার জন্য পানির পাত্র রাখা হল। তিনি অজু শুরু করবেন, এমন সময় সাহাবিগণ হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এল।

রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! পুরো বাহিনীতে আপনার সমানে রাখা এই এক পাত্র পানি ব্যতিত ওযু-গোসল কিংবা পান করার মত আর কোন পানি নেই।

রাসুল ﷺ সত্য নবী ছিলেন। তিনি ভাবলেন, সৈন্যদল অনেক বড়। চৌদ্দশত। এত লোকের ওযু-গোসল ও পান করার মতো কোনো পানি নেই । তিনি তাঁর পবিত্র হাত পানির পাত্রটিতে ডুবিয়ে ধরলেন এবং আল্লাহ ﷻ-র নিকট দোআ করলেন।

জাবের رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুল যখন পানিতে হাত রাখলেন, আমি দেখলাম রাসুল ﷺ-র হাত মোবারকের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ঝরণার মত করে পানি বের হচ্ছে। পাত্রটি পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। গোটা মুসলিম বাহিনীর কাছে যত পাত্র ছিল,

আমরা সমস্ত পাত্রে পানিতে পূর্ণ করে নিলাম। সবাই ওযু করলাম। তৃপ্তিভরে পানি পান করলাম। জাবের رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা কতজন ছিলেন?

তিনি বললেন, আমরা চৌদ্দশ সাহাবি ছিলাম। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা যদি এক লক্ষ মানুষও থাকতাম, তাহলেও এ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো।

আহা! রাসুল ﷺ এর প্রতি কি আশ্চর্য বিশ্বাস ছিল সাহাবীদের। তিনি বললেন আমরা যদি এক লক্ষও থাকতাম তাহলেও পানির ঘাটতি হতো না, কিন্তু আমরা ছিলাম চৌদ্দশত।

মরুভূমির প্রান্তরে মহিলাটি যখন রাসূল ﷺ এর মোজেযা দেখেছিলেন, তখন তিনি মুসলমান ছিলেন না। মোজেযা দেখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসুল ﷺ এর বিভিন্ন মোজেযা প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন ইসলাম গ্রহণের পরও।

বিস্ময়কর ঘটনার সাক্ষী

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যিনি সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনার সাক্ষী তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه। তিনি তখন বয়সে কিশোর। কুরাইশ গোত্রের এক সর্দার উকবা ইবনে আবু মুইতের বকরি চরাতেন তিনি। লোকেরা তাঁকে ইবন উম্মু আবদ বলে ডাকতো। তবে তাঁর নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম মাসউদ, কুনিয়াত আবু আবদির রহমান এবং মাতার নাম উম্মু আবদ।

তার গোত্রে যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, সে সম্পর্কে নানা খবর এ কিশোর ছেলে সবসময় শুনতেন। তবে অল্প বয়স এবং বেশীরভাগ সময় মক্কার সমাজ জীবন থেকে দূরে অবস্থানের কারণে বিষয়টি তিনি গুরুত্ব দিতেন না। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে উঠে উকবার বকরির পাল নিয়ে মক্কার আশপাশের অঞ্চলে বের হয়ে যেতেন। সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরতেন।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও সেই কিশোর আব্দুল্লাহ বকরি চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, দুজন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন এত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত যে, তাঁদের ঠোঁট ও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দুটি সালাম জানিয়ে বললেন,

হে বৎস! এ বকরিগুলো থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দাও। আমরা পান করে পিপাসা নিবারণ করি।

ছেলেটি বলল, বকরিগুলো তো আমার নয়। আমি এগুলোর রাখাল ও আমানতদার মাত্র।

লোক দুটি তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাদের মুখমন্ডলে এক উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠল। তাদের একজন আবার বললেন, বেশ, তাহলে গর্ভহীনা এবং স্তনে দুধ নেই এমন একটি বকরী দাও।

ছেলেটি নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট্ট বকরীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে বকরিটির স্তনে হাত বোলালেন। পাহাড়সম বিস্ময় নিয়ে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখছিল আর মনে মনে বলছিল, গর্ভহীনা ও দুধ-শূন্য স্তন থেকে কী করে দুধ আসবে? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষনের মধ্যেই বকরিটির ওলান ফুলে ওঠল। এবং তা তেকে প্রচুর পরিমাণ দুধ বের হতে লাগল।

দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে নিয়ে বাঁটের নীচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করলেন এবং তাকেও পান করালেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সেই পূণ্যবান লোকটি বকরির ওলানটি লক্ষ্য করে বললেন, চুপসে যাও। আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল।

তারপর আমি সেই পূণ্যবান লেকটিকে অনুরোধ করলাম, আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন।

তিনি বললেন, তুমি তো শিক্ষিত বালকই।

ইসলামের সাথে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের পরিচিতির এটাই প্রথম গল্প। এ মহাপূণ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ। আর তাঁর সঙ্গীটি ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এবং রাসুল ﷺ এর কাছ থেকে সত্তরটি সূরা শিখলাম।

এ সবই ছিল রাসুল ﷺ-র নবুওয়াতের অনুপম নিদর্শন। তাঁর নিদর্শনের ধারা অদ্যবধি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, পবিত্র কোরআন। এটি রাসুল ﷺ-র নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন।

আল্লাহর ﷻ-র নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিন। হে অন্তরের মালিক! আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার আনুগত্যে অবিচল রাখুন। আমিন।

অহংকার পতনের মূল

অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য মানুষকে ধ্বংসের অতলে পৌঁছে দেয়। নিয়ে যায় কুফুরির শেষ প্রান্তে। রাসুল ﷺ বলেছেন–

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

যার অন্তরে বিন্দু পরিমান অহংকার থাকাবে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [মুসলিম : ২৭৫]

তিনি আরো বলেন–

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ النَّاسِ

কেয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে আল্লাহ ﷻ অতি ক্ষুদ্রাকারে ওঠাবেন। [মুসনাদে আহমাদ : ৬৬৭৭]

অহংকারের করুণ পরিণতি

উমর رضي الله عنه-র শাসনামলে গাসসানের রাজা ছিল জাবালা ইবনে আইহাম। সে ইসলাম গ্রহণ করে উমর رضي الله عنه-র কাছে তার সাথে দেখা

করার অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠাল। উমর رضي الله عنه অনেক খুশি হলেন। তিনিও জাওয়াবী চিঠি পাঠালেন। লিখলেন যদি তুমি আমাদের কাছে আস, তাহলে তোমার ওপর সেসব বিষয় আবশ্যক হবে যা আমাদের ওপর আবশ্যক। আর সেসব বিষয় নিষিদ্ধ হবে যা আমাদের ওপর নিষিদ্ধ।

অনুমতি পত্র পেয়ে জাবালা পাঁচশত ঘোড় সওয়ার নিয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হল। মদিনার কাছাকাছি পৌঁছার পর সে স্বর্নখচিত পোশাক পরিধান করল। মাথায় হীরাখচিত মুকুট পরল। সাথে আসা সৈন্যদেরকেও পরিধান করাল মূল্যবান পোশাক-আশাক। অতঃপর সে প্রবেশ করল মদিনায়। মদিনার লোকজন তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মহিলা ও বাচ্চারাও তাকে এবং তার দলবলকে একনজর দেখার জন্য ভীড় জমাল।

অতঃপর সে উমর رضي الله عنه-র দরবারে প্রবেশ করল। তিনি তাকে অভিবাদন জানালেন। নিজের পাশে বসালেন। তাকে যথাযথ আদর আপ্যায়ন করলেন। তখন হজের মওসুম চলছিল। উমর رضي الله عنه হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। জাবালাও তার সাথে রওয়ানা হল।

জাবালা যখন বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করছিল, তখন বনি ফাযারাহ গোত্রের এক দরিদ্র লোকের পায়ের নিচে জাবালার বহুমূল্য ইহরামের এককোণা অসর্তকতায় চাপা পড়ে গেল। জাবালা ক্ষুব্ধ হয়ে তার দিকে তাকাল এবং তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। চড়টি সে এতোটাই জোরে মেরেছিল যে, লোকটির নাকের হাড্ডি ভেঙ্গে গেল। লোকটি উমর رضي الله عنه-র কাছে নালিশ করল।

তিনি জাবালাকে ডেকে আনলেন। বললেন, হে জাবালা! তওয়াফ অবস্থায় তোমার মুসলমান ভাইয়ের গায়ে হাত তুলতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করল ?

জাবালা বলল, ওই বেটা আমার কাপড় মাড়িয়ে দিয়েছে। নেহাত কা'বার সম্মান রক্ষার্থে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নইলে আমি তাকে মেরেই ফেলতাম।

উমর ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ? তাই এখন হয় তুমি তাকে যে কোনভাবে সন্তুষ্ট করবে, নয়তো কিসাস অনুসারে এই লোকটি তোমাকে চড় মেরে প্রতিশোধ নেবে।

জাবালা বলল, অসম্ভব! আমি একজন রাজা আর সে একজন দরিদ্র লোক।

উমর ﷺ বললেন, হে জাবালা! ইসলাম তোমার ও তার মাঝে সমতার বিধান কায়েম করেছে। তোমরা দুজনই মুসলিম। তাই আইনের দৃষ্টিতে দুজনই সমান। তাকওয়া ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা তুমি তার থেকে উৎকৃষ্ট হতে পারো না।

জাবালা বলল, যে ধর্মে একজন রাজা আর ফকির সমান, সে ধর্মের আনুগত্য আমি করব না। এই লোকটি আমাকে আঘাত করলে আমি ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় খ্রিষ্টান হয়ে যাব। (নাউযুবিল্লাহ)

উমর ﷺ গর্জে উঠে বললেন, তোমার মত হাজারো জাবালা যদি ইসলাম ত্যাগ করে চলে যায়, তবু ইসলামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধানের লঙ্ঘন হতে পারে না। ইসলাম কাউকে জোর করে মুসলমান বানায় না। তবে মনে রেখ, ইসলাম ত্যাগ করা এত সহজ নয়। কারণ, ইসলামে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

উমর ﷺ-র শেষ কথাটি শুনে জাবালা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সে বলল, আমিরুল মুমিনিন! আমাকে আগামী কাল পর্যন্ত সময় দিন।

উমর ﷺ বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সময় দেওয়া হল।

অতঃপর সেদিন গভীর রাতে জাবালা ও তার সাথী-সঙ্গীরা মক্কা থেকে বের হয়ে কুসতুনতুনিয়ার দিকে পালাল এবং সেখানে গিয়ে সে খ্রিষ্টান হয়ে গেল।

এবার আক্ষেপের পালা

তারপর সময় গড়াল। কালের গর্ভে বিলীন হল বহু বছর। জগতের বহু স্বাদের বস্তু বিস্বাদ হল। বহু মিষ্টান্ন তিক্ততায় রূপ নিল। জাবালার জন্য আক্ষেপ ছাড়া বাকি রইল না কিছুই। সে যখন তার অতীত ইসলামী

জীবনের কথা স্মরণ করত, তখন তার মনের ক্যানভাসে সালাত-সওমের সেই অনাবিল সৌন্দর্যের স্মৃতি ভেসে ওঠত। ইসলাম ত্যাগের আফসোস তখন তাকে একশ তরবারীর ধারালো ফলা হয়ে আঘাত করত। সে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে কৃত নাফরমানীর জন্য লজ্জিত হত।

সে বলত–

تَنَصرتِ الأشْرَاف مِنْ عِارِ لطمَةٍ * وَمَا كَانَ فِيْهَا لَوْ صَبَرَت لَهَا ضَرَر

تَكنفنِيْ مِنْهَا لجَاج وَنَخْوَةٍ * وَبِعْتُ لَهَا الْعَيْن الصَّحِيْحَةِ بِالْعوْر

فَيَالَيْت أُمِّيْ لَمْ تَلِدْنِيْ وَلَيْتَنِيْ * رَجَعْت إِلى الْقَوْلِ الَّذِيْ قَالَ لِي عُمَر

وَيَالَيْتَنِيْ أرْعَى الْمَخَاضَ بِقَفْرَةٍ * وَكُنْتُ أَسِيْرُ فِيْ رَبِيْعَةَ أَوْ مُضَر

وَيَالَيْتَ لِيْ بِالشَّامِ أَدْنى مَعِيْشَة * أُجَالِسُ قَوْمِيْ ذَاهِب السَّمْعِ وَالْبَصَر

অভিজাত ব্যক্তি একটি থাপ্পড়ের ভয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেল,

অথচ সে যদি সবর করত, তাহলে তার হতো না কোন ক্ষতি।

আহা! অহংকার ও অহমিকা ঘিরে ফেলেছিল আমায়,

তাই তো সুস্থ চক্ষুর বিনিময়ে আমি কিনেছি অন্ধত্ব।

হায়! আমার মা যদি জন্মই না দিত আমায়!

হায়! আমি যদি মেনে নিতাম উমরের কথা।

হায়! আমি যদি কোন চারণভূমিতে উটের রাখাল হয়ে উট চরাতাম।

ঘুরে বেড়াতাম রাবিয়া ও মুজার গোত্রে ।

হায়! আমি যদি জীবন যাপন করতাম সিরিয়ায়, যদি তুষ্ট হতাম স্বল্প রুজিতেই।

থাকতাম আমার জাতির সাথেই– অন্ধ ও বধির হয়ে।

অতঃপর সে আমৃত্যু খ্রিস্টধর্মের ওপরই অটল ছিল। কাফের অবস্থাতেই হয়েছে তার মরণ।

হ্যাঁ, সে কুফরের ওপর মৃত্যু বরণ করেছে। কারণ, সে ছিল অহংকারী। সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল বিশ্ব প্রতিপালকের বিধান থেকে। অহংকারই ডেকে এনেছিল তার পতন।

ইসলামে ন্যায়বিচার

একবার কোনো এক যুদ্ধে আলী রা তাঁর প্রিয় বর্মটি হারিয়ে ফেললেন। কিছুদিন পর জনৈক ইহুদীর হাতে সেটি দেখেই চিনে ফেললেন তিনি। লোকটি কুফার বাজারে সেটি বিক্রয় করতে এনেছিল। আলী ﷺ তাকে বললেন, এতো আমার বর্ম। আমার একটি উটের পিঠ থেকে এটি অমুক রাত্রে অমুক জায়গায় পড়ে গিয়েছিল।

ইহুদী বললো, আমীরুল মুমিনীন! ওটা আমার বর্ম এবং আমার দখলেই রয়েছে।

আলী পুনরায় বললেনঃ এটি আমারই বর্ম। আমি এটাকে কাউকে দানও করি নি, কারো কাছে বিক্রয়ও করি নি। এটি তোমার হাতে কিভাবে গেল?

ইহুদী বললো, চলুন, কাযীর দরবারে যাওয়া যাক।

আলী ﷺ বললেন, বেশ, তাই হোক। চলো।

তারা উভয়ে গেলেন বিচারপতি শুরাইহের দরবারে। বিচারপতি শুরাইহ উভয়ের বক্তব্য জানতে চাইলেন। তারা প্রত্যেকেই যথারীতি বর্মটি নিজের বলে দাবি করল।

বিচারপতি খলিফাকে সম্বোধন করে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে দুজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। আলী ﷺ বললেন, আমার ছেলে হাসান সাক্ষী।

শুরাইহ বললেন, আপনার পক্ষে আপনার ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আলী ﷺ বললেন, বলেন কি, আপনি একজন বেহেশতবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না? আপনি কি শোনেন নি, রাসুল ﷺ বলেছেন, হাসান ও হোসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা?

শুরাইহ বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি শুনেছি। তবু আমি পিতার পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণ করব না।

অনন্যোপায় আলী ইহুদীকে বললেন, ঠিক আছে। বর্মটা তুমিই নিয়ে নাও। আমার কাছে এই আর কোনো সাক্ষী নেই।

ইহুদী তৎক্ষণাৎ বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ওটা আপনারই বর্ম। কি আশ্চর্য! মুসলমানদের খলিফা আমাকে কাজীর দরবারে হাজির করে আর সেই কাযী খলিফার বিরুদ্ধে রায় দেয়। এমন সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থা যে ধর্মে রয়েছে আমি সেই ইসলামকে গ্রহণ করছি। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু...।

অতঃপর বিচারপতি শুরাইহের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলল। ঘটনা হল– খলিফা সিফফীন যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমি তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাঁর উটের পিঠ থেকে এই বর্মটি পড়ে গেলে আমি তা তুলে নিই।

আলী ﵁ বললেন, বেশ! তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছ, তখন আমি ওটা তোমাকে উপহার দিলাম।

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামী আইনে ধনী-গরিবের কোনো ভেদাভেদ নেই। নেই গরিবের ওপর ধনীর কোনো প্রাধান্য।

ইসলামে সাম্য

একবার মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করল। ইসলামী আইন মোতাবেক তার ওপর শাস্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হল। বিষয়টি নিয়ে কুরাইশরা বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাঁরা বলল, কে এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-র কাছে কথা বলতে (সুপারিশ করতে) পারে। তখন তারা বললেন, এ ব্যাপারে উসামা ﵁ ব্যতিত আর কারো হিম্মত নেই। তিনি হলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-র প্রিয় ব্যক্তি।

উসামা ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-র সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ ﷻ কর্তৃক নির্ধারিত

হদের ব্যাপারে সুপারিশ করতে চাও? অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন–

> হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগন ধ্বংস হয়েছে এই কারণে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তারা তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত। [বোখারী]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এরপর রাসুল ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম! যদি ফাতিমা বিনত মুহাম্মদও যদি চুরি করত, তবে নিশ্চয়ই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

মধুর প্রতিশোধ

বদর প্রান্তে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে থাকা লাঠিটির সাহায্যে সৈন্যদের কাতার সুবিন্যস্ত করছিলেন। এ সময়, ছাওয়াদ বিন গাজিয়াহ কাতারের বাহিরে থাকার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার পেটে লাঠি দ্বারা খোঁচা দিয়ে বললেন–

হে ছাওয়াদ, সোজা হয়ে দাঁড়াও।

ছাওয়াদ ؓ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে হক ও ইনসাফ সহকারে প্রেরণ করেছেন। আপনি আমাকে আপনার কাছ থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) নেয়ার সুযোগ দিন। এ-কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের পেট খুলে দিয়ে বললেন, হে ছাওয়াদ! তুমি আমার কাছ থেকে কিসাস নিয়ে নাও।

ছাওয়াদ ؓ ঝুঁকে পড়ে রাসুল ﷺ-র পেটে চুমু খেলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে ছাওয়াদ তুমি এমন করলে কেন?

জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা দেখছেন (যুদ্ধ) তা একেবারে সন্নিকটে, অতএব, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার জীবনের শেষ স্পর্শটি যেন আপনার পবিত্র শরীর মোবারক হয়।

এ কথা শ্রবণে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন।

অহংকার- সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে

অহংকারী ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়কে অস্বীকার করে। সে সদা গোমরাহিতেই ডুবে থাকে। পক্ষান্তরে, বিনয় ও আনুগত্য মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখায়। কোরআনের ঘোষণাও এমনই। আল্লাহ ﷻ বলেন–

যারা অহংকার করবে তারা আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে বহু দূরে সরে যায়। তাইতো কত লোককে সত্যের পথে আহবান করা হয়। ভ্রষ্টতা থেকে সর্তক করা হয়। সত্যকে তার সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়। কিন্তু তার অহংকার তাকে সেই সত্য গ্রহণ করতে দেয় না।

উদাহরণত, একবার এক সাহাবী (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) এই উম্মতের ফেরআউন–আবু জেহেলকে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল হেকাম এখানে আমি ও তুমি ছাড়া আর কেউ নেই,আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনছে না, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ? তুমি সত্যি করে বলো তো, মুহাম্মদ কে তুমি সত্যবাদী মনে করো,না মিথ্যাবাদী?

আবু জেহেল জবাব দিল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী। সারাজীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু ব্যাপার হল এই যে, বনু কুসাই কুরাইশের সামান্য একটা শাখা। এরা সব গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হবে, আর কুরাইশ বংশের অন্যান্য শাখার লোকেরা মাহরুম হবে, এটা আমরা কিভাবে সহ্য করতে পারি। পতাকা রয়েছে বনু কুসাই-এর হাতে। হারাম শরীফে হাজীদের পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তারাই করছে। কাবা ঘরের পাহারাদারী, রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব ও চাবী তাদেরই অধিকারে। এখন নবুওয়াত ও যদি কুসাই বংশের লোকের হাতে ছেড়ে দেই, তাহলে কুরাইশ বংশের অন্যান্য লোকের ইজ্জত থাকবে কোথায়?

দেখেছো, অহংকার, সীমালঙ্ঘন, গোত্রপ্রীতি ও হিংসা কিভাবে তাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। তার মতো আরো বহু মানুষ রয়েছে, যাদের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও অহংকার ও গোত্রপ্রীতির আতিশয্য তাদেরকে সত্য থেকে বিমুখ রেখেছে।

যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

> আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা নিকৃষ্টতর ঠিকানা। [সূরা বাকারা : ২০৬]

আমি কত লোককে দেখেছি, অহংকার বশত অন্যের অধিকার হরণ করতে। কত লোককে দেখেছি, আত্মঅহমিকা তাকে তার ভাই থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কত লোককে দেখেছি ঔদ্ধ্যতা বশত স্ত্রীর প্রতি জুলুম করতে।

আমি যখন তাকে বলেছি, ভাই, ভুলটা তোমারই। দয়া করে তা স্বীকার করে নাও। স্ত্রীর কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করো। তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনো। তোমার সন্তানদেরকে তাদের মায়ের মমতা থেকে বঞ্চিত করো না। তখন সে বলে, আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব? আমি তার কাছে নত হব?

বস্তুত দোষী হয়েও তাকে ছোট হতে কিসে বাধা দিচ্ছে? অবশ্যই সেটা তার অহংকার-অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাম হাতে খাবার গ্রহণে দাম্ভিকতা

কিছু লোককে দেখা যায় বাম হাতে খাবার খেতে। তুমি যদি তাদের কাউকে বলো, ভাই, আল্লাহ ﷻ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। দয়া করে ডান হাতে খান। দেখবে, সে তোমার কথা কানে তুলবে না। উত্তম এই উপদেশ গ্রহণে কিসে তাকে বাঁধা দিচ্ছে? নিশ্চয়ই সেটা তার অহংকার বৈ আর কিছু নয়।

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-র সামনে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল। রাসুল ﷺ তাকে অত্যন্ত নম্রভাবে বললেন, তুমি ডান হাতে খাও।

সে বলল আমি পারব না।

রাসুল ﷺ বললেন, আর কখনও পারবেও না। একমাত্র অহংকারই তাকে ডান হাত দিয়ে খাওয়া থেকে বিরত রাখল। বর্ণনাকারী বলেন,

এরপর সে আর কখনো মুখের কাছে হাত উঠাতে পারেনি। [মুসলিম : ৫৩৮৭]

দেখো, লোকটি অহংকারবশত রাসুল ﷺ-র উপদেশ গ্রহণ করল না। পরিণতিতে আল্লাহর রাসুল ﷺ-র বদদোয়া তাকে পাকড়াও করল।

অহংকারের আতিশয্যে

কত লোককে তার অহংকার ইসলামে গ্রহণে বাধা দেয়। কত লোককে তার অহমিকা সালাত আদায়ে মসজিদে যেতে বারণ করে । সালাতের দিকে ডাকা হলে সে ঔদ্ধত্য স্বরে বলে, আমি কেন মসজিদে যাব? সেখানে কতো গরিব, কুলি, মজুর সালাত আদায় করে। এত সুন্দর পোশাক পরে, সুগন্ধি লাগিয়ে আমি কিভাবে তাদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করব?

যেমনটি বর্ণিত আছে হাজ্জাজ বিন আরতারাহ সম্পর্কে। তিনি একজন হাদিস বর্ণনাকারী হলেও অনেকেই তার নিন্দা করে বলেছে, তিনি একজন দুর্বল রাবী। তাছাড়া জানা যায় যে, তাকে মসজিদে সালাত আদায়ের কথা বলা হলে তিনি বলতেন, আমি কি সাধারণ লোকদের সাথে এককাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করব?

হাজ্জাজ বিন আরতারাহর মতো আমাদের সমাজেও অনেক লোক রয়েছে। যারা একই কারণে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। হতে পারেন তিনি কোনো সুবিশাল কোম্পানির মালিক কিংবা কোনো ফ্যাকাল্টির ডীন, অথবা ভার্সিটির ভিসি কিংবা কোনো শহরের মেয়র, এম. পি. অথবা মন্ত্রী। সাধারণ জনগণের সাথে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে তার রুচিতে বাঁধে। তাই তারা অফিস কিংবা ঘরের ভেতর জায়নামায বিছিয়ে একাকী কিংবা একান্ত অনুচরবর্গদের নিয়ে নিয়ে সালাত আদায় করে।

অথচ আল্লাহ ﷻ তাকে ডেকে বলছেন–

﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ﴾

তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। [সূরা বাকারা : ৪৩]

যাও, মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করো। সকলে মিলে জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য নির্মিত হয়েছে মসজিদ।

তাই অহংকারী হয়ো না। কারণ, আল্লাহ ﷻ কেয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিদের অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারে উপস্থিত করবেন। মানুষ তাদেরকে পদদলিত করবে। অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার পোষণকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে অহংকার ছেড়ে নম্র ও বিনয়ী তাওফিক দান করুন। আমিন।

দৃষ্টি অবনত রাখো আল্লাহ ﷻ সন্তুষ্ট হবেন

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ * وَمَعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ

দৃষ্টি থেকেই সৃষ্টি সকল দুর্ঘটনার। তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ বাধিয়ে দেয় বিশাল অগ্নিকান্ড।

كَمْ نَظْرَةٍ فَتَكَتْ بِقَلْبِ صَاحِبِهَا * فَتَكَ السِّهَامُ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرِ

কত দৃষ্টি হৃদয় এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। ধনুকবিহীন তীরের আঘাত যেমন।

يَسُرُّ مَقْلَتَه مَا ضَرَّ مَهْجَتَه * لَا مَرْحَبًا بِسُرُوْرٍ عَادَ بِالضَّرَرِ

যে পাপে চক্ষু হয় শীতল, হৃদয় হয় প্রফুল্ল। কী দরকার সে সুখের, ক্ষতিই যার চিরসঙ্গী।

পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী

আল্লাহ ﷻ আদম عليه السلام-কে সৃষ্টি করে তাকে জান্নাতে স্থান দিলেন। তাকে জান্নাতী খাবার, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদসহ ঈপ্সিত যাবতীয় বস্তুর মালিক বানালেন।

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾

আর তোমাদের মন যা চায়, তাতে তোমাদের জন্য সেসব জিনিসের ব্যবস্থা। [সূরা ফুসসিলাত : ৩১]

এতকিছুর ব্যবস্থা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ অনুভব করছিলেন। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এক ঘনিষ্টজনের। তখন আল্লাহ ﷻ তার এ শূন্যতা পূরণের জন্য কী নির্বাচন করেছিলেন? তাকে গান শোনাবার জন্য কোনো পাখি? নাকি খেল-তামাশার জন্য কোনো বিড়াল? নাকি তীব্রবেগে ছুটে চলার জন্য কোনো ঘোড়া? না, এসব কিছুই তিনি তার জন্য নির্বাচন করলেন না। যেহেতু তিনি তাকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন আর পুরুষের মন নারীর প্রতি এবং নারীর মন পুরুষের প্রতি সদা আকৃষ্ট থাকে। তাই আল্লাহ ﷻ তার সঙ্গী হিসেবে তাঁরই পাজর থেকে একজন নারী সৃষ্টি করলেন। তিনিই হলেন বিশ্বমাতা হাওয়া عليها السلام।

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

তিনি সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া। যাতে সে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। [সূরা আরাফ : ১৮৯]

পাথরের প্রেম

কবি আসমায়ি একবার কোনো এক শহরে ঘুরতে গেলেন। চলতে চলতে রাস্তায় হঠাৎ তিনি একটি পাথরখন্ড দেখতে পেলেন। যেটিতে লেখা ছিল–

أَيَا مَعْشَرَ الْعُشَّاقِ بِاللهِ خَبِّرُوا * إِذَا حَلَّ عِشْقٌ بِالْفَتِي كَيْفَ يَصْنَعُ

হে প্রেমিককূল, আল্লাহর দোহাই লাগে তোমরা বলো, কোনো যুবক প্রেমে পড়লে, তার করণীয় কী হবে?

আসমায়ি আরেকটি পাথরখন্ড হাতে নিলেন। তাতে লিখলেন–

يُدَارِيْ هَوَاهُ ثُمَّ يَكْتُمُ هَمَّه * وَيَقْنَعُ بِكُلِّ الْأُمُوْرِ وَيَخْنَعُ

প্রেমিক দমিয়ে রাখবে তার প্রেমাসক্তি, লুকিয়ে রাখবে তার মনের কথা।

সবকিছুতেই সে তুষ্ট থাকবে এবং হবে অনুগত।

দ্বিতীয় দিন তিনি আবার সেই পাথরখণ্ডের কাছে এলেন। দেখলেন, আজ তার লেখার নিচে লেখা রয়েছে–

وَكَيْفَ يُدَارِيْ وَالْهَوِي يَفْجَأُ الْحَشِي * وَفِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَلْبَه يَتَوَجَّعُ

সে কীভাবে তা দমিয়ে রাখবে, প্রেমাসক্তি তো নিজেকে প্রকাশে উদগ্রীব। সতত সে তার হৃদয়ে ব্যথার বোঝা বয়ে বেড়ায়।

আসমায়ি আরেকটি পাথরখণ্ড নিয়ে তাতে লিখলেন–

اِذَا لَمْ يَجِدْ حَلًّا لِكِتْمَانِ عِشْقِه * فَلَيْسَ لَه سِوَي الْمَوْتِ يَنْفَعُ

প্রেমাবেগ লুকানোর কোনো পথ যদি সে না পায়, তাহলে তার জন্য মৃত্যুর চেয়ে উপকারী কিছু নেই।

কিছুদিন পর কবি আসমায়ি আবার সেই পাথরখণ্ডের কাছে এলেন। আজ তিনি পাথরখণ্ডটির পাশে একটি কবর দেখতে পেলেন। আরো দেখলেন, তার কবিতার শেষ পঙক্তিটির নিচে লেখা রয়েছে–

سَمِعْنَا ...أَطَعْنَا... ثُمَّ مُتْنَا * فَبَلِّغُوْا سَلَامِيْ لِمَنْ قَدْ كَانَ بِالْوَصْلِ يَمْنَعُ

শুনলাম, মানলাম, তারপর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলাম। তার কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও, আমার সাথে সাক্ষাতে যে ছিল অনাগ্রহী।

এই ছিল পাথরের প্রেমের গল্প। এর কোনো সত্যতা আছে কি না–আমার জানা নেই।

প্রেমিকদের পাথর

কয়েক বছর আগে আমি সিরিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন আমার সফরসঙ্গীদের নিয়ে একটি হোটেলে খেতে গেলাম। হোটেলটির পরিবেশ ছিল দারুণ সুন্দর। পাশেই ছিল বিশাল একটি পাহাড়। হোটেল থেকে যেটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পাহারড়টির চূড়ায় ছিল এক বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড। তাতে খোদাই করা প্রতিকি হৃদয়-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। হোটেল বয়কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, এটিকে বলা হয় প্রেমিকদের পাথর। এররপর সে এটির নামকরণ সম্পর্কে এক আশ্চর্য তথ্য দিল। সে বলল, যারা প্রেম করে ব্যর্থ

হতো। বঞ্চিত হতো প্রিয় মানুষটির ভালোবাসা থেকে। তারা এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত পাথরখন্ডটির উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করত। তাই এটির নাম রাখা হয়– প্রেমিকদের পাথর।

বাস্তবতা অজানা। হতে পারে কোনো একটি দুর্ঘটনা থেকে এই কাহিনীর জন্ম। কিন্তু গল্পটি আমি বলেছি এটা বোঝাতে যে, সত্যিই প্রেম হল মানুষের হৃদয়ের খেলা। যার উৎপত্তিস্থল হল দৃষ্টি। কবির ভাষায়–

كُنْتُ مَتَى اَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا * لِقَلْبِكَ يَوْمًا اَسْلَمَتْكَ الْمَحَاجِرُ
رَأَيْتَ الَّذِيْ لَا كُلَّه اَنْتَ قَادِرٌ * عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِه اَنْتَ صَابِرٌ
يَا نَاظِرًا مَا أَقْلَعْتَ لَحَظَاتِه * حَتّٰى تَشْحَطُ بَيْنَهُنَّ قَتِيْلًا

যেদিন তুমি চোখের ভাষায় তোমার হৃদয়ের কথা বলে দিয়েছ, সেদিনেই পাথরখন্ড তোমার কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে।

তুমি বুঝতে পেরেছ, তুমি না পেরেছ তার (অন্তরের) পুরোটার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, না পেরেছ আংশিকের ওপর ধৈর্যধারণ করতে।

হে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী! তুমি তোমার মুহূর্তগুলো বিনষ্ট করছ আত্মাহুতি দানের মাধ্যমে।

সাহাবীর দৃষ্টি হেফাজত

হজের মওসুম চলছে। সাহাবায়ে কেরাম হজের আনুষ্ঠানিকতায় ব্যস্ত। কেউ ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করছেন। কেউ মিনা, আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছেন। কেউ কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত। কেউ আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রার্থনায় রত।

রাসুল ﷺ একটি বাহনে আরোহন করে আছেন। তাঁর সহযাত্রী হিসেবে রয়েছেন ফজল বিন আব্বাস رضي الله عنه। এ সময় খাসআম গোত্রের এক রমনী রাসুল ﷺ-র সামনে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। সওয়ারীর ওপর বসে থাকতে পারেন না। তার ওপর হজ ফরয হয়েছে। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ পালন করতে পারব?

মহিলাটি ছিল খুবই সুন্দরী। ফজল বিন আব্বাস رضي الله عنه-ও ছিলেন সুন্দর-সুপুরুষ। তাই রাসুল ﷺ নিজ হাতে ফজল رضي الله عنه-র চেহারা মহিলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি বলেন, 'আমি একজন যুবক ও একজন যুবতীকে শয়তান থেকে অনিরাপদ মনে করলাম। [সুনানে তিরমিযি : ৮৮৫]

ঘটনাটি রাসুল ﷺ-র যুগের এক হজের সময়কার। সেকালে আজকের মতো ইন্টারনেট কিংবা কম্পিউটার ছিল না। ছিল না মোবাইল কিংবা ভিডিও কলের সুবিধা। তাই যে কেউ যখন তখন যে কোনো বেগানা নারীকে পারত না দেখতে।

কিন্তু শয়তান সর্বদাই ধূর্ত ও তৎপর। সে তো আল্লাহ ﷻ-র নামে অঙ্গীকার করে ঘোষণা দিয়েছে যে–

﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

> আপনার সম্মানের কসম, আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট কর ছাড়বো। [সূরা ছাদ, ৮২]

এভাবে শয়তান মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। পবিত্র কোরানের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

> এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। [সূরা আরাফ : ১৭]

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চক্ষুকে অবনমিত রাখে, আল্লাহ ﷻ তাকে এমন ঈমানে অধিকারী করবেন যে, সে অন্তরে ঈমানের স্বাদ পাবে।

তাই ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট চ্যানেল, পত্রিকা-ম্যাগাজিন, শপিংমল, সড়ক-মহাসড়ক, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্লেন ইত্যাদি জায়গায় বেগানা

নারীদের থেকে আমাদের চক্ষুকে অবনমিত করে রাখতে পারলে আমরাও অন্তরে ঈমানের সেই স্বাদ পাবো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। [সূরা নূর : ৩০]

পাগল প্রেমিক

স্পেনের এক বাদশাহ ছিলেন। তার একটি দাসী ছিল। সে ছিল রূপে অনন্যা। বাদশাহ স্ত্রীদের চেয়ে তাকেই বেশি ভালোবাসতেন। একদিনের কথা। বাদশাহ তার প্রিয় দাসীটির সাথে বসে গল্প করছিলেন। তার সান্নিধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। তাদের সামনে থরেথরে সাজানো ছিল ফলফলাদি। বাদশাহ তার মুখে আঙ্গুর আনার তুলে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি আঙ্গুর নিয়ে তার মুখে পুরে দিলেন। সে কোনো বিষয়ে হেসে পড়ল। হাসির চোটে আঙ্গুর গিয়ে সোজা আটকে গেল শ্বাসনালীতে। আর এক ঝটকায় তার প্রাণ পাখি উড়ে গেল। বাদশাহ কাঁদতে কাঁদতে তাকে ঝাঁকি দিচ্ছিলেন এবং চুমু খাচ্ছিলেন। কিন্তু সে নীরব নিথর হয়ে পড়ে রইল।

কথিত আছে, দাসীর লাশ সামনে নিয়ে তিনি সাতদিন পর্যন্ত ঘরে বসে ছিলেন। কঠিন প্রেমের পাগলামির কারণে তাকে কেউ বোঝাতে পারছিল না যে, সে মারা গেছে। অতঃপর লাশ পঁচে গলে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। পরে বহু কষ্টে লোকেরা তাকে বোঝাতে পেরেছিল যে, সে আর দুনিয়াতে নেই।

গভীর প্রেম দূরেও ঠেলে দেয়

প্রমের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। প্রেমের আতিশয্য কখনও কখনও মানুষের ধর্ম ও বিবেক নষ্ট করে দেয়। অন্তরে প্রবল প্রেম জাগাতে নির্জনতা ও শয়তান সহযোগিতা করে থাকে।

এক আরব বেদুইনের একটি দাসী ছিল। সে তাকে অনেক ভালোবাসতো। একদিনের ঘটনা। বেদুইন ব্যক্তিটি মরুভূমিতে উট-বকরি চরাচ্ছিল। তার সাথে তার প্রিয় দাসীটিও ছিল। হঠাৎ সে দেখল, তার প্রিয় দাসীটির দিকে এক গোলাম তাকিয়ে আছে। সামান্য একটি গোলাম তার প্রিয়ার রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করেছে– ভাবতেই সে ক্রোধে ফেটে পড়ল। রাগে–ক্ষোভে সে তার কর্তব্য-জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে ভাবতে লাগল, তার দাসীর দিকে সে ছাড়া অন্য কেউ কীভাবে তাকায়! তাই সে তরবারীর এক আঘাতে তার সবচেয়ে প্রিয় সেই মানুষটিকে হত্যা করল। অতঃপর যখন রাগ পড়ে গিয়ে তার হুশ ফিরে এল, তখন আপন কৃতকর্মের জন্য তার সীমাহীন আফসোস হল। সে মৃত দাসীর মাথার পাশে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল–

يَا طَلْعَةَ طَلع الْحَمامِ عَلَيْهَا * وَجَنى لَهَا ثَمر الرَّدِيِّ بِيَدِيهَا

رَوَيْت مِنْ دَمِهَا التُّرَاب وَطَالَم * رَوَي الْهَوي شَفَتِيْ مِنْ شَفَتَيْهَا

وَأَجَلْت سَيْفِيْ فِيْ مَجَال خَنْقِهَا * وَمدَامِعِيْ تَجْرِيْ عَلى خَدَيْهَا

مَا كُنْت قَتلهَا لِاَنِّيْ لَمْ اَكُنْ * أَبْكِيْ اِذَا سَقَطَ الْغُبَارُ عَلَيْهَا

لٰكِنْ بَخَلْتُ عَلى سِوَايَ بِحُسْنِهَا * وَأَنَفْتُ مِنْ مَظرِ الْعُيُوْنِ اِلَيْهَا

হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমার প্রিয় মানুষটি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। আমি নিজ হাতে তাকে মৃত্যুর ফল খাওয়ালাম।

আজ তার রক্তে সিক্ত হল জমিন। অথচ এতকাল আমার অধর তার অধরের ছোঁয়ায় সিক্ত হয়েছিল।

আমার তরবারীর দ্বারাই মৃত্যু হয়েছে তার। ফলে এখন তার গাল বেয়ে আমার অশ্রু ঝরছে।

তার চরণ যুগলের জন্য বড় দুঃখ আমার। জমিনে পা রাখা বস্তুসমূহের মধ্যে সে দু'টির মতো প্রিয় আর কিছুই ছিল না আমার।

হায়! আমি কেন তাকে হত্যা করলাম। অথচ তার গায়ে ধূলি পড়লেও আমার দুচোখ অশ্রু ঝরাতো।

আমি ছাড়া অন্য কেউ তার রূপ-লাবণ্য উপভোগ করবে– তা মানতে পারিনি আমি। তাইতো অন্যদৃষ্টি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তাকে হত্যা করেছি আমি।

দেখো, প্রেমের আতিশয্যে কীভাবে সে তার নিজ প্রেমিকাকেই হত্যা করল। বর্তমানেও দেখা যায়– সম্পর্কের গভীরতা অনেক ক্ষেত্রে অপহরণের পথে ধাবিত করে। আমি পৃথিবীর নানা দেশের জেলখানায় ঘুরেছি। সেখানে অনেক যুবককে দেখেছি, তারা অন্য সুন্দর যুবকের প্রতি আসক্ত। যেমন যুবকের প্রেমে আসক্ত একজন বলেছিল–

مَا زَالَتْ تَتبعُ نَظْرَة فِيْ نَظْرَةٍ * فِيْ أَثْرِ كُلِّ مَلِيْحَةٍ وَمَلِيْحٍ

وَتَظُنُّ ذَاكَ دَوَاء قَلْبَكَ وَهُوَ * فِي التَّحْقِيْقِ تَجْرِيْحٌ عَلى تَجْرِيْحٍ

يَا نَاظِرًا مَا أَقْلَعْتَ لَحْظَة * حَتّي تَشْحَطُ بَيْنَهُنَّ قَتِيْلًا

আমার দৃষ্টি সারাক্ষণ শুধু একের পর এক কমনীয় সৌন্দর্য দেখে চলছে।

তুমি কি ভাবছ এটি তোমার অন্তরের ওষুধ, না, না, এটি তোমার ক্ষতকে আরো গভীর করবে।

হে দৃষ্টিনিক্ষেপকারী, একমুহূর্তের জন্যেও যেতে পারবে না তুমি, যতক্ষণ না নিঃশেষ করে দেওয়া হয় তাকে।

আমি কারাগারে অনেক যুবককে কেবল এই প্রেমের কারণে একবছর, দুবছর সাজাপ্রাপ্ত হতে দেখেছি। এমনকি দেখেছি মৃত্যুদন্ড পেতেও। এই প্রেমের কারণে কতজন তার প্রেমিকাকে হত্যা করেছে। অপহরণ করেছে। পরবর্তীতে গ্রেফতার হয়ে সাজা ভোগ করেছে। এই অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার খপ্পরে পড়ে কত নারী ধর্ষীতা হয়েছে। কত নারী অবৈধ সন্তান পেটে ধারণ করে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে।। অথচ তারা যদি আল্লাহ

ﷻ-র আশ্রয় প্রার্থনা করত। যদি বিরত থাকতো এসব থেকে, তাহলে সেটা তাদের উভয় জগতের জন্য কতই না সুখকর হতো।

বস্তুত এসব কিছুই ঘটে থাকে অবৈধ দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং নিষিদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে। বর্তমানে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টি আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে।

সেকালের প্রেম, এ কালের প্রেম

আন্দুলুসি তার "বাহজাতুল মাজালিস' নামক গ্রন্থে লিখেছেন– পূর্বের যামানায় প্রেমিক যুগল তাদের প্রেমকে দেখা ও পাশে বসার মাঝেই সীমীত রাখতো। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে কাব্য রচনা করত। যদিও সেটিও ছিল শরীয়তবিরোধী; তথাপি বর্তমানের তুলনায় সেকালের প্রেম ছিল অনেক শালীন।

কিন্তু একালের প্রেম-ভালোবাসায় বহু নোংরামি প্রবেশ করেছে। মোবাইল, ইন্টারনেট, ইমু, ম্যাসেঞ্জারসহ বিভিন্ন চ্যাটিং মাধ্যম অবৈধ এই প্রেমকে করেছে আরো সহজ ও নির্বিঘ্ন।

পূর্বের যুগে মানুষের মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা জাগলেও তার সামনে অনেক বাঁধা বিপত্তি এসে দাঁড়াতো। মেয়েদের জন্য পাপে জড়ানো ছিল খুবই কঠিন। কারণ, তাকে সার্বক্ষনিক পারিবারিক নজরদারিতে থাকতে হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি মেয়ের কাছে রয়েছে এক বা একাধিক মোবাইল। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুব্যবস্থা। যেগুলোর সাহায্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়া এখন খুবই সহজ ব্যাপার। তাই তাদের বুঝতে হবে, পাপের এতো আয়োজনের ভিড়েও যদি এসব থেকে বেঁচে থাকা যায়, তাহলেই আল্লাহ ﷻ-র প্রকৃত দাসত্বের প্রমাণ মিলবে।

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও জুলেখার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

জুলেখা যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে একান্ত আপন করে পেতে তার কাছে ডাকল, নিজেকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-র সামনে উপস্থাপন করল, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন–

'আমি আল্লাহর কাছে এমন অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই। নিশ্চয় আমার প্রভুই আমার ঠিকানা'– এই বলে তিনি তার কাছ থেকে পালিয়ে যান এবং ব্যভিচার থেকে পরিত্রান লাভ করেন। অতঃপর তিনি কয়েক বছর জেলখানায় বন্দি থাকেন।

ইবনুল জাওযি ﷺ বলেন, এটাই হল আল্লাহ ﷻ-র দাসত্বের প্রমাণ। কারণ, গুণাহে লিপ্ত হওয়ার অবারিত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। কেবল সালাত আদায় করেই আল্লাহর দাসত্বের প্রমাণ দেওয়া যায় না। এ ধরণের পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ ﷻ-র হুকুম মানার মাধ্যমে তাঁর দাসত্বের প্রমাণ দেওয়া যায়। এছাড়া দুটি কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য, ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহ ﷻ-র সাহায্যে পাপ বর্জনের সক্ষমতা লাভ করা যায়।

এক.

দৃষ্টি হেফাজত করা। কারণ, অধিকাংশ গুনাহের সূচনা এখান থেকেই হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। [সূরা নূর : ৩০]

তিনি আরো বলেন–

﴿وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ

النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সূরা নূর : ৩১]

দুই

ফেতনা থেকে দূরে থাকা। হাট-বাজার, মার্কেট, শপিংমল– এসব স্থানে পর্দার বিধান অধিক লঙ্ঘন হয়, তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা।

পরিশেষে আল্লাহ ﷻ-র নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে দৃষ্টি হেফাজত ও যাবতীয় ফেতনা ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আন্দালুসের খলিফা

বিপুলা এই পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষের বসবাস। একেকজনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা একেক রকমের। একেকজনের জীবনের লক্ষ্য একেক ধরণের। প্রত্যেকেরে জীবন পরিচালনার স্টাইলেও রয়েছে ভিন্নতা। কেউ বা আবার নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝেই। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

তোমাদের আশার ওপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে কিতাবদের আশার ওপরও নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। [সূরা নিসা, আয়াত : ১২৩]

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ বলেন, তোমারা কেবল আশার পাখায় ভর করেই জান্নাতে যেতে পারবে না। তেমনি আহলে কিতাবগণও জান্নাতে যাওয়ার যে আশা পোষণ করে থাকে, শুধু সেই আশা-কে সম্বল করেই তারা পারবে না জান্নাতে যেতে। কেননা, জান্নাত শুধু আশার ফল নয়। বরং কেউ যদি অন্যায় কিংবা পাপ করে, তবে তাকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই, পাপ থেকে বেঁচে থাকার মাঝেই রয়েছে সাফল্য।

তদ্রূপ আশার ক্ষেত্রেও এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কেবল আশা দিয়েই সম্মান অর্জন করা যায় না। কেবল আকাঙ্ক্ষার আঘাতে যায় না শত্রুর কোনো ক্ষতি করা। সম্ভব নয় কোনো শিকার ধরাও।

তাই মানুষ যদি জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধির আশা করে। কিন্তু সেটি অর্জনের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে। তাহলে তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলা পাখিটি ভুনা হয়ে সামনে উপস্থিত হওয়ার স্বপ্ন কখনও সত্যি হবে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি কোনো দৃষ্টিনন্দন বাড়ি কিংবা কোনো বিলাসবহুল গাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেগুলো প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে। কিন্তু এগুলো অর্জনের জন্য কোনোরূপ চেষ্টা-তদবির না করে। তাহলে তার এ আশা কখনও পূর্ণ হবে না। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। দুনিয়া এমনই হয়ে থাকে। যেমন আল্লামা শাওকি বলেন–

وَمَا نَيْلُ الْمَطَالِبِ بِالتَّمَنِّيْ * وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ الدُّنْيَا غِلَابًا

কেবল আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয় না কোনো কিছু, তবে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম দ্বারা অর্জন করা যায় গোটা দুনিয়াটাই।

আশাগুলো প্রাপ্তির রূপ নিয়ে ধরা দেয় তাদের কাছে যারা তা পূরণে দৃঢ়চেতা ও দুঃসাহসী। যারা তাদের আশাকে বাস্তব রূপ দিতে যথাযথ ঝুঁকি নেয় এবং গ্রহণ করে উদ্যোগ।

গাধার চালক যখন খলিফা

মুহাম্মাদ ইবনে আমের। সে আন্দালুসের অধিবাসী। একজন গাধা চালক। তার একটি গাধা ছিল। যেটি দিয়ে সে মালামাল ভাড়ায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজ করত। তার দুজন বন্ধু ছিল। তাদের সাথে প্রতিদিন সে একই সাথে কাজে বের হত। বন্ধু দুজনেরও একটি করে গাধা ছিল। তারা কখনও মালামাল বহন করত। কখনও যাত্রী পরাপার করত। এভাবে তারা উপার্জন করত জীবিকা।

এক রাতের কথা। রাত্রিযাপনের জন্যে তারা তিনজন একটি জায়গায় আশ্রয় নিল। গাধাগুলো তাদের পাশেই বেঁধে রেখে তারা রাতের খাবার খেতে বসল। এ সময় মুহাম্মাদ বিন আমের তার দুই বন্ধুকে বলল, এই! তোমাদের কার মনে কী আশা? বল তো।

তাদের একজন বলল, আমার আশা আমি পাঁচটা গাধার মালিক হবো। যাতে আমি দৈনিক এক দেরহাম, দু'দেরহামের পরিবর্তে দশ দেরহাম রোজগার করতে পারি।

দ্বিতীয়জন বলল, আমার আশা বাজারে আমার একটা দোকান থাকবে। আমি হবো সেটির মালিক। গাধায় মালামাল টানার এ পেশা বাদ দিয়ে আমি ব্যবসা করব।

এরপর তারা জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে আবি আমের! তোমার কি আশা?

সে বলল, আমার আশা আমি এদেশের খলিফা হবো।

তার কথা শুনে তারা দুজন হেসে লুটোপুটি খেল। তার তাকে তিরস্কার করে বলল, তুমি হলে এক গাধা চালক। যার কাছে এই একটি গাধা ছাড়া আর কোনো সম্পদ নেই। সেই তুমি কি না স্বপ্ন দেখছে খলিফা হওয়ার!

সে বলল, হ্যাঁ। আমি এমনটিই আশা করি। অতঃপর সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আমি যদি খলিফা হই, তাহলে তোমরা আমার কাছে কী চাইবে?

জবাবে একজন বলল, আমি চাইবো এমন একটি প্রাসাদ যার কোলঘেঁষে থাকবে একটি সুবিশাল মনোরোম বাগান।

আর কী চাইবে?

চারটা বিবি চাইব।

আর কিছু?

না, আর কিছু না। এই ঢের।

এবার সে দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী চাইবে?

সে বলল, তুমি যদি কখনও খলিফা হও তাহলে আমি চাইব, তুমি আমাকে গাধার পেছনে উল্টো করে চড়াবে এবং গোটা শহরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোষণা দেবে যে, এ ব্যক্তি দাজ্জাল, এ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী।

ইবনু আমের বলল, বেশ, ঠিক আছে।

দ্বিতীয়জন আবার বলল, শুধু তাই নয়, তুমি তখন আমার মুখে কালিও মেখে দিও।

ইবনে আমের বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তাই করব।

অতঃপর তারা যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। দেখো, যার একটি অটুট লক্ষ্য আছে, তার কাছে তা পূরণের পরিকল্পনাও থাকে। তাই ইবনে আমের ভাবতে শুরু করল, খলিফা হতে হলে আমাকে কোন পথে এগুতে হবে। আমি কি এই গাধা নিয়েই পড়ে থাকব? না, আমাকে অবশ্যই একটি মাস্টার প্ল্যান করতে হবে। হোক না তা দশ, বিশ কিংবা ত্রিশ বছর পরেই। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার প্রথম কাজ হল খলিফা হওয়ার সঠিক পন্থা নির্ণয় করা।

কথায় আছে, হাজার মাইলের পথ পরিকল্পনার মাধ্যমেই শুরু হয়। রাসুল ﷺ-কে যখন আল্লাহ ﷻ সর্বপ্রথম ওহি পাঠালেন- 'ইকরা'। তখন তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করে দিলেন।

কোনো বিষয়কেই তিনি তুচ্ছজ্ঞান করতেন না। তাঁর নীতি ছিল আমার কাজ হল– শুরু করা। সাহায্য করবেন আল্লাহ ﷻ।

মুহাম্মাদ ইবনে আমেরও পরিকল্পনা শুরু করল। প্রথমে সিদ্ধান্ত নিল, সে তার গাধাটি বিক্রি করে দেবে। তারপর পুলিশে চাকরি নেবে । যাতে সে কমপক্ষে খলিফার সঙ্গীসাথীদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।

সকাল হল। পরিকল্পনা মোতাবেক সে তার গাধাটি বিক্রি করে দিল। তার সাথীরা বলল, একি করলে তুমি? গাধাটি বিক্রি করে দিলে? এখন তোমার জীবন কি করে চলবে? তুমি তো অভাবে না খেয়ে মারা যাবে।

সে বলল, আমার এরচেয়েও বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। অতঃপর সে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিল। এ পেশায় তার প্রায় বিশটি বছর কেটে গেল। সে ছিল অত্যন্ত বিচক্ষণ ও মেধাবী। একসময় সে খলিফার কাছাকাছি চলে এলো। সে হয়ে গেল খলিফার কাছের মানুষদের একজন।

কিছুকাল পর খলিফা ইন্তেকাল করলেন। যথারীতি খলিফার ইন্তেকালের পর তার পুত্র খেলাফতের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হল। খলিফা-পুত্রের বয়স তখন মাত্র দশ বছর। এতো অল্প বয়সে কেউ রাজকার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাই তার জন্য একজন পরামর্শক বা উপদেষ্টার প্রয়োজন পড়ল। খলিফার মা দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে মুহাম্মাদ বিন আমেরের কাছে এলেন। যাদের একজনের নাম ইবনু আবি গালিব। অন্যজনের নামা ইবনু তুমাইহ। খলিফার মা বললেন, তোমার তিনজন আমার সন্তানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং তারা তিনজন খলিফার উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন।

মুহাম্মাদ বিন আমের ইবনু তুমাইহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। খলিফার মা ইবুন তুমাইহকে অযোগ্য ঘোষণা করে এ দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে দিলেন। এখন বালক খলিফার উপদেষ্টা কেবল দুজন- মুহাম্মাদ বিন আমের ও ইবনু আবি গালিব। মুহাম্মাদ বিন আমের তার পুত্রের জন্য আবি গালিবের মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিল। আবু গালিব প্রস্তাব মঞ্জুর করল। মুহাম্মাদ বিন আমের আবু গালিবের মেয়েকে

নিজ পুত্রের বউ বানিয়ে এনে আবু গালিবকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এলো।

এখন এই কিশোর খলিফাকে কার্যত মূলত এক ব্যক্তি অর্থাৎ ইবনে আমেরেই পরিচালনা করতে লাগল।

কথিত আছে, ওই কিশোর খলিফা ইবনে আমেরের অনুমতি ছাড়া ঘর থেকেও বের হতো না। আর মন্ত্রীরা মুহাম্মাদ ইবনে আমেরের নির্দেশ ব্যতিত কোনো কাজ করতে পারতো না। এদিকে বিশিষ্টজনেরা তার প্রয়োজন অনুভব করতে লাগল। তারা তার আনুকূল্য লাভে সচেষ্ট হল। তার এ অবস্থান রাতারাতি তৈরি হয়নি। এ পর্যায়ে আসতে তাকে বিশটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন সবাই তাকেই অঘোষিত খলিফা হিসেবে বিবেচনা করতে লাগল। কারণ, সে-ই এখন সব কিছুর কর্তা। কোনো ফরমান জারি করা, বিভিন্ন স্থানে সৈন্য পাঠানো–সবই তার আদেশে চলতো। কথিত আছে, একটা সময় গোটা আন্দালুসকে খলিফার রাষ্ট্রের পরিবর্তে মুহাম্মাদ বিন আমেরের নামে আমিরিয়া রাষ্ট্র নামে ডাকা হতো। পূর্বের অবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন হঠাৎ তার সেই দুই বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। তখন সে এক কর্মচারীকে ডেকে বলল, অমুক বাজারে যাও। সেখানে অমুক অমুক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে আসো।

লোকটি বাজারে গিয়ে উপরিউক্ত লোকদুটোর নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। সেই দুই বন্ধুর জীবন এখনও আগের মতোই ছিল। গাধায় বোঝা টেনে দু চার পয়সা রোজগারের মাধ্যমে তাদের জীবন-গাড়ি চলছিল।

ঘোষকের ডাক শুনে তারা নিজেদের পরিচয় দিল। তাদেরকে খলিফার কাছে উপস্থিত করা করল। খলিফা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি আমাকে চিনতে পেরেছো?

তারা বলল, জি, আমরা আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার বর্তমান অবস্থানের কথা জানার পর থেকে আমরাও আপনার সাক্ষাত লাভের

অপেক্ষা করছি। কিন্তু আমরা যে সামন্য লোক। খলিফার দরবারে প্রবেশ করার সাধ্য আমাদের কোথায়?

অতঃপর খলিফা তাদের প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করল, তোমার মনে আছে? আমি যখন খলিফা হওয়ার আশা ব্যক্ত করেছিলাম তখন তুমি আমার কাছে কী চেয়েছিলে?

সে বলল, হ্যাঁ, মনে আছে।

এখন আমি খলিফা। বল তুমি কি চেয়েছিলে?

আমি চেয়েছিলাম এমন একটি প্রাসাদের মালিক হবো যার আঙ্গিনা জুড়ে থাকবে সুবিশাল বাগান। এবং আমি চারটি বিবাহ করবো।

বেশ, নাও, এই প্রাসাদ এবং এই বাগানটি তোমার। এই নাও চারজন নারীকে বিবাহের মহর। অতঃপর ইবনে আমের বলল, তুমি যদি আমার কাছে আরো বেশি চাইতে তাহলে আমি তোমাকে তা-ও দিতাম।

অতঃপর দ্বিতীয়জনকে বলল, তোমার কি মনে আছে তুমি কি চেয়েছিলে?

সে করজোড়ে বলল, খলিফা, আমাকে মাফ করুন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আগে বল সেদিন তুমি কী চেয়েছিলে?

আমি চেয়েছিলাম, যদি আপনি খলিফা হন তাহলে আপনি আমাকে পেছনে ফিরিয়ে একটি গাধার ওপর চড়াবেন। আমার মুখে কালি মেখে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করাবেন। আর একজন ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করাবেন, আমি মিথ্যাবাদী। আমি সবচেয়ে বড় দাজ্জাল।

ইবনে আমের তার সাথে সেরূপ আচরণ করার নির্দেশ দিলেন। যা তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়ন করা হল।

যে শিক্ষা পেলাম

প্রিয় ভাইয়েরা! এ ঘটনার বাস্তবতা কতটুকু সে প্রসঙ্গে না গেলাম। তবে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে ঘটনাটির বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এর

থেকে যে শিক্ষা আমারা পেতে পারি তা হল– মানুষ তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও সুধারণা অনুযায়ীই তার জীবন পরিচালনা করে থাকে। আল্লাহ ﷻ-ও মানুষকে তাদের সু ধারণা অনুযায়ী তাওফিক দিয়ে থাকেন। যেমনটি রাসুল ﷺ-র হাদিসে পাওয়া যায়। রাসুল ﷺ বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

> আল্লাহ ﷻ বলেছেন, বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমাকে সে সেরূপ পাবে। [বোখারী : ৭৪০৫]

অতএব, তোমরা রবের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করো না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾

> তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। [সূরা ফাতাহ, আয়াত : ১২]

যে ব্যক্তি সফলতার শীর্ষে পৌঁছতে চায়, তাকে অবশ্যই সেটি অর্জনের পরিকল্পনা করতে হবে। এটা হল প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হল এক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। অকর্মণ্য ও হতাশ লোকদের সাহচর্য তাকে আরো নিরুৎসাহিত করবে। কারণ, তারা তাকে বলবে, তোমার আগে অমুক অমুক ব্যক্তি এটি অর্জনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তাই সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছতে হলে সফল ও উচ্চাভিলাষী লোকদের সাথে মিশতে হবে।

চিন্তার পার্থক্য

নবী করিম ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه সদ্য বালক মাত্র। নবীজির ইন্তেকালের পর একদিন তিনি এক আনসার বালককে বললেন, রাসুল ﷺ তো ইন্তেকাল করেছেন। এখন আমরা তাঁর থেকে সরাসরি ইলম অর্জনের সুযোগ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। চলো, এখন আমরা তাঁর সাহাবিদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করব।

জবাবে সেই আনসার বালকটি যা বলল তাতে তাদের দুজনার চিন্তার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সে বলল, হে আব্বাস! তুমি কি আলেম হওয়ার আশা করছ? বেশ, ধরো তোমার কথামতো আমরা ইলম অর্জন করলাম। মুখস্ত করলাম অনেক হাদিস। এতে কি আমরা আলেম হতে পারব? কারণ, মানুষের মাঝে এখনও আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী ﵃ দের মত বড় বড় আলেম বিদ্যমান। এদের প্রত্যেকেরই সামাজে একটি ভালো অবস্থান রয়েছে। আমরা কি এদের ভিড়ে আমাদের খুজে পাবো? তারচে বরং কাঠ মিস্ত্রি কিংবা কর্মকার হওয়ার বিদ্যা শেখা ঢের ভালো।

দেখলে, দুজনের চিন্তার মাঝে কত ফরাক? আব্বাস ﵁ ছেলেটির কথা কানে তুললেন না। তিনি ইলম অর্জনে বেরিয়ে পড়লেন। আর সে কর্মকার হওয়ার বিদ্যা অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ল।

সে চলে গেল এক কামারের কাছে। শুঁকতে লাগল হাঁপর, লোহা ও ঝালাইয়ের উদ্ভট গন্ধ। প্রচন্ড গরমে জ্বলন্ত তন্দুরের পাশে বসে শিখতে লাগল কামার হওয়ার বিদ্যা। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস ﵁ চলে গেলেন ইলম অন্বেষণে। আলেমদের দরবারে বসে পড়লেন হাঁটু গেঁড়ে।

ইলমের খোঁজে দুয়ারে দুয়ারে

এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ এর এক গোলাম। আমার বয়স তখন সবে তেরো। একদিন আমি এক সাহাবির ঘরের দরজায় কড়া নাড়ালাম। ভেতর থেকে বলা হল তিনি ঘুমাচ্ছেন। আমি দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, আমি যদি এখন চলে যাই তাহলে তিনি ঘুম থেকে জেগে আমাকে খুঁজে পাবেন না। আর যদি আবারো কড়া নাড়ি, তাহলে হয়তো তিনি বের হয়ে আসবেন, কিন্তু তার মন ভালো থাকবে না। তাই আমি দরজার সামনে বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময় আমার ঘুমিয়ে পড়লাম। বাতাস এসে আমার মুখে ধুলো-বালি মেখে দিয়ে গেল।

সাহাবি ঘুম থেকে ওঠে দরজা খুললেন, দেখলেন একটি ছোট্ট বালক তার দরজার কাছে ঘুমিয়ে আছে। তার মুখ ও চুল ধুলোয় ধূসরিত।

তিনি আমাকে জাগালেন এবং বললেন, হে নবীজির চাচার পুত্র! তুমি কি জন্যে আমার কাছে এসেছ?

উত্তরে আমি বললাম, আমি আল্লাহর রাসুলের হাদিস শুনতে এসেছি।

সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসুলের চাচার পুত্র! তুমি আমাকে জাগালে না কেন?

আমি বললাম, আসলে, আমি আপনার প্রশান্ত মন চেয়েছি। তাই আপনাকে জাগাইনি। অতঃপর সাহাবি আমাকে হাদিস বর্ণনা করে শোনালেন।

ইবনে আব্বাস ﷺ আরও বলেন, একদিন আমি যায়েদ বিন সাবিত ﷺ-র সাথে ছিলাম। তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মিরাসি সম্পদ বন্টন বিষয়ে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। আমি তার সহযোগিতার জন্য তার উটের লাগামটি হাতে তুলে নিলাম।

তিনি বললেন, ছাড়ো, ছাড়ো।

আমি বললাম, আমাদেরকে আলেমদের সাথে এমন আচরণ করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমার হাত দাও।

আমি তখন ছোট বলক। আদেশমতো হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার হাতে চুমু খেয়ে বললেন, আল্লাহর রাসুলের পরিবারের সদস্যদের সাথেও আমাদেরকে এমন আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এভাবেই তাদের দুজনের মাঝে সুন্দর আচরণের বিনিময় ঘটল।

সর্বোপরি ইবনে আব্বাস ﷺ-র এ জ্ঞান পিপাসা তার কী উপকারে এলো, তার এ উচ্চাকাঙক্ষা তাকে কীভাবে উচ্চ শিখরে পৌছে দিল– সে কথা আমাদের সকলেরই জানা। মানুষের মাঝে এভাবেই পার্থক্য নিরূপণ হয়। সফলতার শীর্ষচূড়া প্রত্যাশী– এমন সকলের জন্য এ গল্পে রয়েছে সুস্পষ্ট উপদেশ। চাই সে দাওয়াতী কার্যক্রমে শীর্ষে পৌঁছতে আগ্রহী হোক। অথবা শিক্ষা ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফলতার প্রত্যাশী হোক।

কিংবা কোরআন মুখস্থ করে শ্রেষ্ট হাফেজ হওয়ার আকাঙ্ক্ষী হোক। অথবা ব্যবসা, শিল্প, আবিষ্কার, বক্তৃতা কিংবা রচনায় শীর্ষস্থান দখল করতে ইচ্ছুক হোক। এক্ষেত্রে কেবল মনে মনে আহা, যদি আমার এমন হতো– বলাই যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ, 'যদি' কোনো উপকারে আসবে না। যদি আমার এমন, এমন হতো– এসব বলে কোনো ফায়দা নেই। আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং কাজের প্রতি আগ্রহ ও পরিশ্রম করা ছাড়া কোনো কিছুই উপকারে আসবে না।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর অর্জন

দেখো, পরিশেষে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কি অর্জন করলেন। এ সম্পর্কে তার সাথী আবু সালেহের বক্তব্য ইমাম যাহাবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবু সালেহ বলেন, আল্লাহর কসম, একবার হজের মৌসুমে আমি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কে এমন এক অবস্থায় দেখেছি, যদি কোনো কাফের তা দেখতো তাহলে অবশ্যই সে ইসলাম গ্রহণ করত।

আবু সালেহ رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কী দেখেছেন?

তিনি বললেন, আমি দেখলাম এক স্থানে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে। তারা হজের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করছে। এ সময় লোকদের মাঝে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। সকলে তখন তার কাথা মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কোরআনের একেকটি সূরা পাঠ করছেন এবং প্রতিটি আয়াতের তাফসির পেশ করছেন। আল্লাহর কসম, এমন কোনো আয়াত বাদ পড়েনি যার তাফসির তিনি করেননি। আমি বুঝতে পারছিলাম না, তার কোন বিষয়টি আমাকে অবাক করেছিল– তার কোরআন মুখস্ত রাখার শক্তি? না তাফসির বিষয়ে তার অগাধ পান্ডিত্য?

লোকদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ বসে বসে তার আলোচনা শুনছিল। আবার কেউ কিছু সময় শুনে চলে যাচ্ছিল।

একবার তার এক বন্ধু তার সম্পর্কে বলেন, আমি একদিন ইবনে আব্বাসের তালাশে এলাম। যখন তার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছার পর দেখলাম, তার বাড়ির পথ মানুষের ভীড়ে লোকারণ্য। আমি বহুকষ্টে ভীড় ঠেলে তার কাছে যেতে পেরেছিলাম।

একটু ভাবো, প্রাচীনকালের এই সুবিশাল শহরগুলো কতো ফাঁকা ছিল। তথাপি ইবনে আব্বাস ﵄ বাড়ির সামনে কেন এতো মানুষের সমাগম ঘটতো যে, পথ রুদ্ধ হয়ে যেতো। কারণ, এটি অন্য দশটি বাড়ির মতো কেবল একটি বাড়িই ছিল না; বরং এখান থেকে বিচ্ছুরিত হতো ইলম, তাকওয়া, সৎকাজের আগ্রহ, সফলতা ও কল্যাণের নূরের ফল্গুধারা।

যাই হোক ওই বন্ধুটি লোকের ভিড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে ইবনে আব্বাস ﵄-কে জিজ্ঞেস করলেন, এইলোকগুলো কারা?

তিনি বললেন, এরা ইলম অন্বেষণকারী– তালেবুল ইলম। এরা মিশর, শাম ও ইরাকসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে এসেছে।

বন্ধুটির মুখ থেকে অজান্তেই উচ্চারিত হল– সুবহানাল্লাহ!

এরপর আব্বাস ﵄ লোকদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সবাই তখন কাঠফাটা রোদে পুড়ছে। ইবনে আব্বাস ﵄ ওযু করে বাড়ির আঙ্গিনায় বসে পড়লেন। একজন খাদেম বাইরে গিয়ে আওয়াজ দিল– যারা কোরআন ও তাফসির বিষয়ে জানতে এসেছেন তারা এগিয়ে আসুন।

তখন কিছু লোক এগিয়ে এলো। তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। কেউ সূরা মায়িদা সম্পর্কে, কেউ সূরা বাকারার কোনো আয়াত সম্পর্কে, কেউবা সূরা আলো ইমরান থেকে প্রশ্ন করল। কেউ বা আবার কোনো আয়াত বা সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি সকলের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

অতঃপর ইবনে আব্বাস ﵄ তাদেরকে বললেন, তোমাদের ভাইদের সুযোগ দাও। তোমাদের ভাইদের সুযোগ দাও।

তারা বেরিয়ে গেল। খাদেম পুনরায় আওয়াজ দিল, যারা হাদিস সম্পর্কে জানতে চান তারা আসুন। এবার অন্য একটি দল আসল। কিছুক্ষণ পর তারা চলে গেল।

এরপর ঘোষণা করা হল, যারা ফিকহ সম্পর্কে জানতে চান তারা আসুন। আরো কিছু লোক প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর তারাও বেরিয়ে গেল। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-র সেই বন্ধুটি বলেন, আল্লাহর কসম, এমন কোনো প্রশ্ন তাকে করা হয়নি যে, তিনি বলেছেন আমি এ সম্পর্কে জানি না। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস, কাব্য– সব তার আয়ত্তে ছিল। তার বন্ধু বলেন, কুরাইশরা যদি ইবনে আব্বাসে رضي الله عنه-র কেবল এই একটি মজলিসকে দেখত, তাহলে যুগের পর যুগ তারা এটিকে তাদের গৌরবের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করত।

কর্মকার বন্ধুর সাথে দেখা

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-র যে বন্ধু কর্মকারের পেশা গ্রহণ করেছিল সে একদিন ইবনে আব্বাস রাযি.'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পেল তার কাছে শত শত মানুষের ভীড়। কেউ তার কপালে চুমু খাচ্ছে। কেউ তার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে।

বন্ধুটি তখন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর কসম, হে ইবনে আব্বাস! সত্যি, সেদিন তুমিই সঠিক ছিলে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এই হল উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল। হতে পারে আমি কারো সঙ্গে একইসাথে পড়াশোনা শুরু করেছি। কিছুদিন পর দেখা গেল সে বড় আলেম, কিংবা কোনো বড় মসজিদে ইমাম অথবা কোরআনের হাফেজ বা দায়ি হয়ে গেছে। আর আমি সাধারণ মানুষই রয়ে গেছি। এখানে মূল পার্থক্যটা প্রথমত তৈরি হয়েছে দুজনার ইচ্ছার তারতম্যে। অতএব, যে চায় তার জীবনকে অর্থবহ করতে, জীবনে সম্মান পেতে, সাধারণ থেকে অনন্য হতে, তার উচিত আকাঙ্ক্ষাকে সমুচ্চ করা।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার ম্যাজিক

মানুষের চাওয়ার অন্ত নেই। সে চায় অনেক কিছু করতে। তার এ চাওয়ার রয়েছে বিভিন্ন ধরণ ও স্তর। কেউ আছে, তারা যা আশা করে তার অর্ধেক পেলেই সন্তুষ্ট থাকে। কেউ আবার প্রত্যাশার ছিটেফোটা মিলে গেলেও তুষ্ট হয়ে যায়। তবে কিছু লোক আছে এমন– সেরাটা অর্জনই থাকে তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এছাড়া অন্য কিছুতে তারা সন্তুষ্ট হতে চায় না। তেমনি একজনের ঘটনা বলছি। নাম তার ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব। সে তার জীবনের লক্ষ্য স্থীর করে নিয়েছিল যে, সে দেশের বাদশাহ হবে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সে নিজের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বাড়ি পর্যন্ত নির্মাণ করেনি। থাকতো ভাড়া বাড়িতে। কিছুদিন পরপর বদলাতো তার অবস্থান। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কখন নিজের জন্য নির্দিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন?

জবাবে সে বলল, আমার বাড়ি হবে হয়তো বাদশাহের বাড়ি অথবা জেলখানা কিংবা কবর।

وَنَحْنُ قَوْمٌ لَا تَوَسُّطَ عِنْدَنَا * لَنَا الصَّدْرُ دُوْنَ الْعَالَمِيْنَ أَوِ الْقَبْرُ

আমরা এমন জাতি, আমাদের কাছে মাঝামাঝি বলতে নেই কিছু। আমাদের জন্য হয় বিশ্ব-নেতৃত্ব অথবা কবর।

শিয়াল নয় সিংহ হও

চলো, আমরা এমন কিছু ঘটনা জানব, যেগুলো আমাদেরকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেবে। পাশাপাশি আমাদেরকে জানাবে একজন ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র জীবনে কীভাবে নিজেকে একজন স্মরণীয়, বরণীয় হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।
এক বড় ব্যবসায়ী তার ছেলেকে ব্যবসায়িক কলাকৌশল শিক্ষা দিতে চাইল। কারণ, সে চায়নি যে, তার ছেলে শুধু বাবার টাকায় আয়েশ

করবে, খাবে-দাবে আর ঘুমাবে। বরং সে চেয়েছিল তার সন্তান পাকা ব্যবসায়ীদের মতো ব্যবসায়িক সকল কলাকৌশল রপ্ত করবে। এই ভেবে সে তার ছেলেকে ডেকে বলল, হে আমার ছেলে! এই নাও। এখানে এক হাজার দেরহাম আছে। এগুলো নিয়ে ওমুক দেশে যাও। গিয়ে মালামাল কিনে আনো। সেগুলোকে লাভে বিক্রি করো। বস্তুত সে চাচ্ছিল তার ছেলে ভ্রমণে অভ্যস্ত হোক। বেচা-কেনায় পারদর্শী হয়ে উঠুক। ভ্রমণের ক্লান্তি ও ধকল সহ্য করে হয়ে উঠুক পরিণত।

ছেলেটি এক হাজার দেরহাম নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। কিছু দূর যাওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে গেল। পরিশ্রান্ত বদনে বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটি গাছের ছায়ায় বসল। আচানক তার দৃষ্টি পড়ল একটি অলস শিয়ালের ওপর। সে দেখল, শিয়ালটি ডানে বামে লজ নাড়তে নাড়তে তার মতো একটি গাছের ছায়য় এসে বসল। পরক্ষণেই সে দেখতে পেল, একটি সিংহ একটি হরিণকে তাড়া করছে। হরিণটি অত্যন্ত দ্রুত বেগে ছুটে পালাচ্ছে। হরিণটি বাঁচার জন্য একবার ডানে, একার বামে দৌঁড়াচ্ছে। কখনও কখনও তার দুপায়ের নিচ দিয়ে সিংহের নাকে মুখে পাথর, মটি কিংবা ধূলো ছুড়ে মারছে। সিংহটি কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না। হরিণের কৌশলি ছুটে চলা দেখেও সিংহটি হাল ছাড়ল না।

এক সময় হরিণটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফলে সিংহ হরিণটিকে ধরে ফেলল। অতঃপর সেটিকে মেরে ফেঁড়ে যৎসামান্য খেয়ে চলে গেল। তখন সেই অলস শিয়ালটি এগিয়ে গেল। সে দেখল তার সামনে বিনা কষ্টেই খাবার প্রস্তুত। সিংহের মতো তাকে দিতে হয়নি কোনো দৌড় ঝাঁপ। হতে হয়নি ক্লান্ত। গাছের শীতল ছায়ায় বসে থেকে কোনোরূপ ধূলাবালির স্পর্শ ও পরিশ্রম করা ছাড়াই তার সামনে উপস্থিত হয়ে গেল সুস্বাদু খাবার। সে মন ভরে খেল। খাওয়া শেষে আবার গাছের নিচে বিশ্রাম করতে চলে এলো।

এই দৃশ্য দেখে ছেলেটি মনে মনে ভাবল, সিংহটি কত পরিশ্রম করে হরিণের পেছনে দৌঁড়িয়ে খাবার জুটালো। অথচ শিয়ালটি অলসভাবে আরামে বসে থেকে নিজের সামনে খাবার প্রস্তুত পেয়ে গেল। তাহলে আমি জীবিকা অর্জনের জন্য কেন অযথা কষ্ট করতে যাবো? বুঝে গেছি– না খেয়ে আমাকে কখনই মরতে হবে না।

এই ভেবে সে ব্যবসায়িক ভ্রমণে না গিয়ে দেশে ফিরে গেল। পিতা তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আমার ছেলে! তুমি সকালে বের হয়ে রাতেই ফিরে এলে যে? অথচ তুমি যে কাজে বের হয়েছো তাতে তো এক সপ্তাহ লাগার কথা? আর তোমাকে যেসব মালামাল আনতে বলেছিলাম সেগুলো কোথায়?

ছেলেটি বলল, বাবা আমি পরিশ্রম করব না, অযথা কষ্টও করব না। আমি বুঝে গেছি, ক্ষুধার তাড়ানায় আমি কখনও না খেয়ে মরব না। এই বলে সে সিংহ ও শিয়ালের ঘটনাটি বাবার কাছে খুলে বলল।

পিতা ছেলেকে লক্ষ্য করে বলল, বাবা, আমি জানি তুমি কখনও না খেয়ে মরবে না। কিন্তু আমি চাই তুমি সিংহের মতো বাঁচো, শিয়ালের মতো নয়। আমি চাই তুমি ইমাম হবে; মুক্তাদি নয়। আমি চাই তুমি খতিব হবে; শ্রোতা নয়। আমি চাই তুমি পরিচালক হবে; পরিচালিত নয়। আমি চাই তুমি গাড়িতে বসে থাকবে আর কর্মচারীরা সাজিয়ে রাখবে তোমার গাড়ি। আমি চাই না তুমি তাদের একজন হও যারা মানুষের গাড়ি সাজিয়ে রাখে। কারণ, রাসুল ﷺ বলেছেন-

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। [বোখারী : ১৪২৭]

হে আমার ছেলে! আমি চাই তুমি ডাক্তার হবে; রোগী নয়। ইঞ্জিনিয়ার হবে; বসবাসকারী নয়। মানুষের চাওয়ার পার্থক্যগুলো এখানেই নিরূপিত হয়। তাইতে দেখা যায় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুজন ছাত্র একই সাথে ভর্তি হয়। কিছুদিন পর দেখা যায় একজন চলে গেছে ভালো অবস্থানে আর অন্যজন তদাপেক্ষা দুর্বল অবস্থানে। এটি হয়ে থাকে ইচ্ছা ও সাহসের ওপর নির্ভর করে।

আমার জীবনের একটি মজাদার গল্প

প্রায় বিশ-বাইশ বছর আগের কথা। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম সপ্তাহ পার করছি মাত্র। উচ্চমাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখা ছাত্রের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে তোমাদের সবারই জানা। সে তখন মনে করে যে, সে বুঝি অনেক বড় হয়ে

গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ সময় বাবারা সন্তানদের আলাদা গাড়ি দিয়ে দেয়। একাকী গাড়ি ড্রাইভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা শুরু করে। সে পড়াশোনার প্রাথমিক ধাপগুলো সমাপ্ত করে এসেছে। এখন রয়েছে শিক্ষা জীবনের সর্বশেষ ধাপে। এরপর পা রাখবে কর্মজীবনে।

তো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম সপ্তাহ চলছে। আমাদের মাঝে কিতাব বিতরণ করা হল। বিভিন্ন কিতাবের সাথে শায়খ আশ শাওকানি رحمه الله-র বিখ্যাত কিতাব 'ফাতহুল কাদির ফিত তাফসির' আমাদেরকে দেয়া হল।

কিতাবটি ছয় খন্ডে বিভক্ত। আমরা এর আগে এত বড় বড় কিতাব পড়িনি। উচ্চমাধ্যমিকের কিতাবগুলো ছিল ছোট ছোট। সেসময় সম্ভবত কোনো কিতাবই ৮০ পৃষ্ঠার অধিক ছিল না। এখন আমাদেরকে দেয়া হল ছয় ছয় খন্ডের কিতাব। কিতাবগুলো হাতে পেয়ে সবাই তা খুলে দেখতে লাগল। আমার সহপাঠীরা মেধার দিক থেকে বিভিন্ন স্তরের ছিল।

অতঃপর আমি 'রাওজুল মুরবে' নামক গ্রন্থটি হাতে নিলাম। কলম বের করে তাতে আমার নাম লিখলাম– د. عبد الرحمن العريفى (ডক্টর আবদুর রহমান আরিফী)। আমার এক সহপাঠী এ লেখাটি দেখল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমি। তদুপরি ভর্তি হয়েছি মাত্র এক সপ্তাহ হল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তোমার নামের শুরুতে د (ডক্টর) লিখেছ কেন?

আমি বললাম , ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ ﷻ যদি চান তাহলে আমি একদিন ডক্টর হবো। আল্লাহর ইচ্ছাতেই আমি উসূলদ দীন বিভাগে ভর্তি হয়েছি। আল্লাহর অনুগ্রহ হলে আমি ডক্টর হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।

আমার কথা শুনে সে মুখে তিরস্কারের হাসি ফুটিয়ে বলল, সে স্বপ্ন যে বহুদূর। সবসময় ওই د ই দেখবে, কখনও دكتور (ডক্টর) দেখবে না। অতঃপর সে তার তিরস্কারের ষোলকলা পূর্ণ করতে এটাও বলল

যে, তবে হয়তো তুমি دَجَاجَة (মুরগী) হবে; دكتور (ডক্টর) নয়। অতঃপর সে د দিয়ে শুরু হয় এমন বিভিন্ন শব্দ আমার নামের শুরুতে যোগ করে ঠাট্টা করতে লাগল।

আমি তার কথা শুনে হাসলাম। তার তিরস্কার ও ঠাট্টার জবাবে কেবল বললাম, আর মাত্র কয়েকটি বছর। তারপর ইনশাআল্লাহ তোমার চোখ থেকে ধূলো সরে যাবে। এবং এর যথার্থতা তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তারপর থেকে আমি সংকল্পে আরো দৃঢ় হলাম। যথাযথভাবে পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য সর্বদাই আমার সাথে ছিল। তাঁর অনুগ্রহ ও তাওফিকে আমি শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করলাম।

গল্পটি বলে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ম্যাজিক এমনই হয়ে থাকে। তোমার যদি কোনো কিছু অর্জনের অটুট লক্ষ্য থাকে। শুরু থেকেই থাকে তা বাস্তবায়নের জন্য একটি সৃচ্ছ পরিকল্পনা। এবং কোনোভাবেই তুমি যদি সে লক্ষ্য থেকে দূরে সরে না যাও, তাহলে অবশ্যই তুমি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। রাসুল ﷺ-র প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি কোনো বিষয়ে 'চলছে তো চলুক' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না; বরং তিনি সর্ববিষয়ে উত্তমতার সন্ধান করেছেন।

আমাদের একমাত্র আদর্শ রাসুল ﷺ। যিনি ছিলেন একাধারে সফল শিক্ষাবিদ, শ্রেষ্ট আবিষ্কারক ও মহান বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব।

মিম্বর আবিস্কার

রাসুল ﷺ খেজুর গাছের একটি কান্ডে হেলান দিয়ে জুমার খুতবা দিতেন। একদিন একজন আনসার মাহিলা রাসুল ﷺ-র কাছে এলেন। বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার ছেলে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। আমি কি তাকে বলব আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরি কররে দিতে?

দেখো, সেই মহিলাটি ছিলেন আবিস্কারমনা। তিনি রাসুল ﷺ-র সামনে তার একটি পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছিলেন। রাসুল ﷺ

মানুষের নিত্য-নতুন পরিকল্পনা, অর্থবহ মতামত ও নব উদ্ভাবনের মূল্যায়ন করতেন। তিনি কখনও নতুনত্বের পথকে রুদ্ধ করে রাখেননি। তাই তো মহিলাটি তার অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তো রাসুল ﷺ মহিলাটিকে কী বলেছিলেন? তিনি কি তাকে বলেছিলেন, মিম্বর বানানোর টাকাগুলো একত্রিত করে গরিব দুঃখিদের মাঝে বিলিয়ে দাও? নাকি বলেছিলেন, খোতবার মিম্বরে বসে বা খেজুর কান্ড ধরে দাঁড়িয়ে যেভাবেই দিই না কেন একই কথা। মিম্বর বানানোর কি দরকার? খোতবার কাজ তো চলছেই। নাকি তিনি মহিলার নব উদ্ভাবনি চিন্তার সাথে সহমত হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি সহমতই হয়েছিলেন। তিনি তাকে তার পুত্রের মাধ্যমে মিম্বর তৈরি করতে বললেন।

অতঃপর মহিলাটির ছেলে সপ্তাহব্যাপী কাজ করে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরি করে দিল। রাসুল ﷺ তাতে বসে খোতবা দিতে লাগলেন। এতে চমৎকার একটি আবহ সৃষ্টি হল।

আগে তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। আর এখন কয়েক স্তর বিশিষ্ট মিম্বরে বসে খোতবা দিচ্ছেন। বিষয়টি আরো সুন্দর হল। এখন তিনি খোতবার সময় উপস্থিত লোকদের প্রতি আরো বিস্তৃত পরিসরে দৃষ্টি রাখতে পারছেন। আগে মুসল্লীর আধিক্যের কারণে হয়তো প্রথম চার পাঁচ কাতার পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি যেতো। এখন তা আরো ব্যাপক হল। লোকদের সাথে তার দৃষ্টির যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পেল।

আরেকটি ঘটনা

আহযাবের যুদ্ধের সময় সালামান ফারসি رضي الله عنه রাসুল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা পারস্যে শত্রু মোকাবেলায় পরিখা খনন করতাম। আমাদের সামনে একটি যুদ্ধ উপস্থিত। শত্রু বাহিনীও কাছাকাছি চলে এসেছে। সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।

সালমান ফারসি رضي الله عنه-র প্রস্তাবে রাসুল ﷺ কী বলেছিলেন? তিনি কি বলেছিলেন, না, আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে থাকো। পরিখা খনন

করা অনেক কষ্টের। আমাদের তা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের সাহায্যে ফেরেশতারা আকাশ থেকে নেমে আসবে। তাই আমরা কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখবো।

না, তিনি এমনটি বলেননি। বরং তিনি বললেন, এটাতো উত্তম প্রস্তাব। এক্ষেত্রে উন্নত চিন্তার পথে এগোতে আমাদের কোনো বাধা নেই। অতঃপর তিনি সালমান ফারসী ﵁-র পরামর্শ মোতাবেক পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন।

প্রত্যেক দশজন লোককে প্রতি দশ হাত জায়গা খননের দায়িত্ব দিলেন। একইসাথে খননকৃত স্থানের জায়গার পাথরগুলো রাখার জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করলেন। যদি তাদের সামনে কোনো শক্তিশালী প্রস্তরখন্ড এসে পড়ে তাহলে সে অবস্থায় করণীয় সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করলেন। এককথায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের উত্তম পরামর্শগুলো সাদরে গ্রহণ করতেন।

প্রিয় বন্ধুরা! আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে যে দীন দিয়েছেন তাতে রয়েছে অন্তহীন সৌন্দর্য। যদি কারো হিম্মত হয় সুউচ্চ, তাহলে সে অর্জন করতে পারবে তার ঈপ্সিত বস্তুটি। তবে শর্ত হল, তাকে সঠিকভাবে, সঠিকপথে পরিশ্রম করতে হবে। অলসতাকে যে তার সঙ্গী বানিয়ে নেয়, জীবনে সে কখনও উন্নতির দেখা পায় না।

উচ্চাশা ও পরিশ্রমের ফল

আবু হুরায়রা ﵁ যখন বার্ধক্যে পদার্পন করলেন, তখন তার হাদিস বর্ণনার আধিক্য অনেককে অবাক করল। তারা বলতে লাগল, আরে আবু হুরায়রা তো বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাদের এ উক্তি শুনে আবু হুরায়রা ﵁ বললেন, মানুষ এমনভাবে বলছে, যেন তারা আমার বিরুদ্ধে এ অপবাদ দিচ্ছে যে, আমি হাদিস বানিয়ে বর্ণনা করেছি।

আসলে তিনি কিভাবে অন্যান্যদের তুলনায় বেশি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন তা শুনুন তার নিজের জবানেই–

আমি ছিলাম আহলে সুফফার একজন। আমার মুহাজির ভাইয়েরা যখন ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং আনসার ভাইয়েরা যখন নিজেদের সম্পদের দেখাশনা করতেন, তখন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-র দরবারে পড়ে থাকতাম। আমি এক নগণ্য ব্যক্তি। কোনোরকমে আমার পেট পুরলেই হতো। তাতেই সন্তুষ্ট থাকতাম। রাসুল ﷺ-র সাহচর্য গ্রহণ করতাম। ফলে অনেক হাদিস যেগুলো আমার পক্ষে শোনা সম্ভব হতো সেটা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হতো না।

একদিন আমি রাসুল ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে যে হাদিস শুনি তা তৎক্ষণাত মুখস্ত করে নিই। কিন্তু পরে তা ভুলে যাই। তখন রাসুল ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার চাদর প্রসারিত করো। আমি আমার গায়ে থাকা চাদরটি খুলে মাটিতে বিছিয়ে দিলাম। চাদরটি ছিল খুবই নগণ্য। আল্লাহর কসম, আমি দেখলাম, চাদরটির ওপর উকুন হাঁটছে।

আল্লাহর রাসুল ﷺ আমার জন্য কয়েকটি দোআ করলেন এবং বললেন, এটিকে জড়িয়ে নাও। আমি চাদরটি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। আল্লাহর কসম, এরপর থেকে আমি রাসুল ﷺ থেকে যা শুনতাম তা কখনও ভুলতাম না।

সুযোগ হঠাৎই আসে

সুযোগ জিনিসটা এমনই। হঠাৎ আসে। সে প্রতিদিন আপনার দরজায় এসে করাঘাত করবে না। বরং আপনারই খুঁজে নিতে হবে সুযোগকে। কবি বলেন–

وَمَا نَيْلُ الْمَطَالِبِ بِالتَّمَنِّي : وَلٰكِنْ تُؤْخَذ الدُّنْيَا غِلَابًا

শুধু আশার পাখায় ভর করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। কিন্তু পরিশ্রম ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্জন করা যা গোটা দুনিয়াটাই।

দেখো, উচ্চাশা এবং দৃঢ় মনোবল আবু হুরায়রা رضي الله عنه-কে কীভাবে মর্যাদার উচ্চাসনে পৌঁছে দিয়েছে। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আবু হুরায়রা رضي الله عنه-কে চেনে।

তুমি যদি ইবতেদায়ি মাদরাসার কোনো ছাত্রকে প্রশ্ন করো, তুমি কি আবু হুরায়রাকে চেন?

সে বলবে, হ্যাঁ চিনি।

অথচ, আবু হুরায়রা ﷺ সপ্তম হিজরীর খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত ইসলামই গ্রহণ করেননি। তথাপি তার উচ্চাশা ও সে আলোকে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম তাকে ইসলামের ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

অন্য সাহাবিদের জীবন-চিত্র

তুমি খালেদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-র জীবনেও দেখতে পাবে একই চিত্র। দেখতে পাবে আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী ﷺ-র জীবনেও। তদ্রূপ ওই সকল সাহাবি যারা ইসলামের ইতিহাসে সমাদৃত, যাদের আলোচনা এখনও মুসলমানদের মুখে মুখে; তারা সকলেরই দীনের ব্যাপারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তারা এমন লোক ছিলেন না যে, রাসুল ﷺ-র একবার সাহচর্য পেয়েই তুষ্ট হয়ে যেতেন। বরং সকলেই বারবার রাসুল ﷺ-র সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। এমনকি যুদ্ধের সময়ও তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ-র সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতেন না।

বেলাল ﷺ-কে দেখো, তিনি দীনের ব্যাপারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলেই জীবনের কঠিন যুদ্ধেও তিনি সত্যের ওপর অবিচল থাকতে পেরেছিলেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ-ও এ সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকদের দেখে খুশি হতেন।

বালক সাহাবীর উচ্চাশা

রাবিআ বিন কা'ব নামক এক বালক রাসুল ﷺ-র খাদেম ছিল। সে রাসুল ﷺ-কে ওযুর পানি এগিয়ে দিত। মাত্র তের বছরের সে বালকের কর্মকান্ড ও উচ্চাশা রাসুল ﷺ-কে অবাক করেছিল। বালকটি রাসুল ﷺ-কে ওযুর পানি এনে দিত। কখনও কখনও সে সারা রাত রাসুল ﷺ-র দরজার সামনে ঘুমাতো আর অপেক্ষা করত যে, কখন রাসুল ﷺ তার কাছে পানি চাইবেন।

একদিন সে রাসুল কে ওযু করাচ্ছিল। রাসুল ﷺ তাকে বললেন হে রাবিয়া, তুমি আমার কাছে কিছু চাও।

রাবিয়া বিন কা'ব ছিল আসহাবে সুফফার একজন গরীব সাহাবি। গায়ের পোযাক জরাজীর্ণ। চেহারায় ক্ষুধার ছাপ। তাই ভালো পোষাক ও খাবার ছাড়া তার চাওয়ার আর কী-বা থকাতে পারে?

সে রাসুল ﷺ-কে বলল, আমাকে একটু ভাবতে সুযোগ দিন।

রাসুল ﷺ তাকে ভাবার সুযোগ দিলেন। বালকটি ভাবতে লাগল, রাসুল ﷺ-র কাছে কী চাইব? কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! জান্নাতে আমি আপনার সাথে থাকতে চাই।

রাসুল ﷺ বললেন, আচ্ছা তা ঠিক আছে, কিন্তু আরও কিছু চাও।

রাবিয়া رضي الله عنه তখন এই ভেবে একটু লজ্জা পেল যে, সে কিছু কম চেয়ে ফেলল না তো? তথাপি সে আবার বলল, আমার এটাই চাওয়া, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। আর কিছু না।

তখন রাসুল ﷺ অবাক হলেন। বললেন, তুমি বেশি বেশি সেজদা করার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য পূরণে আমাকে সাহায্য করো।

যে নবী আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোআ করলে আল্লাহ ﷻ আসমান থেকে সোনার পাহাড় এনে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারেন, এমনটা জেনেও দু'বেলা খেতে না পারা এক বালক সাহাবী তাঁর কাছে শুধু একটা জিনিসই চাইল– আর তা হল জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ-র সাহচর্য লাভ।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদের সকলকে দীনের ব্যাপারে উচ্চাশা পোষণ করার তাওফিক দান করুন।

উচ্চাশা ছাড়িয়ে যায় মেঘমালাকেও

দীনের পথে উচ্চাশা ও কঠিন পরিশ্রম করলে তা দূর করে সকল বাধা বিপত্তি। অতিক্রম করে ঘন মেঘমালাকেও। তখন এর নির্ভরশীলতা না থাকে কোনো সম্পদের ওপর, না থাকে শারীরিক শক্তি ওপর, না থাকে অতিপ্রাকৃতিক মেধার ওপর, না থাকে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর ওপর। বরং এমন পবিত্র আত্মার ওপর থাকে তার নির্ভরশীলতা, যা হককে হক বলে চেনে। এবং ইসলামের অর্পিত দায়িত্ব আপন বলে গ্রহণ করে।

প্রতিবন্ধির উচ্চাশা ও হিম্মত

সুইডেন সফরের একটি গল্প। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, দক্ষিণ সুইডেনের একটি শহরের নাম মালো। সেখানে একটি মসজিদ আছে। গল্পটি সেই মসজিদকে ঘিরে। সত্য গল্প। গল্পের নায়ক পনের বছরের এক বালক। সুইডেনেরই নাগরিক। সোমালীয় বংশদ্ভূত। ছেলেটি ছিল মারাত্মক প্রতিবন্ধী। তথাপি তার হাতে বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি তার প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ। তদুপরি কীভাবে তার কাছে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করছিল– সেটি অতি আশ্চর্যেরই বটে!

শুরু থেকেই বলছি–

সুইডেন সফরে থাকাকালে একদিন সেখানকার দীনি ভাইয়েরা মালোর একটি মসজিদ দেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। মালো শহরে পূর্ণাঙ্গ মসজিদ বলতে ওই একটিই ছিল। বাকি যা ছিল সেগুলোকে স্বতন্ত্র মসজিদ বলা চলে না। বিভিন্ন রুম বা স্বতন্ত্র কোনো অ্যাপার্টমেন্টকে সালাতের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হতো। গম্বুজ ও মিনার সমেত মসজিদ ওই একটিই ছিল। বলছি দেড় যুগ আগের কথা।

এখন হয়তো সেখানে মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে। তো আমি সেখানে গেলাম। ইউরোপের মসজিদগুলো অবকাঠামোগতভাবে খুব সুন্দর হয়ে থাকে। মসজিদের চারপাশের পরিবেশও হয় দারুণ। এটি সেখানকার আলাদা এক বৈশিষ্ট্য। মালোর সেই মসজিদটিরও চারপাশ ছিল সবুজে ঘেরা। আমি যখন সেখানে পৌছলাম তখন সকাল বেলা। সেটি কোনো ফরজ সালাতের সময় ছিল না।

আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সোমালীয় বংশোদ্ভূত সুইডিশ এক প্রতিবন্ধী যুবক একটি চেয়ারে বসা। তার দু'হাত ও দু'পায়ের ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সেগুলো সর্বদা কাঁপতে থাকে। এ অবস্থাতেও সে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। প্রসঙ্গাত, যুবকটি কথাও বলতে পারত না। তবে অন্যের কথা শুনতে পেতো এবং ইংরেজি, সুইডিশ ও সোমালিয়ান– এই তিন ভাষা বোঝতো।

আমি যুবকটির কাছে গেলাম। তার কাঁধে হাত রাখলাম। মাথায় চুমু খেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, বৎস! কেমন আছো?

সে আরবি বুঝতো না। তাই তার সাথে ইংরেজিতেই বললাম। তাকে অসুস্থতায় ধৈর্যধারণের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। বললাম, তুমি তোমার অসুস্থতার জন্য সওয়াব পাচ্ছ। তারপর তাকে রাসুল ﷺ-র একটি হাদিস শোনালাম। এক ভাইকে ডেকে সেটির অনুবাদ করে দিতে বললাম।

আলোচনা শেষে তার কাছে জানতে চাইলাম, শুনেছি, এখানকার কিছু লোক তোমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? তুমি তো কথা বলতে পারো না। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব হল?

সে মাথা দুলিয়ে তার সহচরের দিকে ইশারা করল। সুইডেনের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে তার জন্য চারজন সহচর নিয়োগ করা হয়েছিল। যাদের দু'জন সকালে আর দু'জন সন্ধ্যায় এসে তার দেখাশোনা করত। ইশারা পেয়ে সহচর এসে তার মাথায় টুপির মত একটি জিনিস পরিয়ে দিল। টুপিটির সম্মুখভাগ ছিল লাঠির মত লম্বা। একটি বস্তু বের হয়ে এলো। অতঃপর তার সামনে একটি বোর্ড রাখা

হল। সেটির ওপর বর্গক্ষেত্রবিশিষ্ট একটি বড় কাগজ লাগানো ছিল। যেখানে ছিল অনেকগুলো চারকোণা ঘর আঁকা। প্রতিটি ঘরে তার নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু বাক্য লেখা। যেমন, ধন্যবাদ, আমি পানি চাই, গোসলখানায় যেতে চাই, আমার মায়ের সাথে দেখা করব, আমার বন্ধুর সাথে দেখা করব– এ জাতীয় বিভিন্ন বাক্য লেখা রয়েছে। সে যখনই কোনো কিছু বোঝাতে চাইতো তখন মাথায় লাগানো লাঠি দ্বারা নির্দিষ্ট বাক্যের দিকে ইশারা করত। এভাবেই সে তার প্রয়োজনের কথা অন্যকে বোঝাতো। সে আমাকে বলল, শায়খ! আপনার কাছে কি পূর্ণ কোরআনের সিডি আছে? আমি পরিপূর্ণ কোরআন মুখস্ত করতে চাই।

আমি তাকে বললাম আমার কাছে কয়েক ধরনের আছে। তুমি কোনটি চাও।

সে ইশারায় তার চাহিদার কথা জানালো। সে আমার কাছে তার আরেকটি ইচ্ছা ব্যক্ত করল– সে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে যেতে চায়। সেখানে গিয়ে সে ইলম অর্জন করতে চায়।

তার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে অবাক করল।

অতঃপর আমার সাথী ভাইয়েরা আমাকে বললেন, তাকে দেখে প্রভাবিত হয়ে কয়েকজন সুইডিশ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

জানতে চাইলাম, এটা কি করে সম্ভব? সে তো কথা বলতে পারে না। স্পষ্টকরে কিছু বোঝাতে পারে না। পারে না দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে।

তারা বলল, শায়খ, প্রতিদিন তার কাছে যখন কোনো কর্মচারী আসে, তখন সে নিত্য প্রয়োজনীয় বাক্য লেখা বোর্ডের একটি ঘরের দিকে ইশারা করে, যেখানে লেখা রয়েছে –আমার অমুক বন্ধুর সাথে দেখা করো। বন্ধুর কাছে যাওয়ার পর পর সে অন্য একটি লেখার দিকে ইশারা করে। যেখানে লেখা রয়েছে– তাকে জিজ্ঞেস করো ইসলাম কি? (সেই বন্ধুটির সাথে তার আগে থেকেই বোঝা পড়া থাকে)।

তাই সে যখন তাকে প্রশ্ন করে– 'ইসলাম কী'? তার সেই বন্ধুটি তখন ইসলামের পরিচয় বর্ণনা করতে থাকে। অতঃপর সে কর্মচারীকে বলে তাকে জিজ্ঞেস করো ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মাঝে পার্থক্য কী?

কর্মচারী সেই বন্ধুটির কাছে প্রশ্নটি রাখে। আর বন্ধুটি তা ব্যখ্যা করতে থাকে।

এভাবে যুবকের সেই বন্ধুটি ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ পাঠদান করে। প্রায় আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে এই পাঠদান। এরপর যখন এই কর্মচারীর ডিউটির সময় শেষ হয়ে যায়, তখন যুবকটি তাকে ডেস্কের দিকে ইশারা করে একটি ইসলামি বই নিতে বলে। আর বলে এটি তোমার জন্য উপহার। কর্মচারীটি তখন সেই বইটি নিয়ে চলে যায়। আর এভাবেই কয়েকজন কর্মচারী এই প্রতিবন্ধী যুবকটির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

প্রিয় পাঠক! এটি একটি সত্য ঘটনা। আমার দু'চোখ যার সাক্ষী। বস্তুত, দীনের ব্যাপারে উচ্চাশা ঘন মেঘমালা সরিয়ে সামনে অগ্রসর হয়।

দেখেছো, প্রতিবন্ধী যুবকটি তার দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধকাকে অজুহাত বানিয়ে বসে থাকেনি। সে বলেনি যে, আমি তো নড়াচড়া ও কাথা বলতে অক্ষম। মুখে বলে কিংবা হাতে লিখে কাউকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সামর্থ্য রাখি না। অতএব আমি ইসলাম প্রচারে কিভাবে কাজ করব? না। সে এমনটি করেনি। বরং সে তার ভেতরে নবীদের প্রতিনিধিত্ব করার হিম্মত ও উচ্চাশা লালন করেছে। নবীদের মাঝেও অনেক নবী ছিলেন যাদের হাতে মুষ্টিমেয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সেও নবীদের উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করছে। তাই তো তার হাতেও কয়েকজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আরেকটি ঘটনা

আরেকটি কাহিনী শোনাচ্ছি। সত্য কাহিনী। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কাহিনী হল আল্লাহর বাহিনীর মত। কারণ, কখনও কখনও

অনেক পাপী ব্যক্তিকেও দেখা যায় তাওবা করে ভালো হয়ে যেতে। যার নেপথ্যে থাকে কোনো কাহিনী শ্রবণ।

রিয়াদে একটি প্রতিবন্ধী হাসপাতাল আছে। ওই হাসপাতালে পিঠ কুঁজো, ঘাড় ভাঙ্গা, প্যারালাইসিসে আক্রান্ত এমন কঠিনতর প্রতিবন্ধীদের চিকাৎসা করা হয়। আমরা একবার সেই হাসপাতালটি পরিদর্শনে গেলাম। উদ্দেশ্য রোগীদেরকে কিছু নসীহত করা। তাদেরকে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান ও সান্ত্বনার বাণী শোনানো।

অসুস্থদের দেখতে যাওয়া বহু সাওয়াবের কাজ। আর সেই রোগীটি যদি এমন হয় যিনি এক সপ্তাহ কিংবা দুসপ্তাহ নয়; বরং এক বছর কিংবা দু বছর যাবৎ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। তাহলে তখন সাওয়াবের পরিমাণ কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

হাসপাতালটি অনেক পুরনো। গাড়ি দিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল আমরা কোনো জঙ্গালের ভেতর যাচ্ছি। তাছাড়া দর্শনার্থী কম হওয়ায় হাসপাতালাটির প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের গুরুত্বও খানিকটা কম। সেখানে বিশ ঘন্টাই সাক্ষাতের সুযোগ রয়েছে। আমি হাসপাতালটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ একজন রোগীর ওপর আমার দৃষ্টি পড়ল। বয়স সতের-আঠারো হবে। সে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে। সারি সারি উট রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার গাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। ফলে সে এত গুরুতর আহত হয়েছে যে, এখন মাথা ছাড়া আর কিছুই নাড়াতে পারে না। দেখলাম সে যেই বিছানায় শোয় তার সামনের দেয়ালে আশ্চর্য একটি জিনিস ঝুলানো রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটি পবিত্র কোরআনের একটি পৃষ্ঠার অনুলিপি। পৃষ্ঠাটি প্রায় এক বর্গমিটার সমান। আর তরুণটি প্রায় দুই মিটার দূরে খাটে শুয়ে তা মুখস্ত করছে।

আসল ঘটনা হল দূর্ঘটনা তার শারীরিক শক্তি কেড়ে নিলেও পারেনি মানসিক শক্তি কেড়ে নিতে। সে পারত না কোরআন হাতে স্পর্শ করতে। পারত না কম্পিউটারের স্ক্রীন কিংবা বাটনে হাত রেখে তা পড়তে। পারত না টেপরেকর্ডারে বারবার অন অফ কিংবা ক্যাসেট পরিবর্তন করে কোরআন শুনতে। কিন্তু সে দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না।

সে তার পরিবারকে বলল, তারা যেন তার উপযোগী করে পবিত্র কোরআনের এমন একটি অনুলিপি করে আনে, যা দেখে সে পবিত্র কোরআন মুখস্ত করতে পারে। তার পরিবার তাই করল।

আমি যখন তার কাছে গেলাম, তখন সে সূরা মুজাদালা থেকে মুখস্ত করছিল। এভাবে সে পনেরো পারার অধিক মুখস্ত করে ফেলেছিল। দেখলাম তার পাশে একটি বড় কার্টুন। যেখানে অনেকগুলো কাগজ একটার ওপর একটা ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কী?

সে সাবলিলভাবে কথা বলতে পারত না। ইশারায় বোঝালো, এখানে পনের পারা পবিত্র কোরআনের অনুলিপি করা আছে। যেগুলো সে মুখস্ত করেছে।

সুবহানাল্লাহ! এ তরুণটি তার কঠিন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে পবিত্র কোরআন মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যেই সে পনের পারা মুখস্ত করে ফেলেছে। সে নিজেকে একথা বলেনি যে, আমি তো মারাত্মক অসুস্থ। আমার এসব করার কি দরকার?

কিছুদিন পর আমি পুনরায় সে বালকটিকে দেখতে গেলাম। দেখলাম এ সে এখন তার একটি হাত ১৫% নাড়াতে পারে।

সুবহানাল্লাহ! কত উচ্চ হিম্মত ছিল তার। অথচ আমাদের কত ছেলে মেয়ে ও ভাই বোনেরা কেবল পবিত্র কোরআন মুখস্ত করার আগ্রহই অন্তরে পোষণ করে বেড়ায়। কিন্তু মুখস্ত শুরু করার হিম্মত যোগাতে পারে না। তারা যখন কাউকে পবিত্র কোরআনের কোনো মঞ্জিল মুখস্ত করতে দেখে, কিংবা দেখে দশ বছরের ছোট্ট একটি বালক পবিত্র কোরআন মুখস্ত করে ফেলেছ, তখন দীর্ঘশ্বাষ ছাড়ে। আর মনে মনে বলে, হায়! আমিও যদি তার মতো কোরআন মুখস্ত করতে পারতাম। আমার এক ভাই। বয়স প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। তাকেও দেখতাম অন্তরে কেবল আশা করত আর বলত, হায়! আমি যদি পবিত্র কোরআন মুখস্ত করতে পারতাম।

জিজ্ঞেস করতাম, তা মুখস্ত করছেন না কেন?

সে বলত, আমি যে এখন পরি না।

আসলে তার কথাটি সত্য নয়। ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কারণে সে সাহস পাচ্ছে না। চাইলে সেও ওই দশ বছরের বালকটির মত পবিত্র কোরআন মুখস্ত করতে পারবে। সেও পারবে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা হল, মানুষ অল্পতেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। উচ্চাশা করার সাহস পায় না। বস্তুত, যদি কেউ আল্লাহ ﷻ-র ওপর ভরসা করে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দুর্দান্ত সাহস ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে কোনো কাজ শুরু করে, তাহলে সফলতা অবশ্যই তার পদচুম্বন করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদের গল্প

আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ। একজন অন্ধ সাহাবী। যিনি ছিলেন সুউচ্চ লক্ষ্য অর্জনের মূর্ত প্রতিক। এক রাতের ঘটনা। রাসুল ﷺ আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما-কে সাথে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন। তারা মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ শুনতে পেলেন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আওয়াজে কে যেন কোরআন তেলাওয়াত করছে। গভীর রাত। মানুষেরা ঘুমে নিমজ্জিত। ঠিক এ সময় আল্লাহর এক গোলাম মসজিদে নববীতে কোরআন তেলাওয়াত করছে।

মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে রাসুল ﷺ তার কোরআন তেলাওয়াত শুনছিলেন। যিনি এত সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ। তখন রাসুল ﷺ বললেন, কেউ যদি চায় কোরআন যেভাবে নাজিল হয়েছিল সেভাবে তেলাওয়াত করতে, তবে সে যেন আবদুল্লাহর কেরাতে তেলাওয়াত করে।

আবদুল্লাহ رضي الله عنه তেলাওয়াত শেষ করে মুনাজাত শুরু করলেন। তিনি আদৌ জানতেন না যে, পেছন থেকে আল্লাহর রাসুল ﷺ তাকে শুনছেন। রাসুল ﷺ বললেন, চাও তোমাকে দেয়া হবে। চাও তোমাকে দেয়া হবে। চাও তোমাকে দেয়া হবে। [বোখারী]

সেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলেন। রাসুল ﷺ এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের কয়েকটি যুদ্ধ আবশ্যক হয়ে

পড়ল। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ সাহাবীদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের সাথে আমিও যুদ্ধে যেতে চাই।

সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে রুখসত দিয়েছেন। কারণ, পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

> অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই। [সূরা নূর, আয়াত : ৬১]

তথাপি তিনি বললেন, আমি যুদ্ধে যেতে চাই। তোমরা আমাকে একটি ঝান্ডা দাও। আমি অন্ধ মানুষ। কিছু না পারি অন্তত ইসলামের ঝান্ডাটি ধরে রাখবো। যেহেতু আমি অন্ধ, তাই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কমপক্ষে মুসলমানরা ইসলামের ঝান্ডা দেখে সেখানে এসে জড়ো হতে পারবে। তাছাড়া এই ঝান্ডা বহনের দায়িত্ব কাউকে না কাউকে তো আঞ্জাম দিতেই হবে। অন্য একজন দৃষ্টিসম্পন্ন সৈন্যের পরিবর্তে যদি আমি পতাকা বহন করি তাহলে মুসলিম বাহিনীতে একজন সৈন্য বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে সাহাবায়ে কেরাম তাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি যোদ্ধাদের সাথে বারবার ধাক্কা খাচ্ছিলেন। ঘোড়ার বিকট হ্রেষাধ্বনি তাকে দিশেহারা করে তুলছিল। কিন্তু তিনি ইসলামের ঝান্ডা হাতে অবিচল রইলেন। যেন এক সুবিশাল পর্বত ইসলামি ঝান্ডা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুসলিম বাহিনী যখনই তাদের ঝান্ডাতলে সমবেত হতে যেতেন, তিনি আরো মজবুত করে ইসলামের ঝান্ডা আঁকড়ে ধরতেন।

আচানক শত্রুপক্ষের একটি নির্দয় তীর এসে তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। ঈমানের বলে বলীয়ান, দৃঢ় প্রত্যয়ী এই অন্ধ মুজাহিদ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। তিনি লুটিয়ে পড়লেন জমিনে। ইসলামের ঝান্ডাটি তখনও শোভা পাচ্ছে তার মজবুত হাতে।

এই ঘটনার পর দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন প্রাণচঞ্চল কোনো ব্যক্তির জন্য ইসলামের প্রয়োজনে জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে

রাখার কোনো অজুহাত থাকতে পারে না। অন্তত সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আমল থেকে কোনো মুসলিম বিমুখ হতে পারে না। কারণ, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের সাধ্য সীমানার মধ্যকার কাজগুলো সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ-র সামনে জবাবদিহি করতে হবে। যার কথা বলার শক্তি রয়েছে তাকে প্রশ্ন করা হবে– তুমি কেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করো নি?

সুস্থ পদযুগলের অধিকারীকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কেন মসজিদে যাওনি? তোমার চলন ক্ষমতাকে কেন আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে ব্যবহার করোনি?

বিত্তশালীকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কেন আল্লাহ ﷻ-র পথে তোমার সম্পদ ব্যয় করোনি? কেন গরিব-দুঃখীকে তাদের অধিকার দাওনি?

এমনিভাবে শারীরিকভাবে সুস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের প্রাপ্ত নেয়ামতের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। জানতে চাওয়া হবে একজন প্রতিবন্ধি যদি তার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মানব সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে সুস্থ ও প্রতিভাবান হয়েও তুমি কেন পারো নি?

তাই সকল নারী-পুরুষ– হোক সে কারো পিতা কিংবা মাতা, স্বামী কিংবা স্ত্রী, শিক্ষক কিংবা ছাত্র, মসজিদের ইমাম কিংবা চাকুরিজীবী– প্রত্যেকের জন্যেই উচিত ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে অবদান রাখা। পাশাপাশি সাধ্যানুযায়ী দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা প্রার্থনা, তিনি আমাদের সকলকে তাঁর আনুগত্যে অটল রাখুন। আমাদেরকে দান করুন সামগ্রিক কল্যাণ। আমাদের জীবনকে করুন সৌভাগ্যমন্ডিত। চিরকাল আমাদেরকে অবিচল রাখুন সত্যের ওপর। পরকালীন স্বার্থক জীবন যাদের আমাদেরকে তাদের দলভূক্ত করুন।

যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾

আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। [সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ১২]

কিছু মানুষ রয়েছেন মৃত্যুর পরও যাদের সাওয়াব অব্যাহত থাকে। আর কিছু মানুষ রয়েছে মৃত্যুর পরও তাদের পাপ অব্যাহত থাকে। কারণ, প্রথম শ্রেণির লোকেরা নেক কাজের প্রচলন করে গেছেন আর দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা করে গেছেন পাপ কাজের।

প্রত্যেকেরই পৃথিবীর বুকে এমন কাজ করে যাওয়া উচিত যেন মৃত্যুর পর তার কাছে নেক পৌঁছতে থাকে। এমন কিছু করে না যাওয়া, যার ফলে মৃত্যুর পরও তার পাপের বোঝা অব্যাহতভাবে ভারি হতে থাকে।

সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে চাও যদি

সফলতার শীর্ষচূড়ায় পৌঁছতে মানুষকে হাজারো প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করতে হয়। কেউ এই প্রতিকূলতা উতরে যেতে পারে। কেউ পারে না। যে পারে তার পক্ষেই কেবল কাঙ্ক্ষিত চূড়া স্পর্শ করা সম্ভব হয়। যে পারে না তাকে নিচেই পড়ে থাকতে হয়।

مَنْ لَا يُحِبُّ صُعُودَ الْجِبَالِ * يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الْحُفَرِ

যে চায় না পাহাড়ে চড়তে, সে আজীবন পড়ে থাকে গর্তে ।

মনে, সফলতা একটি সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর রয়েছে। অনেকেই চাচ্ছে সেটি অর্জন করতে। পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে তাকে নিজের করে নিতে। তখন হিম্মতের ভিন্নতা ও অর্জনেচ্ছার তারতম্য তাদেরকে বিভক্ত করে দেবে। তাদের মধ্যে কেউ পহাড়ের এক চতুর্থাংশ, কেউ অর্ধেক কেউ বা দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আরোহণ করতে পারবে। এভাবে

দেখা যাবে খুব কমসংখ্যকই পাহাড়টির শীর্ষচূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে। অর্জন করতে পেরেছে কাঙ্ক্ষিত সফলতা।

তদ্রূপ ইলম অর্জন, ব্যবসা-বানিজ্য, হিফজুল কোরআন, শিল্প-সংস্কৃতি, বয়ান-বক্তৃতা, আত্ম উন্নয়ন, সন্তান লালন-পালন, দাম্পত্যজীবন, কর্মক্ষেত্র ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সফলতার একটি শীর্ষচূড়া রয়েছে। ব্যক্তির হিম্মত ও প্রচেষ্টতার ভিন্নতায় কেউ তার শীর্ষচূড়া স্পর্শ করতে পারে, কেউ পারে না।

আসমায়ির আজব গল্প

গল্পটি আত তানুখি তার اَلْفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَّةِ- কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আবদুল মালিক ইবনে কারিব আসমায়ি নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। বসবাস করতেন বসরায়।

ইলম অর্জনে ছিল তার প্রচন্ড আগ্রহ। প্রত্যহ সকালে তিনি ইলম অর্জনের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন। সারাদিন বিভিন্ন আলেমের দরবার ঘুরে ঘুরে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ভাষা সম্পর্কে ইলম অর্জন করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন। কেবল ইলম অর্জনেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন তিনি। টাকা পয়সা উপার্জনের কোনো চেষ্টা কখনও করতেন না। জ্ঞান চর্চাতেই কেটে যেতো তার সারাবেলা।

তার বাড়ির পাশেই ছিল একটি মুদি দোকান। বাড়ি থেকে যাতায়াতের পথে মুদি দোকানটি অতিক্রম করতে হতো। আসমায়ির বয়স তখনও কুড়ি হয়নি। ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা নিয়ে প্রতিদিন ওই মুদি দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দোকানদার আসমায়িকে জিজ্ঞেস করত, আসমায়ি, কোথায় যাচ্ছ?

আসমায়ি বলতো, অমুখ শায়খের কাছ থেকে হাদিস লিখে আনতে যাচ্ছি।

সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসতেন তখন দোকানদার আবার জিজ্ঞেস করত, আসমায়ি, কোথা থেকে এলে?

জবাবে তিনি বলতেন, অমুক জ্ঞানীর কাছ থেকে ইলম শিখে এলাম।

এভাবেই প্রতিদিন সেই দোকানদার আসমায়ীকে একই প্রশ্ন করত আর আসমায়ী তার জবাব দিতেন। ইলম অন্বেষণ ও জ্ঞানার্জনের প্রতি আসামায়ীর আগ্রহ দিন দিন বাড়ছিল।

একদিনের কথা। দোকানদার আসামায়িকে বলল, আসামায়ি দাঁড়াও। তিনি দাঁড়ালেন।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, বৎস, কেন অযথা ওসব লোকদের পেছনে ঘুরে জীবনটাকে নষ্ট করছ? এদের পেছনে ঘুরে তুমি কিছুই অর্জন করতে পারবে না। তারচে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো। ধন সম্পদ অর্জনে মন দাও।

আসমায়ি বলল, না, আমি ইলম শিখব। পবিত্র কোরআন মুখস্ত করব। বিভিন্ন ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করব। কাব্য ও সাহিত্যে সুউচ্চ শিখরে পৌঁছব।

আসমায়িকে প্রতিদিন কিতাবের বিশাল বোঝা নিয়ে এখানে ওখানে ছুটতে হতো। কারণ, তখনকার সময়ের কিতাবাদি বর্তমান সময়ের মতো এত সহজেই স্থানান্তর করা যেতো না। ছিল না এতোটা সহজলেখ্যও। তখন কিতাবাদি বিভিন্ন চামড়া বা অন্য কিছুতে লেখা হতো। লিখতে হতো দোয়াত কালির সাহায্যে। বর্তমান সময়ের মতো পকেটে বহনযোগ্য বল পয়েন্ট সেযুগে ছিল না। তখন ইলম অর্জন অনেক কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল।

ইলম নিয়ে ঠাট্টা

দোকানদার এই বিষয়টি নিয়ে তার সাথে ঠাট্টা করা শুরু করল। সে আসমায়িকে বলল, তুমি প্রতিদিন কত কষ্ট করো। কিতাবের বিশাল বোঝা কাঁধে নিয়ে এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করো। তারচে একটা কাজ করো। তোমার কিতাবগুলো আমাকে দিয়ে দাও। বিনিময়ে আমি তোমাকে কিছু মুদি মালামাল দেব।

আসমায়ি বলল, না, আমি তোমাকে আমার কিতাব দেব না। আমার কাছে তোমার এসব মালামালের কোনো মূল্য নেই।

দোকানদার আবার তাকে বিদ্রূপ করে বলল, শোনো, আমার কাছে আরেকটা বুদ্ধি আছে। চলো, তোমার কিতাবগুলো পানিতে ফেলে দিই। তারপর দেখি সেগুলো থেকে কেমন রং বের হয়। লাল, কালো নাকি নীল?

আসমায়ি তার বিদ্রূপের কোনো জবাব দিলেন না। চুপচাপ বাড়ি চলে এলেন। পরদিন থেকে তিনি ফজরের আগেই ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। যেন ওই দোকানদারে সাথে সাক্ষাত না হয়। ফিরতেন এশার পর। যখন দোকানদার দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যেতো।

বাদশাহের দরবারে ডাক এলো

সময় এগিয়ে চলল। এরপর কি ঘটল তা আসমায়ির নিজের মুখেই শুনি–

একসময় আমার অভাব-অনটন কঠিন আকার ধারণ করল। অভাবের তাড়নায় আমি ভিটে-মাটি সবকিছু বিক্রি করে দিলাম। এমনকি দু মুঠো খাদ্যের জন্য আমার বিছানা-পত্র, চাদর, বালিশ এবং কাপড় চোপড়ও বিক্রি করতে বাধ্য হলাম।

এক পর্যায়ে আমার অবস্থা নিচু শ্রেণির মানুষের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। ছেঁড়া-ফাটা ও ময়লা কাপড় চোপড় ছাড়া ভালো একটি পোশাকও আমার ছিল না। মাথার চুল অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে গিয়েছিল। নরসুন্দরের কাছে যাওয়ার মতো পয়সা ছিল না।

একদিনের ঘটনা। আমি বসরার রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। হঠাৎ একজনকে বলতে শুনলাম, তোমরা কেউ আসমায়িকে চেন?

লোকজন আমাকে দেখিয়ে দিল। লোকটি আমার কাছে এসে আমাকে ভালোভাবে একবার দেখে নিয়ে বলল, তুমিই কি সেই প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক– আসমায়ি?
বললাম, হ্যাঁ, আমিই আসমায়ি।

লোকটি বলল, আমি বসরার আমির মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আল হাশেমি'র পক্ষ থেকে এসেছি। বাদশাহ তোমার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তোমার যা অবস্থা! কাপড়-চোপড় কী নোংরা ও ছেঁড়া-ফাঁড়া। মাথার চুল দেখে মনে হচ্ছে সেলুনে যাওনি বহুদিন। এ অবস্থা নিয়ে বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করা ঠিক হবে না।

আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমার কাছে গোসলখানায় গিয়ে গোসল করার মতো পয়সা নেই। (সেসময়ে উত্তমরূপে গোসল করতে মানুষ বিশেষ গোসলখানায় যেতো। যেখানে সাবানসহ গোসলের প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা থাকতো। টাকার বিনিময়ে সেখানে গোসল করতে হতো।) তাই উত্তমরূপে গোসল করতে আমাকে গোসলখানায় যেতে হবে। যেতে হবে সেলুনেও। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার কাছে একটি কানা কড়িও নেই।

বাদশাহর দূত বলল, আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি এখনই আসছি। এই বলে সে বাদশাহর দরবারে চলে গেল। ফিরে এসে বলল, এই নাও একহাজার দেরহাম। এগুলো বাদশাহ তোমার জন্য পাঠিয়েছেন। এবার তুমি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে বাদশহর দরবারে আসো।

আসমায়ি বলেন, আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। বাদশাহর পাঠানো হাদিয়া দিয়ে ভালো জামা-কাপড় কিনলাম। সেলুনে গিয়ে চুল পরিপাটি করলাম। উত্তমরূপে গোসল করলাম। মাথায় পাগড়ি বাঁধলাম। কেতাদুরস্ত হয়ে বাদশহর দরবারে হাজির হলাম।

আমাকে দেখে বাদশাহ বলল, তুমিই কি ভাষাবিদ আসমায়ি?

বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, বাগদাদ থেকে খলিফা হারুনুর রশিদ চিঠি পাঠিয়েছেন। তার সন্তানদের পড়ানোর জন্য তিনি একজন ভাষাবিদ খুঁজছেন। দরবারের লোকজন সবাই তোমার কথা বলল, তুমি নাকি বড় কবি ও সাহিত্যিক। ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখো। তা তুমি কি খলিফার সন্তানদের ব্যক্তিগত শিক্ষক হতে ইচ্ছুক?

বললাম, জি, আমি রাজি আছি।

বাদশাহ আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, এই নাও যাতায়ত খরচ। তুমি বাগদাদে চলে যাও।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। সামান্য যা কিছু আসবাবপত্র ছিল তা নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

খলিফার দরবারে

বাগদাদে পৌঁছে খলিফার দরবারে হাজির হলাম। খলিফা আমার কবিতা, সাহিত্যমান এবং ভাষাগত দক্ষতা দেখে দারুণ খুশি হলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। আমাকে রাজ দরবারের একজন সদস্য করে নিলেন। ধীরে ধীরে আমি খলিফার দরবারে পদোন্নতির চেষ্টা করতে লাগলাম। শিক্ষামূলক বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত হতে লাগলাম। সেখানে আমার আলোচনায় সবাই সমুগ্ধ প্রশংসা করতে লাগল। আমি আরো উদ্দীপ্ত হলাম।

একটা সময় খলিফার দরবারে আমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেল। সময়ের সাথে সাথে আমি আরো ঋদ্ধ হলাম। আমার কথা-বার্তায় ভারিক্কি এলো। বাক্য চয়ন আরো চমৎকার হল। বাকপটুতা বৃদ্ধি পেল। আমার গুণমুগ্ধদের বললাম, যে ব্যক্তি পরিশ্রম করবে এবং সঠিক নিয়মে চেষ্টা করবে, তার জীবনে এর প্রভাব সে অবশ্যই দেখতে পাবে।

খলিফা আমাকে পছন্দ করলেন। বললেন, আমি তোমাকে আমার সন্তানের ভাষা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলাম। বাদশাহ আমার জন্য একটি পৃথক ঘর নির্ধারণ করলেন। আমি বাদশাহর সন্তানকে শিক্ষা দিতে লাগলাম।

এভাবে খালিফার দরবারে আমি কয়েক বছর কাটালাম। এ সময়ের মধ্যে বাদশাহর ছেলেকে ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী করে তুললাম। তাকে কাব্য শাস্ত্র শিক্ষা দিলাম। আমার হাতেই সে পবিত্র কোরআনের হাফেজ হল।

নির্মাণ করলেন প্রাসাদসম বাড়ি

খলিফা আমাকে মাসিক হারে বেতন দিতেন। যে পরিমাণ বেতন আমি পেতাম তা আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পরও উদ্বৃত্ত থেকে যেতো। এভাবে আমার কাছে বেশ কিছু টাকা জমে গেল। তা দিয়ে আমি বসরায় একটি প্রাসাদসম বাড়ি বানালাম।

এছাড়া লোকজন খলিফার কাছে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে দরখাস্ত লিখতে হলে আমার কাছে চলে আসতো। আমি তাদেরকে দরখাস্ত লিখে দিতাম। তারাও আমাকে কিছু বখশিশ দিতো।

অনেক সময় লোকজন খলিফার দরবারে পৌঁছানোর জন্য আমার কাছে বিভিন্ন ফাইল পত্র দিত। আমি সেসব ফাইল খলিফার কাছ থেকে সরাসরি সই করিয়ে নিতাম। তার ছেলের শিক্ষক হওয়ায় তার কাছে আমার বিশেষ মর্যাদা ছিল। এই সুবাধেও লোকজনের কাছ থেকে আমি বেশ কিছু হাদিয়া পেতাম। এভাবে আমার কাছে অনেক টাকা জমে গেল। তা দিয়ে আমি বসরাতে অনেক জমিজমা ও ফলমূলের বাগান খরিদ করলাম।

একদিন খলিফা আমাকে তার দরবারে ডেকে নিয়ে বললেন, আমার ছেলের বয়স এখন সতের-আঠারো। আমি চাই এখন থেকে সে জুমার খোতবা দেবে। সে কি খোতবা পারবে দিতে?

বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই সে খুতবা দিতে পারবে। ছয় সাত বছর ধরে সে আমার নিকট আরবী ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। খোতবা দেয়ার কৌশল শিখছে।

অতঃপর আমি তাকে একটি খোতবা উত্তমরূপে মুখস্ত করালাম। কিভাবে জনসম্মুখে সেই খোতবাটি উপস্থাপন করবে তার পদ্ধতি শেখালাম। যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে সে মিম্বারে ওঠল। সমবেত লোকদের সামনে দারুণভাবে তা উপস্থাপন করল। তার খোতবা শুনে সবাই সন্তুষ্ট হল। পুরস্কার স্বরূপ চতুর্দিক থেকে দিনার দিরহামের বৃষ্টি ঝরতে লাগল। অনেকে আমার দিকেও দিনার দিরহাম ছুঁড়তে লাগল।

কারণ, তার আজকের এই সাফল্যের পেছনের মানুষটি যে আমি- একথা তাদের জানা ছিল।

অবশেষে, খলিফা আমাকে বললেন, হে আবদুল মালিক! আল্লাহ ﷻ আপনাকে কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ করুন। মাশাআল্লাহ, আপনার হাত ধরেই আমার ছেলে পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। ভাষা-সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে। এমনকি হাদিস বিষয়েও পারদর্শী হয়েছে। এখন থেকে সে আমার সাথেই থাকবে। তার শিক্ষাকার্যক্রম আপাতত বন্ধ রাখলেও চলবে। তো আপনি চাইলে এখানেও থাকতে পারেন, আবার বসরাতেও চলে যেতে পারেন। সিদ্ধান্ত আপনার।

আমি বললাম, আমি আমার জন্মভূমি বসরাতেই চলে যেতে চাই।

খলিফা বললেন, বেশ, তাহলে এখন বলুন, আপনাকে আমি কি দিতে পারি?

বললাম, আল্লাহ ﷻ আপনাকে বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করুন। বসরায় আমি বেশ কিছু জমিজমা কিনেছি। বসবাসের জন্য একটি বাড়ি বানিয়েছি। আমার কিছুই লাগবে না।

খলিফা বললেন, না, তা কী করে হয়? আমি আপনাকে আরো কিছু হাদিয়া দিচ্ছি। নিন এই পশুগুলো আপনার। এই উটগুলো আপনার। এভাবে তিনি আমাকে নানা মূল্যবান জিনিসপত্র দিতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, আপনার বিশেষ কোনো চাওয়া থাকলে বলুন, ইনশাআল্লাহ আমি তা পূরণ করতে চেষ্টা করব।

আমি বললাম, আমার বহুদিনের লালিত একটি ইচ্ছা আছে।

বলুন কি সেই ইচ্ছা?

আপনি দয়া করে বসরায় আপনার প্রতিনিধি মুহাম্মাদ বিন সুলাইমানকে নির্দেশ দেবেন যে, যখন তিনি আমার আগমনের সংবাদ পাবেন, তখন যেন তিনি তার মন্ত্রীবর্গদের নিয়ে আমাকে রাজকীয়ভাবে বরণ করে নেন। পাশাপাশি তিনি যেন লোকদের মাঝে

এই ঘোষণা দিয়ে দেন– তিন দিনের মধ্যে এলাকার সমস্ত লোক যেন আমার সাথে এসে সালাম বিনিময় করে।

খলিফা আমার এ ইচ্ছার কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। আমি বসরার আমিরকে এরূপ করার নির্দেশ পাঠাচ্ছি।

রাজকীয় প্রত্যাবর্তন

আবদুল মালিক আসমায়ি বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে খলিফার নির্দেশ মোতাবেক বসরার আমির মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আল হাশেমি তার মন্ত্রীবর্গ সাথে নিয়ে আসমায়িকে সাদরে বরণ করার জন্য শহরের অদূরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তারা দেখতে পেলেন, অনেক দূরে কবি আসমায়িকে দেখা যাচ্ছে। তার সাথে রয়েছে বেশ কিছু অনুচর ও প্রহরি। তারা কবির বাহনের পিছু পিছু আসছে। বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তারা বসরার দিকে আসছে। রাস্তার দু ধারে লোকজন দাঁড়িয়ে এই বর্ণাঢ্য কাফেলার রাজকীয় আগমণ প্রত্যক্ষ করছে।

কাছে আসার পর বসরার আমির সুলাইমান আল হাশেমি এগিয়ে এসে তাকে সালাম দিয়ে সম্মান জানালেন। অতঃপর কবি তার প্রসাদে গেলেন। প্রথম দিন বড় বড় ব্যবসায়ী ও নামিদামি ব্যক্তিবর্গ তার সাথে সালাম বিনিময় করতে এলো। দ্বিতীয় দিন এলো পরবর্তী স্তরের লোকজন। তৃতীয় দিন এলো সাধারণ জনগণ।

আসামায়ি বলেন, যারাই আমার সাক্ষাতে আসছিল তারা সবাই আমাকে স্বাগতম! হে খলিফার বন্ধু। স্বাগতম হে সুসাহিত্যিক বলে অভ্যার্থনা জানাচ্ছিল।

দেখা হল তার সাথে

কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে আসা লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল। তার গায়ের পোশাক ছিল পঙ্কিলময়। পায়ের জুতা ছেঁড়া। বাহ্যিক অবস্থা তার কঠিন দারিদ্রতার প্রমাণ বহন করছিল। সে এসে আমাকে সালাম দিয়ে বলল, হে আবদুল মালিক!

তার মুখে হে আবদুল মালিক– নামটি শুনে চট করে আমার খলিফার কথা মনে পড়ে গেল। কারণ, খলিফা কখনও আমাকে কবি, সাহিত্যিক ইত্যাদি বিশেষণে সম্বোধন করেননি। তিনি আমাকে আবদুল মালিক বলেই ডাকতেন।

লোকটি আমাকে বলল, হে আবদুল মালিক, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো?

আমি তার দিকে ভালো করে তাকালাম। দেখলাম এ তো সেই মুদি দোকানদার লোকটি। বললাম, হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি। আপনি সেই মুদি দোকানদার? ঠিক বলিনি?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই চিনতে পেরেছেন।

আপনার কি মনে পড়ে আপনি ঠাট্টাচ্ছলে আমাকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন? বলেছিলেন আমার কিতাবগুলো পানিতে ফেলে দিতে। তারপর দেখতে তা থেকে কী রং বের হয়। আপনার কি মনে আছে কথাগুলো?

হ্যাঁ, আমার সব মনে আছে।

আমি কিন্তু আপনার উপদেশ মেনেছি। আমার কিতাবগুলো ভালোভাবে পড়েছি। সেগুলো পুরোপুরি আত্মস্থ করেছি। তারপর সেগুলোকে অন্তরে ফেলে আমার আবেগ ও আগ্রহের পানিতে ভিজিয়েছি। অতঃপর তা থেকে কী রং বের হয়েছে তা তো আপনি নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। যদিও আসল রং এখনো বাকিই রয়ে গেছে। যা ইনশাআল্লাহ আমি আখেরাতে দেখতে পাবো। এতো কেবল দুনিয়ায় প্রকাশিত আখেরাতের মূল প্রতিদানের সামান্য ঝলক মাত্র। কারণ, ইলম হল পরকালিন জীবনের পূর্বে ইহকালিন সম্মানের বাহক।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ যেমনটি বলেছেন–

﴿يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন, আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। [সূরা মুজাদালাহ : ১১]

কতিপয় মুফাচ্ছিরের মতে, আয়াতে বর্ণিত 'মর্যাদা' বলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মর্যাদার কথা বোঝানো হয়েছে। আর তা এভাবে যে, যারা ইলম অর্জন করবেন আল্লাহ ﷻ তাদেরকে আখেরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেও মর্যাদা দান করবেন। দুনিয়ার বুকে তারা আকাশের তারকারাজির মতো হবেন।

কবি আসমায়িকেও আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন তার জ্ঞানের কারণে। তিনি ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যে পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন কোরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রেও। তাই কাব্য ও সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি মানুষের বিভিন্ন সমস্যার শরয়ি সমাধানও দিতে পারতেন। এদিক থেকে তিনি অপরাপর কবি সাহিত্যিকদের থেকে অনন্য ছিলেন।

তাকে ও তার কিতাবগুলো নিয়ে তিরস্কারকারী সেই মুদি দোকানদার আজ প্রচন্ড অসহায় অবস্থায় কবি আসমায়ির সামনে দাঁড়ানো। দোকানদার আজও তার কাছে একটি আবেদন রাখল। তবে সেটি তার পূর্বের কথা 'তোমার কিতাবগুলোর বিনিময়ে আমি তোমাকে কিছু মুদি মাল দেবো' এর পরিবর্তে বলল, আমাকে আপনি একটি চাকরি দিন।

অতঃপর কবি তাকে তার একটি বাগানে পাহারাদার হিসেবে চাকরি দিল।

একটি ম্যাসেজ

অতএব, আমি আমার ছাত্র-ছাত্রী ও ভাই-বোনদেরকে একটি ম্যাসেজ দিতে চাই যে–

لَا تَحْسَبَنَّ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُه * لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْد حَتّى تَلْعَقَ الصَّبْرَا

সম্মান প্রাপ্তিকে তুমি তুচ্ছ খেজুর জ্ঞান করো না যে, খুব সহজেই তা খেয়ে নেবে।

মনে রেখো, সম্মান পেতে হলে তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

কারণ, পৃথিবীতে আজ যারা সফল, যারাই যেক্ষেত্রে শ্রেষ্টত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছে, তারা সবাই নিজ প্রতিভার সর্বোচ্চটুকু ব্যয় করেই তা অর্জন করেছে।

কবি আসমায়ির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনিও তার প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি খুব ভোরে বিছানা ছাড়তেন। রাতে বিলম্বে বিছানায় যেতেন। দিনের অধিকাংশ সময় পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত থাকতেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি সফলতার শীর্ষচূড়া স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। আজও আমরা সম্মানের সাথে তার নাম স্মরণ করি। তাই সফলতা অর্জনে আগ্রহী প্রত্যেককেই তার মত ত্যাগী ও অনুসন্ধানী হতে হবে। হতে হবে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহি। করতে হবে সময়ের পূর্ণাঙ্গা সঠিক ব্যবহার। গ্রহণ করতে হবে সফল ব্যক্তিদের সাহচর্য। আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা। তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার কল্যাণ দান করুন।

ভয় ও আশার দোলাচলে

হাওয়াজিন একটি গোত্রের নাম। মক্কা বিজয়ের পর এই গোত্রটি মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখা গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত করে। চার হাজার সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি সেনানায়ক মালিক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সঙ্গো রণাঙ্গানে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সবার পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে। প্রত্যেকে নিজেদের সহায়-সম্পত্তিও সঙ্গো রাখবে। উদ্দেশ্য হল, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে।

পরিবার-পরিজনসহ তাদের মোট সংখ্যা ছিল ২৪ থেকে ২৮ হাজার। অন্যদিকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২ থেকে ১৪ হাজার।

মুসলিম সৈন্যদের মাঝে স্বয়ং রাসুল ﷺ উপস্থিত। তুমুল যুদ্ধে চলছে। রণাঙ্গণ জুড়ে কেবল যোদ্ধাদের হুঙ্কার ধ্বনি, তরবারীর ঝনঝনানী আর অশ্বের হ্রেসাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে রাসুল ﷺ-র দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও আল্লাহর গায়েবি সাহায্যে মুসলমানরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করল।

হাওয়াজিন গোত্রের অনেক লোক বন্দি হল। যাদের মধ্যে অনেক মহিলা ও শিশু ছিল। রাসুল ﷺ তখনও তাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। তবে তাদেরকে হত্যা না করার বিষয়টি চূড়ান্তই ছিল। কিন্তু তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে নাকি বন্দি হিসেবে রাখা হবে, নাকি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে– এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছিল।

এরই মধ্যে হঠাৎ এক বন্দিনী মহিলার শিশু তার থেকে আলাদা হয়ে গেল। রাসুল ﷺ দেখলেন যে, বন্দিনী মহিলাটি পাগলের মতো তার শিশুটিকে খুঁজছে। তার প্রাণের মানিককে খুঁজে না পেয়ে বন্দিখানায় যে শিশুকেই দেখছে, তাকেই গলা জড়িয়ে ধরছে।

অবশেষে সে তার সন্তানকে খুঁজে পেল। বাঁধহারা খুশির ঝিলিক তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সে লাফিয়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করতে লাগল।

বন্দিনী মহিলার এ অবস্থা দেখে রাসুল ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, আচ্ছা বলতো এই মহিলাটি কী তার এই শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?

সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কখনোই না!

তিনি বললেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّ اللهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ الأُمِّ بِوَلَدِهَا.

আল্লাহর শপথ! এই মা তার শিশুর ওপর যতটা স্নেহশীল, আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর এর চেয়ে বহুগুণে স্নেহশীল ও দয়ালু।

[বোখারী : ৫৯৯৯]

রাসুল ﷺ প্রায়ই সাহাবিদের সামনে এরূপ উদাহরণ পেশ করার সুযোগ খুঁজতেন, যা তাদেরকে আল্লাহ ﷻ-র দয়ার ব্যাপকতা বোঝাবে। দান সদকার প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করবে। কল্যাণের কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ জোগাবে। অকল্যাণ থেকে তাদের সতর্ক করবে।

'নিশ্চয়ই মানুষেরা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াশীল, আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দার প্রতি তার চেয়েও অধিক দয়ালু'। তাইতো সালাফদের কেউ কেউ বলতেন, আল্লাহর কসম কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহ ﷻ আমাকে এই ইচ্ছাধিকার দেন যে, তিনি আমার হিসাব নেয়ার পরিবর্তে আমার মা আমার হিসাব গ্রহণ করবেন। তাহলে আমি অবশ্যই বলবো, হে আল্লাহ! আপনিই আমার হিসাব গ্রহণ করুন। কেননা, আমার প্রতি আমার মায়ের চেয়ে আপনার দয়া ও অনুগ্রহই বেশি।

তওবার দরজা খোলা আছে

বিশিষ্ট সাহাবী আনাস رضي الله عنه বলেন, একবার আমরা রাসুল ﷺ-র সামনে বসা। এ সময় আমাদের মাঝে এক বৃদ্ধ লোক এসে উপস্থিত হল। বার্ধক্যের কারণে তার হাড়গুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। দু চোখে পর্দা পড়ে গিয়েছিল। পিঠ কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। চুলগুলো সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনটি জিনিসের ওপর ভর করে সেই বৃদ্ধটি আমাদের কাছে এসেছিল। দু'পা এবং একটি লাঠি। সে রাসুল ﷺ-র কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, আল্লাহ ﷻ যার কোনো প্রয়োজনই অপূর্ণ রাখেননি। তথাপি সে সব ধরনের পাপ করেছে। তার পাপগুলো যদি গোটা পৃথিবীর মানুষদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে তা সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওই ব্যক্তির জন্য কি তাওবার দুয়ার খোলা আছে?

রাসুল ﷺ বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?

সে বলল, হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ ﷻ তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

লোকটি বলল, তার মানে তিনি আমার সকল পাপ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলতে বলতে লাঠিতে ভর দিয়ে লোকটি চলে গেল। আনাস رضي الله عنه বলেন, লোকটি বহুদূর চলে যাওয়ার পরও আমরা তার তাকবির ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। [বোখারী : ৪৭৭৬]

কঠোরতা নয় কোমলতা

রাসুল ﷺ সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে আশার সঞ্চার করতেন। আল্লাহর রহমতের কথা শুনিয়ে মানুষকে উৎসাহিত করতেন। ভয় দেখিয়ে কাউকে দীনের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতেন না। তিনি বলতেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ لَا مُعَسِّرِيْنَ

আমি কোমলতা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছি, কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য নয়। [বোখারী : ২২০]

মুয়ায বিন জাবাল ও আবু মুসা আশয়ারি رضي الله عنهما-কে যখন তিনি ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠালেন, তখন তিনি তাদেরকে উপদেশ স্বরূপ বললেন–

وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا

তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দেবে, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবে না। [বোখারী : ৩০৩৮]

অর্থাৎ, তোমরা মানুষদেরকে আশার বাণী শোনাবে। বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসার কথা বলবে। তাদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করবে, কঠিনতা নয়। তোমরা নিজেরা আনুগত্যশীল হবে। পরস্পর মতবিরোধ করবে না।

একবার রাসুল ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

> হে জনতা, তোমাদের মধ্যে কিছু ইমাম এমন আছে যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর এবাদতের প্রতি বিরক্ত ও তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সাবধান! তোমাদের মধ্যে যে ইমামতি করবে, সে যেন সালাতকে সংক্ষিপ্ত করে। কেননা তার পেছনে বৃদ্ধও থাকতে পারে, বালকও থাকতে পারে এবং কর্মস্থলে যাওয়ার তাড়া আছে এমন লোকও থাকতে পারে। [বোখারী : ৬১১০]

সালাত সংক্ষিপ্ত করার অর্থ এই নয় যে, তাড়াহুড়ো করে ত্রুটিপূর্ণভাবে সালাত আদায় করবে। বরং এর অর্থ হল মুসল্লীদের সময় ও অবস্থার বিবেচনায় ইমাম কেরাত গ্রহণ করবে। সুতরাং, যে ইমাম সালাতকে প্রলম্বিত করছে, সে সুদীর্ঘ সময় ধরে ইবাদত করা সত্ত্বেও মানুষকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

অতএব, যে মালিক শ্রমিকের যথাযথ অধিকার দিচ্ছে না, সে কি মানুষকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে না?

যে ব্যক্তি অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ-কারবারে তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করছে, সে কি তাদেরকে দীনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করছে না?

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশির সাথে ভালো আচরণ করে না, চাই সে প্রতিবেশী মুসলিম হোক বা অমুসলিম– সে কি তাদেরকে দীন থেকে দূরে বিতাড়িত করছে না?

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অসদাচরণ করছে, সে কি তাকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে না?

বস্তুত, সে যেন প্রকারান্তে এটাই বোঝাচ্ছে যে, পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে ইসলাম রূঢ়তাকে প্রশ্রয় দেয়(!)। আসলে এই শ্রেণির লোকেরা তাদের এ সকল আচরণের মাধ্যমে ইসলামকে কলঙ্কিত করছে। তাদের এহেন কর্মকান্ডের ফলে ইসলাম বিরোধী শক্তি আরো প্রবল হচ্ছে।

আসলে, মানুষ যত বেশি দীনের প্রতি আনুগত্যশীল হয়, তত বেশি সে আল্লাহর রহমতের কাছাকাছি চলে আসে। হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ

ﷻ-র দয়া অনেক ব্যাপৃত। তাই বলে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর ভরসা করে পাপে লিপ্ত হওয়া কারো জন্যেই সমীচীন নয়। কারণ, মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ ﷻ শান্তির মতো শাস্তি প্রদানেও পরাক্রম।

জমিন তাকে গ্রাস করে নিল

মুসা عليه السلام এর সময়ের কথা। বনি ইসরাইলের এক লোক সবসময় মুসা আ. কে কষ্ট দিত। মুসা আ. আল্লাহ ﷻ-র কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। হে আমার রব, এই লোকটি আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। সে আমার দাওয়াতকে অস্বীকার করে। সর্বত্র আমার বিরুদ্ধাচরণ করে। আমাকে লাঞ্ছিত করে। দয়া করে আপনি আমার পক্ষ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

আল্লাহ ﷻ মুসা عليه السلام-র আরজি শুনে বললেন, হে মুসা! এর শাস্তির ভার আমি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম। তুমি যদি আকাশকে নির্দেশ দাও তাহলে আকাশ পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাকে ধ্বংস করে দেবে। তুমি যদি জামিনকে নির্দেশ দাও, তাহলে জমিন তাকে গ্রাস করে নেবে।

কিছুদিন পরের কথা। সেই লোকটির সাথে মুসা عليه السلام-র রাস্তায় দেখা হল। সে আগের মতোই মুসা عليه السلام কে নানা কটুকথায় জর্জরিত করল। মুসা عليه السلام রেগে গেলেন। তিনি জমিনকে বললেন, হে জমিন একে গ্রাস করে নাও। তৎক্ষণাৎ জমিন ফেটে গেল এবং তাকে হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করে নিল।

সে কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল, হে মুসা, আমি তাওবা করলাম। আমাকে সাহায্য করো। আমাকে সাহায্য করো।

মুসা عليه السلام পুনরায় জমিনকে নির্দেশ দিলেন, হে জমিন, তাকে গ্রাস করে নাও। এবার জমিন তাকে কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিল।

সে অবিরাম কাকুতি মিনতি করে যাচ্ছিল। হে মুসা, আমি তাওবা করলাম। আমাকে সাহায্য করো।

এভাবে বুক পর্যন্ত ও একসময় জমিন তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলল। আল্লাহ মুসা عليه السلام-এর প্রতি ওহি পাঠালেন—

يَا مُوْسَى مَا أَقْسَى قَلْبُكَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَوْ اِسْتَغَاثَ بِيْ لَاَغَثْتُه

হে মুসা! কত কঠিন হৃদয়ের তুমি। শপথ আমার ইজ্জত ও সম্মানের, যদি সে একটিবারের জন্য আমার কাছে এভাবে সাহায্য প্রার্থনা করত, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে সাহায্য করতাম।

তাই একথা সত্য যে, আল্লাহ অসীম দয়ালু। কিন্তু একইসাথে তিনি কঠিন শাস্তিদাতাও বটে।

মহাপ্লাবনের ঘটনা

রাসুল ﷺ সাহাবাদের কাছে নূহ عليه السلام-র সম্প্রদায়ের তুফানে ডুবে যাওয়ার সময়কার এক মহিলার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি আল্লাহ তাআলার কঠোরতার প্রমাণ বহন করে।

পবিত্র কোরআনে নূহ عليه السلام-র সেই মহাপ্লাবনের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

﴿فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿۱۰﴾ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿۱۱﴾ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿۱۲﴾ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿۱۳﴾ تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾

অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল: আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও প্রেরেক নির্মিত জলযানে। যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। [সূরা কামার : ১০-১৪]

পবিত্র কোরআনের অন্য জায়গায় আল্লাহ ﷻ এ সম্পর্কে আরো বলেন–

﴿اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾

> যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদের চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। [সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ১১]

তোমরা জানো, যখন মহাপ্লাবন দেখা দেয় তখন প্রকৃতি কেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে। গাছপালা উপড়ে যায়। ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়। পানির প্রবল স্রোতে শিশুর হাতের খেলনার মতো রাস্তা ঘাটের যানবাহনগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চতুর্দিকে কেবল মানুষের আর্তচিৎকার শোনা যায়। সেসময় আক্রান্ত মানুষেরা বাঁচার জন্য তুচ্ছ খড়কুটোও আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। কেউবা গাছে ঝুলে, কেউবা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পানি তাদের অতল গহ্বরে তলিয়ে নিয়ে যায়। এসব ঘটনা সবই আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে মানুষদের জন্য উপদেশ হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেন,

﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾

> যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় হয় এবং কান এটকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগীরূপে স্মরণ রাখে। [সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ১২]

বাস্তবিকই সেই ঘটনাটিতে মানুষদের জন্য রয়েছে উপদেশ। রাসুল ﷺ-ও উপদেশ স্বরূপ সাহাবায়ে কেরামের কাছে নূহ عليه السلام এর সময়কার সেই ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, নূহ عليه السلام-র কাওমের এক মহিলা বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পর তুফান শুরু হয়ে গেল। আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সবকিছু তলিয়ে নিয়ে গেল। বৃষ্টি পানি একাধারে জমিন, উপত্যকা এমনকি পাহাড়ের চূড়াও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মাটির নিচ থেকেও পানি বের হচ্ছিল।

মহিলাটি তার বাচ্চাকে নিয়ে দ্রুত দৌঁড়াচ্ছিল। পানি বাড়তে থাকায় সে তার সন্তানকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিল। কিছুটা স্বস্তি পেল। মনটা প্রবোধ দিল এই ভেবে যে, সন্তানটির জীবন আর বিপন্ন হবে না। পানি এতদূর পর্যন্ত আসবে না। কিন্তু, পাহাড়ের চূড়ায়ও যখন পানি পৌছে গেল, তখন সে তার সন্তানকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রাখল। পানি বুক পর্যন্ত উঠে গেলে সন্তানকে নিজের কাধে তুলে নিল। বাচ্চাটিকে পানি বাঁচাতে তাকে উপরের দিকে তুলে রাখল। পানি গলা

পর্যন্ত উঠে গেল। মহিলাটি সন্তানটিকে দুইহাতে মাথার উপরে তুলে ধরল। পানি আরও বেড়ে গেলে। অতঃপর সে নিজে মারা গেল এবং তার সন্তানটিও মারা গেল।

রাসুল ﷺ বলেন, আল্লাহ ﷻ যদি নূহ ﷺ-র কওমের কারও ওপর দয়া করতেন, তাহলে সেই শিশুটির মায়ের ওপর তিনি দয়া করতেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾

> তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূত কারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। [সূরা ক্বামার, আয়াত : ৪২]

আল্লাহর দয়া অপরিসীম, তাই বলে...

বন্ধুগণ, আমরা জানি, আল্লাহ ﷻ আমাদের বাবা মায়ের চেয়েও আমাদের প্রতি বেশি দয়ালু। কিন্তু, তাই বলে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। মনে করো, কেউ একজন সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকল আর বলল, আল্লাহ তো অসীম দয়ালু। আমার মা বাবার চেয়েও অধিক মেহেরবান। তিনি ঠিক মাফ করে দেবেন।

কেউ সুদ খেল, চুরি করল, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করল আর মনে মনে বলল, আল্লাহ ﷻ-র দয়া অপরিসীম। তিনি বাবা মায়ের চেয়েও বেশি অনুগ্রহশীল। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এমনটি ভাবা যাবে না। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কথা ভেবে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না। বরং একজন মুমিন ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা সব সময় ভয় এবং আশার মাঝামাঝি দোদুল্যমান থাকতে হবে। তাকে তার গুনাহের ব্যাপারে সর্বদা শঙ্কিত থাকতে হবে। মনে মনে এই ভয় রাখতে হবে যে, যদি আল্লাহ আমাকে গুনাহের জন্য পাকড়াও করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবের জন্য তার সামনে দাঁড় করান, তাহলে আমার রক্ষা নেই। পাশাপাশি তাঁর অসীম দয়ার কারণে ক্ষমা পাওয়ার আশাও পোষণ করতে হবে। তাই তো রাসুল ﷺ কবিরা গুনাহের আগে ছগিরা গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক করতেন।

এক যুদ্ধের ঘটনা। রাসুল ﷺ স্বয়ং সেই যুদ্ধে উপস্থিত। তাঁর খেদমতে নিয়োজিত ছিল এক গোলাম। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করল। মুসলিম বাহিনীর সাথে গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত অনেক মালামাল ছিল। যুদ্ধ শেষে মুসলমানগণ যখন ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক সেসময় গোলামটি রাসুল ﷺ-র উষ্ট্রীর কাছে এগিয়ে এল। সে রাসুল ﷺ-র মালামাল উটের ওপর রেখে রশি দিয়ে তা বাঁধছিল। হঠাৎ লুকিয়ে থাকা শত্রুপক্ষেপর একটি তীর এসে তার বুকে বিঁধল। বালকটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করল। তার মৃত্যু দেখে সবাই আল্লাহু আকবার বলে তাকবির ধ্বনি দিল। সবাই বলবলি করতে লাগল, এই গোলামটি নিশ্চিত জান্নাতী। কারণ সে আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছে। তাছাড়া বালকটি পরিবার-পরিজন ছেড়ে রাসুল ﷺ-র খেদমতে যুদ্ধে ক্ষেত্রে এসে শাহাদাত বরণ করেছে। সে তো অবশ্যই জান্নাতী।

সাহাবায়ে কেরামকে এসব বলতে শুনে রাসুল ﷺ বললেন—

> কখনই নয়; বরং গনিমতের মালামাল বন্টনের পূর্বে সে যে চাদরটি চুরি করেছে সে কারণে তার কবরে আগুন জ্বলবে। [মুসতাদরাকে হাকিম : ৩৩১০]

আল্লাহ ﷻ বলেন—

﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

> আর যে লোক কোনো কিছু গোপন করবে সে কেয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬১]

আসল ঘটনা হল টি গনিমতের মাল থেকে একটি চাদর সরিয়ে ছিল। তাই রাসুল ﷺ তার ব্যাপারে একথা বললেন।

একথা শুনে এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-র কাছে এলো। তার সাথে কিছু মাল ছিল। সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এগুলো গ্রহণ করুন। আমি এগুলো গনিমতের মাল থেকে নিয়েছিলাম।

অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন কেউ যদি জুতার ফিতার পরিমাণ কোনো বস্তুও আত্মসাৎ করে, আল্লাহ তার থেকে এর হিসাবও গ্রহণ করবে। [বোখারী]

তাই আল্লাহ ﷻ-র অসীম দয়ার ওপর ভরসা করে পাপে লিপ্ত হওয়া যাবে না। আবার তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ থেকে একেবারে নিরাশও হওয়া যাবে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর যুলুম করছে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩]

হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ ﷻ-র দয়া ও ক্ষমার আশা করব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন এ কথা ভেবে পাপে জড়াব না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ অসীম দয়ালু ও অধিক ক্ষমাশীল একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তিনি অত্যধিক কঠিন শাস্তিদাতা। অতএব, আমাদেরকে এ দুটোর মাঝে সমন্বয় করে চলতে হবে। এ ব্যাপারে অন্যদেরও সতর্ক করতে হবে।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে আপন রহমতের ছায়ায় ঢেকে নিন। আমাদের সকল পাপ মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে হেদায়াতের ওপর অটল অবিচল রাখুন।

জাহাজের আরোহীদের গল্প

কারা এই জাহাজের আরোহী? তারা কি ওই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেছিলেন–

একটি দল জাহাজে ভ্রমণ করবে। তাদের কেউ জাহাজের ওপরের তলায় স্থান পাবে, কেউ নিচের তলায়?
নাহ, এখানে তারা উদ্দেশ্য নয়।

তাহলে কি এরা ইউনুস عليه السلام এর জাতি? যারা ইউনুস عليه السلام-কে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। অতঃপর মাছ এসে তাকে গিলে ফেলেছিল? আমরা কি সেই নৌযানের কথা বলছি?

নাহ, তাও নয়।

আসলে আমাদের এই গল্প অন্য এক জাহাজের আরোহীদের নিয়ে। সেটি ছিল মুসলমানদের প্রথম সমুদ্র সফর।

আচ্ছা, শুরু থেকেই বলি–

ইসলামের তখন সূচনালগ্ন। রাসুল ﷺ সবে দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন। বেশ কয়েকজন তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু কাফের শ্রেণি তাদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তারা মক্কায় রাসুল ও তাঁর সাথীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। বেলাল رضي الله عنه ও আম্মার رضي الله عنه-র ওপর কঠিন অত্যাচার চালালো। এ অত্যাচারের সিংহভাগ শিকার ছিল মুসলিম গোলামগণ। তাদের কাউকে রক্তাক্ত করা হতো চাবুকের নির্মম আঘাতে। কাউকে কষ্ট দেওয়া হতো আগুনে পুড়িয়ে। কাউকে রাখা হতো খেজুরের ডালে ঝুলিয়ে। এছাড়াও আরো নানাভাবে তাদেরকে নিপীড়ন করা হতো।

ফলে রাসুল ﷺ মক্কা ও তার আশপাশে এমন একটি স্থান খুঁজছিলেন যেখানে সাহাবিগণ যেখানে হিজরত করে যেতে পারেন। মুক্তি পেতে পারেন কাফেরদের এই নির্মম অত্যাচার থেকে। একদিন রাসুল ﷺ সাহাবিদেরকে বললেন, আবিসিনিয়ায় একজন রাজা আছেন। যার কাছে কেউ অত্যাচারিত হয় না। তোমরা সেখানে চলে যাও।

সাহাবিগণ রাসুল ﷺ-র নির্দেশ পেয়ে হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন। পুরুষ মহিলা মিলে প্রায় আশি জন হল। তারা এমন এক দেশে হিজরতের জন্য প্রস্তুত হলেন যা ছিল তাদের মাতৃভূমি থেকে বহু দূরের অপরিচিত একটি দেশ। এর আগে তারা কেউ সে দেশে যাননি। জানেন না তাদের ভাষাও। তথাপি তারা সেখানে হিজরত করলেন।

আবিসিনিয়ার সেসময়কার বাদশাহর নাম ছিল নাজ্জাশী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ। ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। জাফর বিন আবু তালেব رضي الله عنه সাহাবাদেরকে সাথে নিয়ে তাকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। তাকে আহবান জানিয়েছিলেন ইসলাম গ্রহণের। নাজ্জাশী তাদের নিকট ঈসা عليه السلام সম্পর্কে মুসলমানদের কী বিশ্বাস– তা জানতে চাইলেন। সাহাবাদের একজন সূরা মারইয়াম তেলাওয়াত করে ঈসা عليه السلام সম্পর্কে মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসের কথা তুলে ধরলেন। এ শুনে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। অতঃপর বাদশাহ মুসলিম মুহাজিদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার দেশে মুক্ত ও স্বাধীন। যাক আলোচনা চলছিল জাহাজের আরোহীদের নিয়ে। আবিসিনায় হিজরতকারী সাহাবিরা হলেন সেই জাহাজের যাত্রী। তারা জাহাজে করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। দেখতে দেখতে সাত-আট বছর কেটে গেল। এরই মধ্যে রাসুল ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। তিনি আবিসিনায় হিজরতকারীদের মদিনায় আসতে বলেননি। সময় বয়ে চলল। নবীজির মদিনায় হিজরতের এটি সপ্তম বছর চলছে। আর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদেরও পনেরো বছর পূর্ণ হল। হিজরতে সময় যারা যুবক ছিল এখন তারা বৃদ্ধ। শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্ক। কিশোরেরা যুবক। শুরু হয়েছে এক নতুন প্রজন্মের।

হাযা সানা ইয়া উম্মা খালেদ!

মুসলমানদের যে সকল সন্তান আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মাঝে একজনের নাম উম্মে খালিদ বিনতে আস। ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়ে। সে তার মা বাবার সাথে মদিনায় চলে এলো। একদিনের কথা। রাসূল ﷺ কে কেউ একজন একটি কাপড় হাদিয়া দিল। কাপড়টিতে বিভিন্ন নকশা আঁকা ছিল। রাসুল ﷺ উম্মে খালিদকে ডেকে পাঠালেন। সে আসার পর রাসূল ﷺ নিজ হাতে তার গায়ে কাপড়টি পরিয়ে দিয়ে বললেন–

هذَا سَنَا يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا

হাবশি ভাষায় এর অর্থ হল– এটা অনেক সুন্দর হে উম্মে খালিদ। ছোট্ট শিশুটির জন্ম আবিসিনিয়ায়। মাতৃভাষা আরবির চেয়ে হাবশি ভাষায় সে অধিক পারদর্শী। তাই রাসুল ﷺ তার সাথে হাবশি ভাষায় কথা বললেন।

আমরা তোমাদের থেকে এগিয়ে গেছি

রাসুল ﷺ খায়বার বিজয় করলেন। আল্লাহ ﷻ মুসলমানদেরকে গনিমতের অনেক সম্পদ দান করলেন। রাসুল ﷺ আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের মদিনায় চলে আসার নির্দেশ দিলেন। তারা মদিনায় চলে এলেন। তাদের আগমনে রাসুল ﷺ অনেক খুশি হলেন। বেশি খুশি হলেন জাফর বিন আবু তালিব رضي الله عنه-কে পেয়ে। তিনি জাফর বিন আবু তালিব رضي الله عنه-কে জড়িয়ে ধরে তার দু চোখের মাঝে ও কপালে চুমু দিলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার গঠন এবং চরিত্র দুটিই পেয়েছো।'

জাফর رضي الله عنه-র শাহাদাতের পর তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস কে আবু বকর رضي الله عنه বিবাহ করেন। একদিনের ঘটনা। আসমা বিনতে উমাইস رضي الله عنها রাসুল ﷺ-র স্ত্রী হাফসা رضي الله عنها-র সাথে দেখা করতে এলেন। হাফসা رضي الله عنها ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه-র কন্যা ছিলেন। ওমর رضي الله عنه-ও সেদিন মেয়েকে দেখতে তার ঘরে গেলেন। মেয়ের সাথে

অচেনা এক নারীকে দেখতে পেয়ে তিনি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা! ইনি কে?

হাফসা رضي الله عنها বললেন, ইনি আসমা বিনতে উমাইস।

ওমর رضي الله عنه বললেন, ইনি কি বাহরিয়্যাহ (সমুদ্র ভ্রমণকারীনী)?

আসমা رضي الله عنها বললেন, হ্যাঁ।

ওমর رضي الله عنه পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি হাবশিয়্যাহ?

হাফসা رضي الله عنها উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ইনি হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরতকারিনী।

ওমর رضي الله عنه আসমা رضي الله عنها-কে লক্ষ্য করে নরম গলায় বললেন, রাসুল ﷺ-র সাথে হিজরত করে আমরা তোমাদের থেকে এগিয়ে গেছি।

ওমর رضي الله عنه-র মুখে একথা শুনে আসমা رضي الله عنها রেগে গেলেন। বললেন, তোমরা কিভাবে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলে? তোমরা তো রাসুল ﷺ-র কাছে ছিলে। তিনি তোমাদের অসুস্থদের দেখাশোনা করেছেন। তোমাদের ক্ষুধার্তদের আহার দিয়েছেন। তোমাদের দুর্বলদের সাহায্য করেছেন। আর আমরা তো সেসময় দূরের এক অপরিচিত দেশে অবস্থান করছিলাম। আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ-র কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।

আসমা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-র দরবারে এসে ওমর رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওমর বলছে, তারা নাকি হিজরতের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে অগ্রগামী। তাহলে কী আমরা কোনো বিশেষ সাওয়াবের অধিকারী হবো না?

রাসূল ﷺ বললেন, হে আসমা, তুমি যাও। আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে যারা তোমাদের সাথে জাহাজের যাত্রী ছিল তাদেরকে সংবাদ পৌঁছাও, সাধারণ মুসলমানদের জন্য সাওয়াব একগুণ আর তোমাদের জন্য দিগুণ। কারণ, তোমরা প্রথম হিজরত করেছ আবিসিনিয়ায় আর দ্বিতীয় হিজরত করেছ মদিনায়।

আসমা ﷺ বেরিয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম আমি দেখতে পেলাম আমাদের সাথে যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তারা এ হাদিস শোনার জন্য আমার কাছে দলে দলে এসে জড়ো হচ্ছে।

আসলেই যারা জাহাজে চড়ে সমুদ্র পথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল, তাদেরকে কঠিন বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছিল। সমুদ্রের বিশালাকার ঢেউ জাহাজ নিয়ে খেলা করছিল। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ একবার জাহাজকে শূন্যে তুলে পরক্ষণেই নিচে আছড়ে ফেলছিল। সেই সফরে তারা মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অবলা নারী ও অবুঝ শিশুদের মৃত্যু-ভয় গ্রাস করে নিয়েছিল। তথাপি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এর প্রতিদান আল্লাহ ﷻ-র কাছেই সংরক্ষিত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

আসমা বিনতে উমাইস ﷺ আনহু তাঁর স্বামীর সঙ্গী হিসেবে আবিসিনিয়া হিজরত করছেন– এমনটি ভাবেননি; বরং তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই হিজরত করেছিলেন। তাই তিনি বলেননি যে, আবিসিনিয়ায় হিজরতাকরী স্বামীর সাওয়াবে আমার অংশ রয়েছে। একথাও বলেননি যে, আমি আমার স্বামীকে দেখাশোনার জন্য তার সাথে হিজরত করব। আসলে তিনি দীনের জন্যেই হিজরত করেছিলেন, স্বামীর জন্যে নয়।

মুতার যুদ্ধ

আসমা বিনতে উমাইস স্বামীর সাথে মদিনায় এসেছেন মাত্র আট নয় মাস হল। এরই মধ্যে রাসুল ﷺ রোমের বাদশাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একজন দূত পাঠালেন। রোমের বাদশাহ সেই দূতকে হত্যা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল। এ সংবাদ জানতে পেরে রাসুল ﷺ-র নির্দেশে মুসলমানরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। মুতার প্রান্তরে ভয়ানক লড়াই হল। তারপর কি

হল এ সম্পর্কে একটি হৃদয়স্পর্শী হাদিস রয়েছে। যাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ ও বরকত।

মুতার যুদ্ধের সময় রাসুল ﷺ তিন হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করলেন। অতঃপর তাদের সামনে ঘোষণা দিলেন– তোমাদের সেনাপতি হল, যায়েদ। সে যদি শহিদ হয়ে গেলে জাফর। সেও যদি শহিদ হয় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা।

মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হয়ে মুতা নামক স্থানে পৌঁছল। সেখানে রোমীয়রা দু লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছিল। তাই শত্রু-সংখ্যা মুসলিম বাহিনীর চেয়ে একগুণ, দিগুণ কিংবা তিনগুণ ছিল না; বরং বহুগুণ বেশি ছিল।

যুদ্ধা শুরু হল। তিন হাজার সৈন্য দু লক্ষের মোকাবেলা করতে লাগল। প্রথমেই যায়েদ ؓ শাহাদাতবরণ করলেন। এবার জাফর ؓ ইসলামের ঝান্ডা হাতে তুলে নিলেন। বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু বাহিনীর ওপর। তিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আবিসিনিয়া থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন। সফরের ক্লান্তি এখনও কাটেনি। সেই তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন। দুটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হলেন–

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّ * لَتَنْزِلَنَّ أَوْ لَتُكْرَهِنَّ

إِنَّ أَجْلَبَ النَّاسِ وَشَدُّوْا الرَّنَّةَ * مَالِي أَرَاكَ تُكْرَهِيْنَ الْجَنَّةَ

আল্লাহর দোহাই লাগে, হে মন, তুমি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো, নয়তো তুমি তিরস্কৃত হয়ে নামতে হবে।

লোকেরা যদি যুদ্ধে নেমে দামামা বাজাতে পারে, তাহলে তোমার কী হল, তুমি কি জান্নাতকে অপছন্দ করছো?

কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তিনি যুদ্ধের ময়দানে মনোযোগী হলেন। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি অব লোকন করলেন। দেখলেন– চারিদিকে কেবল মৃত্যুর বিভীষিকা। কানে ভেসে আসছে

কেবল তরবারীর ঝনঝনানি, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও বীরবিক্রমদের হুংকার। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে পুরো ময়দান জুড়ে। তথাপি তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বীরত্বের সাথে লড়াই করে এক সময় শহিদ হয়ে গেলেন। মুসলিম বাহিনীর পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পতাকাবিহীন মুসলিম বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ল। রাসুল ﷺ-র নিযুক্ত তিনজন সেনাপতির সবাই শাহাদাত করেছেন। এখন কে পালন করবেন সেনাপতির দায়িত্ব? কে উঁচু করে ধরবে মুসলিম পতাকা?

হঠাৎ সাবিত বিন আকরান رضي الله عنه এগিয়ে এলেন। পতাকা উঁচিয়ে ধরে বলতে লাগলেন– হে লোকসকল, তোমরা আমার দিকে আসো!

লোকেরা এসে তার কাছে জমা হল। তিনি বললেন, তোমাদের সেনাপতি নির্বাচন কর।

সবাই বলে উঠল, আপনিই আমাদের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করুন।

তিনি বললেন, না, আমি এ পদের যোগ্য নই। তোমারা অন্য কাউকে নির্বাচন কর।

লোকেরা বলল, তাহলে খালিদ বিন ওয়ালিদ পালন করবেন সেনাপতির দায়িত্ব।

খালিদ বিন ওয়অলিদ رضي الله عنه এগিয়ে এলেন। ইসলামের পতাকাটি হাতে তুলে নিলেন। পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল। রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চালতে থাকল। রাতে খালেদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি মাদিনায় যাবেন। সেখান থেকে আরো কিছু সৈন্য জোগাড় করে আনবেন। কিন্তু সামান্য ভেবে তিনি বললেন, আমরা যদি মদিনায় যাই, তাহলে শত্রুপক্ষ ভাববে, আমরা পালিয়ে গেছি। তখন তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করবে। এতে আমাদের বহু যোদ্ধা শহিদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই, এখন আমাদের আগামীকালের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তিনি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ডানপাশের সৈন্যদেরকে বামপাশে নিয়ে গেলেন। আর বাম পাশের সৈন্যদেরকে ডান পাশে

নিয়ে এলেন। সাদার স্থানে নীল আর নীলের স্থানে হলুদ এবং হলুদের স্থানে লাল রং দিয়ে ঝান্ডার রূপ বদলালেন।

সকালে রোমানদের ডান দিকের সৈন্যদল এসে দেখে নতুন বাহিনী নতুন পতাকা। বাম দিকের সৈন্যদলও দেখে একই অবস্থা। তখন তারা ধারণা করল, নিশ্চয় মুসলমাদনের জন্য সাহায্যকারী দল চলে এসেছে। তাদের মাঝে বিষয়টি দারুণ আতঙ্ক ছড়াল। তারা ভয় নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল। মুসলিমরা নব উদ্যমে যুদ্ধ করতে লাগল

খালেদ বিন ওয়ালিদ ﷺ বলেন, মুতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙে যায়। পরিশেষে আমার হাতে কেল একটি ইয়েমেনি পাতের তৈরী তরবারি একটি তরবারী ছিল। ভয়ানক যুদ্ধ শেষে দুটি দলই স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেল। মুসলিম সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ ﷺ মুসলিম বাহিনীকে মদিনায় সুসংবাদ প্রেরণের নির্দেশ দেন। বারোজন মুসলিম শাহাদাত বরণ করলেও কাফেরদের নিহত হয়েছে অসংখ্য। এই হল সংক্ষিপ্ত মুতার যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

মদিনায় খরব পৌঁছল। রাসুল ﷺ সকলকে মসজিদে সমবেত হতে বললেন। সকলে এলো। রাসুল ﷺ বললেন– আমি তোমাদের বাহিনীর সংবাদ বলব?

সাহাবিরা বলল, অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ।

রাসুল ﷺ বললেন, যায়েদ প্রথমে পতাকা হাতে যুদ্ধ শুরু শাহাদাত বরণ করে। তোমরা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। সাহাবিরা দোআ করলেন– হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন। তার প্রতি রহম করুন।

অতঃপর পতাকা তুলে নেয় জাফর বিন আবু তালিব। সে-ও শাহাদাত বরণ করে। তোমরা তার জন্যেও দোআ কর। (এ কথা বলার সময় রাসুল ﷺ-র দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে)।

সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন। তার প্রতি রহম করুন।

রাসূল ﷺ বললেন, এরপর পতাকা তুলে নেয় আবদুললাহ বিন রাওয়াহা। তাকেও শহিদ করে দেয়া হয়। তার জন্যেও তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন। তার প্রতি রহম করুন।

তারপর রাসুল ﷺ বললেন, এরপর পতাকা তুলে নেয় আল্লাহর তরবারি (খালেদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه)। তার হাতে আল্লাহ ﷻ মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন।

রাসুল ﷺ জাফর رضي الله عنه-র ঘরে গেলেন। তার বিধবা স্ত্রী ও তার এতিম শিশুদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। শিশুগুলো তাদের বাবাকে খুব ভালোবাসতো। আবিসিনিয়ায় দীর্ঘ সময় তারা তাদের বাবার সাথে কাটিয়েছিল। বাবার ছিল তাদের পৃথিবী। তাদের খেলার সাথী। বাবা তাদেরকে আদর করে খাইয়ে দিতো। তারাও বাবার মুখে খাবার তুলে দিত। বাবার খুশিতে হাসতো তারা, বাবার খুশিতে কাঁদতো। বাবার চুমুর বিনিময়ে তারাও চুমু উপহার দিতো। বাবা তাদের রাগ ভাঙাতেন। আদরে সোহাগে মান ভাঙাতেন। কাঁদলে চোখের পানি মুছে দিতেন। ত্রিশের কোটা পার না করা তাদের সেই বাবা আজ পৃথিবীতে নেই। ইসলামের জন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করে পরপারে চলে গেছেন।

রাসুল ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আসমা رضي الله عنها নিজেকে পর্দায় রেখে রাসুল ﷺ-কে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। রাসুল ﷺ ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, আমার ভাতিজাদেরকে ডাকো। আসমা رضي الله عنها বলেন, আমি তাদেরকে ডাকলাম। মুরগির বাচ্চা যেমন ডাক পেয়ে একত্রে দৌঁড়ে আসে, তারাও তেমনি দৌঁড়ে এসে রাসুল ﷺ-কে ঘিরে ধরল। তাঁকে জড়িয়ে চুমু খেলো। প্রথমে তারা ভেবেছিল তাদের পিতা জাফর এসেছে। আসমা رضي الله عنها বলেন, আমি তাদেরকে গোসল দিয়ে পরিপাটি সাজিয়ে রেখেছিলাম। আটার খামির করে রুটি বানিয়ে জাফরের আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। বাচ্চারাও তাদের বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি দেখলাম, রাসুল ﷺ তাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম– ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ, জাফরের কোনো সংবাদ এসেছে?

রাসুল ﷺ কোনো জবাব দিলেন না।

আমি আবার জানতে চাইলাম– আপনি কি জাফরের কোনো খবর পেয়েছেন?

রাসুল ﷺ বললেন, জাফর শহিদ হয়ে গেছে।

বললাম, আহা! তারা কি তাহলে ইয়াতিম হয়ে গেল?

রাসুল ﷺ বললেন, তুমি কি তাদের ব্যাপারে দারিদ্রতার ভয় করছ? শোনো, দুনিয়া ও আখিরাতে আমিই তাদের অভিভাবক। একথা বলতে গিয়ে রাসূল ﷺ কেঁদে ফেললেন।

অতঃপর ঘর থেকে বের হতে হতে বললেন, তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য তোমরা খাবারের ব্যবস্থা করো। কারণ, তাদের কাছে এমন একটি সময় এসে গেছে, যা তাদেরকে কর্মব্যস্ত হতে বাধ্য করবে।

এক মহীয়সী নারীর দাস্তান

এটি খালিদ বিন ওয়ালিদের বীরত্বগাঁথা নয়। নয় আবু বকর, ওমর ওসমান, আলীরদের বাহাদুরী উপাখ্যান। এটি হল এক মহীয়সী নারীর বীরত্বের দাস্তান। দীনের খেদমতে তিনি যে অবদান রেখেছেন, অনেক পুরুষের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। নরীদেরকেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দানে তিনি যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রসঙ্গাত, ইসলামে নারীদের অবদান পুরুষ থেকে কোনো অংশে কম নয়। যমযমের পানি যিনি প্রথম পান করেছেন, সাফা মারওয়া যিনি প্রথম সায়ি করেছেন– তিনি ছিলেন একজন নারী। তিনি ইবরাহিম عليه السلام-র স্ত্রী ও ইসমাইল عليه السلام-র জননী– হাজেরা عليها السلام। রাসুল ﷺ-র প্রতি যিনি প্রথম ঈমান এনেছেন তিনি ছিলেন একজন নারী। তিনি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ رضي الله عنها। আল্লাহ ﷻ-র পথে যিনি প্রথম রক্ত ঝরিয়েছেন তিনি ছিলেন একজন নারী। তিনি সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত رضي الله عنها।

আমরা এখন এমন এক রমণীর ব্যাপারে আলোচনা করব যিনি শিক্ষা, দাওয়াত, জিহাদ, সন্তান লালন-পালন সহ ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি অসাধারণ সফল একজন নারী। নাম তার উম্মে সুলাইম ﵂। প্রথম জীবনে তিনি জাহেলী যুগের অন্যান্য নারীদের মতোই জীবন যাপন করতেন। ইসলাম আগমনের পর আনসার প্রতিনিধি দলের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী সাহাবীদের মধ্যে তিনিও একজন। প্রথমে মালেক ইবনে নযরের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। সেই ঘরেই আনাস ﵁ জন্মগ্রহণ করেন। নিজে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বামীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে নিয়ে মদিনা ছেড়ে সিরিয়া চলে যেতে চাইল। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। স্বামী তাকে ছেড়ে সিরিয়া চলে গেল এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। তিনি একাকী মদিনায় থেকে গেলেন।

সর্বোত্তম মহর

মহিয়সী এই নারী ছিলেন রূপে-গুণে অনন্যা। তাই পুরুষদের মাঝে তাকে নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হল। আবু তালহা তখনও মুসলমান হননি। তিনি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। উম্মে সুলাইম ﵂ তাকে বললেন, তোমার প্রতি আমার আগ্রহ আছে। আর কেনই বা থাকবে না? তোমার মতো ব্যক্তির প্রস্তাব তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তবে সমস্যা হল তুমি একজন কাফের পুরুষ, আর আমি একজন মুসলিম নারী। তাই তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে সেটাই হবে আমার মহর। এছাড়া আমার আর কোনো বাড়তি দাবি-দাওয়া নেই।

তার এ প্রস্তাব শুনে আবু তালহা বললেন, আমি তো ধর্মের উপরই আছি।

উম্মে সুলাইম বললেন, আবু তালহা! তোমার কি জানা নেই যে, তুমি যে উপাস্যের উপাসনা কর তা একটি কাষ্ঠখন্ড মাত্র। যেটি মাটি থেকে

জন্ম নিয়েছে। যেটিকে অমুক গোত্রের হাবশি মিস্ত্রি নিজ হাতে বানিয়েছে।

আবু তালহা তার কথা অকপটে মেনে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই ঠিক বলেছ।

তাহলে যে উপাস্য মূলত মাটি থেকে জন্মানো একটি কাষ্ঠখন্ড, যে প্রতিমার নির্মাতা অমুক হাবশি মিস্ত্রি, তার উপসনা করতে তোমার লজ্জা হয় না? হে আবু তালহা! তুমি শুধু ইসলাম গ্রহণ কারো, আমি তোমার কাছে কোনো মহর চাই না।

বেশ, বিষয়টি আমি ভেবে দেখি– এই বলে আবু তালহা চলে গেলেন।

পরে তিনি তার কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।

উম্মে সুলাইম যারপর নাই আনন্দিত হলেন। পুত্র আনাস কে ডেকে বললেন, হে আনাস! আমাকে আবু তালহার সাথে বিয়ে দাও।

তাদের দুজনার বিয়ে হয়ে গেল। উম্মে সুলাইমের মহরের চেয়ে সম্মানজনক আর কোনো মহর হতে পারে না। তা হল ইসলাম। ভেবে দেখো, তিনি নিজেকে কিভাবে দীনের পথে সস্তা করে দিয়েছেন। ইসলামের স্বার্থে ছেড়ে দিয়েছেন নিজের প্রাপ্য অধিকার।

হ্যাঁ, একজন নারী একটি ঘটনার কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর তা হল ইসলাম। কিভাবে তিনি ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন এবং মানুষকে সেদিকে আহবান করেছেন।

পুত্রকে পেশ করলেন রাসুল ﷺ-র খেদমতে

রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমনকালে আনসার ও মুহাজিরগণ তাকে স্বাগত জানায়। এরপর তিনি আবু আইয়্যুব আনসারীর বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। দলে দলে লোকজন রাসুল ﷺ-র সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে আসতে থাকে। তখন উম্মে সুলাইমও আনসারী নারীদের সাথে বের হন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু হাদিয়া দিতে

চাইলেন। তার কাছে তার কলিজার টুকরোর চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু ছিল না। তাই তিনি পুত্র আনাসকে সাথে নিয়ে গেলেন। রাসুল ﷺ-র সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই হল আনাস। সে সর্বদা আপনার সাথে থেকে আপনার খেদমত করবে। কারণ, আপনাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামর্থ্য আমার নেই। সম্পদও নেই যে, আর্থিকভাবে সহযোগিতা করব। আমার আছে একমাত্র পুত্র আনাস। আমি তাকে আপনার খেদমতের জন্য পেশ করছি। দয়া করে গ্রহণ করুন।

আসলে উম্মে সুলাইম رضي الله عنها ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি নারী। তিনি এর মাধ্যমে আনাস رضي الله عنه-র লালন পালন ও আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার ভার রাসুল ﷺ এর হাতে তুলে দিতে চাইলেন। আনাস رضي الله عنه-র বয়স তখন মাত্র নয় বছর। যা ছিল শিক্ষা গ্রহণের যথার্থ সময়। রাসুল ﷺ তাকে খাদেম হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। তিনি সকাল-সন্ধ্যা রাসুল ﷺ-র খেদমতে নিয়োজিত থাকলেন।

আনাস رضي الله عنه বলেন আল্লাহ ﷻ আমার আম্মাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি আমাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছেন।

একদিনের ঘটনা। রাসুল ﷺ খাবার খাচ্ছিলেন। ওমর বিন সালামা বলেন, আমি তখন বালক ছিলাম। রাসুল ﷺ-র সামনে খেতে বসেছি। প্লেটের মধ্যে আমার হাত এদিক ওদিক যেতে লাগল। অর্থাৎ, আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। রাসুল ﷺ বললেন–

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

> হে বালক, আল্লাহর নাম নাও। তোমার দিক থেকে ডান হাতে খাও। [বোখারী : ৫৩৭৬]

এভাবে রাসুল ﷺ-র কাছে যারা থাকতেন তাদেরকে তিনি আদব শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া উম্মে সুলাইম رضي الله عنها-র আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল যে, আনাস رضي الله عنه-র মাধ্যমে তার ঘরে আল্লাহর রাসুল ﷺ'র সুন্নত প্রবেশ করবে। তাই দেখা যেতো আনাস رضي الله عنه যখন রাসুল ﷺ এর দরবার থেকে বাড়িতে যেতেন তখন বলতেন, আম্মু! আল্লাহর রাসুল

সা. যখন আহার করেন তখন তিনি ডান হাতে আহার করেন। আম্মু! আল্লাহর রাসুল ﷺ অমুক সালাতে অমুক অমুক সূরা তেলাওয়াত করেন। এভাবে তিনি তার মাকে নতুন নতুন সুন্নাতের সংবাদ দিতেন।

রাসুল ﷺ খেদমতে থাকাকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে।

মুজেযার প্রত্যক্ষদর্শী

খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। কাজ চলছে পরিখা খননের। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মুসলমানগণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষুধার যাতনা লাঘবে রাসুল ﷺ পেটে দুটি পাথর বেঁধেছেন। এ অবস্থা দেখে আবু তালহা رضي الله عنه উম্মে সুলাইমের কাছে ছুটে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে কি কোনো খাবার আছে? আমি দেখলাম রাসুল ﷺ-র কথার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আমার কাছে কয়েক টুকরো রুটি আর কয়েকটি খেজুর আছে।

আচ্ছা, সেগুলোই প্রস্তুত করে দাও।

উম্মে সুলাইম رضي الله عنها রুটি প্রস্তুত করলেন। তাতে খেজুরগুলো রেখে একটি কাপড়ে মুড়িয়ে নিলেন। অতঃপর পুত্র আনাসের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আনাস! এগুলো রাসুল ﷺ-র জন্য নিয়ে যাও।

আনাস رضي الله عنه নবীজির কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি বসে আছেন। খাবারের থলেটি তাঁর সামনে রেখে বললেন, আম্মু এগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

রাসুল ﷺ খাবারের থলেটি গ্রহণ করে পুনরায় তা আনাস رضي الله عنه-র হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো বাড়ি নিয়ে যাও। অতঃপর দাঁড়িয়ে সবাইকে ডাকলেন, এসো তোমরা সবাই খাবার খেতে এসো।

আবু তালহা জানেন, এখানে যে পরিমাণ খাবার আছে তা একজনেরই যথেষ্ট নয়, সেখানে এ বিশাল সংখ্যক সাহাবির খাবারের ব্যবস্থা কী করে হবে? তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দৌঁড়ে বাড়ি গিয়ে উম্মে

সুলাইম رضي الله عنها-কে বললেন, রাসুল ﷺ সকল সাহাবিদের নিয়ে আসছেন।

উম্মে সুলাইম رضي الله عنها খাঁটি মু'মিনাহ ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এ ব্যাপারে ভালো জানেন।

রাসুল ﷺ এলেন। ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রুটিগুলো ছিঁড়ে খেজুরের সাথে মেশালেন। ওদিকে উম্মে সুলাইম মাখন ভর্তি চামড়ার পাত্রটি রাসুল ﷺ-র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসুল ﷺ কিছু মাখন ঢেলে নিজের মোবারক হাতে রুটির সাথে মেখে নিলেন। অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন।' তারপর সবাইকে খেতে ডাকলেন।

সাহাবিদের দশজন ঘরে প্রবেশ করলেন। রুটি, খেজুর ও মাখন খেয়ে তারা পরিতৃপ্ত হলেন। এরপর অন্য দশজন প্রবেশ করলেন। তারাও পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বের হলেন। উম্মে সুলাইম رضي الله عنها দেখলেন মাত্র তিন চারটি রুটি, কয়েকটি খেজুর ও সামন্য একটু মাখন। অথচ এ বিশাল সংখ্যক সাহবিদের প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও অতিরিক্ত খাবার রয়ে গেল। তিনি রাসুল ﷺ-র এ মুজেযার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকলেন।

তার হুংকার একটি দলের চিৎকারের চেয়েও ভয়ংকর

ওহুদ যুদ্ধের সময় যে সকল সাহাবি রাসুল ﷺ-র খেদমতে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের একজন ছিলেন উম্মে সুলাইম رضي الله عنها-র স্বামী আবু তালহা رضي الله عنه। সেই যুদ্ধে মুসলমানদের ওপর হঠাৎ বিপদ নেমে এলো। অনেকেই শহীদ হলেন। বাকীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। মুশরিকরা সেই সুযোগে রাসুলুল্লাহ ﷺ-র উপর হামলে পড়ল। তারা তাকে হত্যার চেষ্টা করল। জানবাজ সাহাবীগণ রাসুলের জন্য দুর্ভেদ্য বেষ্টনী তৈরী করলেন। সেসময় তারা ছিলেন আহত, ক্ষুধার্ত এবং

যখমে জর্জরিত। তথাপি তারা তীর, তরবারী ও বর্শার আঘাত নিজেদের শরীর দ্বারা প্রতিহত করে রাসুল ﷺ-কে রক্ষা করছিলেন।

এসময় আবু তালহা তার বুক উঁচু করে বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কোন তীর আঘাত করতে পারবে না। আপনার বুকের সামনে আমার বুক আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সামনে থেকে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁকে রক্ষা করছিলেন। কাফেররা চতুর্দিক থেকে আক্রমন করছিল। কেউ তীর নিক্ষেপ করছিল। কেউ তরবারী বা খঞ্জর দিয়ে আঘাত করছিল। অত্যধিক আঘাতের কারণে তিনি আর টিকে থাকতে পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। আবু উবায়দা ছুটে এসে দেখলেন আবু তালহা বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। রাসুল ﷺ বললেন, তোমাদের ভাইকে নিয়ে যাও, সে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।

আবু তালহা رضي الله عنه-কে তুলে আনার পর দেখা গেল তার শরীরে দশটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হাঁ, আবু তালহা দীনের পতাকা বহন করতেন। নবী ﷺ বলতেন, বাহিনীর মাঝে আবু তালহার হুংকার একটি দলের চেয়েও ভয়ংকর। এই ছিল তার হুংকারের অবস্থা। তার শক্তি ও সাহসিকতার বিষয়টি এ থেকে অনুমেয়। সাহাবিরা বলেন, আমরা আবু তালহাকে বহন করে নিয়ে এলাম। দেখলাম তার গোটা শরীর আঘাতে জর্জরিত হয়ে আছে।

রাসুলের প্রতি ভালোবাসা

রাসুল ﷺ যেদিন উম্মুল মুমিনিন যায়নাব رضي الله عنها-কে বিবাহ করলেন, সে রাতে উম্মে সুলাইম رضي الله عنها তাঁর জন্য কিছু হাদিয়া পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তবে কী পাঠাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অতঃপর চামড়ার পাত্রে রাখা দুধের খামিরটি বের করলেন। সেটিকে পিষে গুড়ো করলেন। রুটি, খেজুর ও মাখরের সাথে সেটিকে মেশালেন। এতে অত্যন্ত সুস্বাদু একটি খাবার তৈরি হল। অতঃপর আনাস رضي الله عنه-কে ডেকে বললেন, আনাস! এ সামান্য খাবারটুকু রাসুল ﷺ-র জন্য হাদিয়াস্বরূপ নিয়ে যাও। রাসুল ﷺ-কে বলবে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এ সামান্য হাদিয়া।

আনাস ﷺ রাসুল ﷺ-র সামনে খাবার রেখে বললেন, আম্মু আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। বলেছেন আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য হাদিয়া।

রাসুল ﷺ খাবারটি মুখে দিয়ে বেশ পছন্দ করলেন। তিনি আনাস ﷺ-কে বললেন, যাও ওমুক অমুককে ডেকে নিয়ে আসো।

আনাস ﷺ তাদের ডেকে আনলেন। তারাও রাসুল ﷺ-র সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করলেন।

রাসুলের দোআ

একদিন উম্মে সুলাইম ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার একটু কথা ছিল।

রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা?

আপনার খাদেম আনাসের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন।

রাসুল ﷺ দু হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা কররেলন, হে আল্লাহ! আনাসের হায়াত বৃদ্ধি করে দিন। তার আমল সুন্দর করে দিন এবং তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন।

আহা! কত সুন্দর এ দোআ! রাসুল ﷺ আনাস ﷺ-র জন্য কেবল এ দোআ করেননি যে– তার হায়াত বাড়িয়ে দিন। আমল খারাপ হোক তাতে সমস্যা নেই। বরং তিনি দোআ করলেন হায়াত বাড়িয়ে দিন। আমলও সুন্দর করে দিন। সন্তান ও সম্পদ বাড়িয়ে দিন।

আনাস ﷺ বলেন, এরপর আমার হায়াত বৃদ্ধি পেল। আমার সন্তান ও সম্পদ বৃদ্ধি পেল। আমার কন্যা আমাকে বলেছে, সে আমার ঔরসজাত একশ বিশের অধিক সন্তান কবরস্থ করেছে।

ধৈর্য্য

আগেই জেনেছি যে, আনাস ﷺ ছিলেন উম্মে সুলাইম ﷺ-র প্রথম স্বামীর পক্ষের সন্তান। আবু তালহার সাথে বিয়ের পর তাদের ঘরে

ফুটফুটে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। তারা নাম রাখা হয় আবু উমায়ের। আবু তালহা ﷺ তাকে অনেক ভালোবাসতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও তাকে ভালোবাসতেন। সে নুগায়ের নামের ছোট্ট পাখি নিয়ে খেলা-ধুলা করত। রাসুল ﷺ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন, 'হে আবু উমায়ের, নুগায়েরের খবর কি'?

একদিন সেই শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা ﷺ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-র দরবারে আসা যাওয়া করতেন। এক বিকেলে তিনি ঘর থেকে বের হলেন। এদিকে তার শিশু পুত্রটির অসুস্থতা খুব বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে মায়ের সামনেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বাড়ির লোকজন শিশুটির মৃত্যুর শোকে কাঁদতে লাগল। উম্মে সুলাইম তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তোমরা আবু তালহার কাছে তার পুত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে কেউ কিছুই বলবে না। সে এলে যা বলার আমিই বলব।

উম্মে সুলাইম তার মৃত শিশুপুত্রটিকে গোসল করালেন। গায়ে কাফন পরালেন। সুগন্ধি মেখে দিলেন। তারপর কাপড়-চোপড় দিয়ে উত্তমরূপে ঢেকে ঘরের এক কোণে সুন্দরভাবে শুইয়ে রাখলেন।

আবু তালহা ﷺ-র সেদিন ফিরতে খানিক রাত হয়ে হল। ঘরে ঢুকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সুলাইমের অবস্থা কি? তিনি বললেন, এখন আগের চেয়ে শান্ত। আশা করি সে শান্তি পেয়েছে।

স্বামী তাকে দেখতে চাইলে উম্মে সুলাইম তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, সে শান্ত আছে। তাকে নাড়াবেন না।

অতঃপর তিনি স্বামীর সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। পানাহার শেষে স্বামীর বিশেষ আহবানের কাছে নিজেকে সপে দিলেন।

উম্মে সুলাইম যখন দেখলেন, স্বামী তৃপ্ত ও শান্ত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা বলুন তো কেউ যদি কোনো পরিবারের কাছে কিছু গচ্ছিত রাখে, তারপর সে তাদের কাছে সেই গচ্ছিত বস্তুটি ফেরত চায়, তাহলে কি তাদের অধিকার থাকবে তাকে তা না দেয়ার?

আবু তালহা ﵁ বললেন, না।

আপনি কি আমাদের প্রতিবেশীদের দেখে অবাক হচ্ছেন না? উম্মে সুলাইম প্রশ্ন করলেন।

কেন, তারা কি করেছে? আবু তালহা জানতে চাইলেন।

এক ব্যক্তি তাদের কাছে একটি বস্তু গচ্ছিত রেখেছে, আর তা তাদের কাছে এতো দীর্ঘদিন ধরে আছে যে, যেন তারাই এর মালিক। তারপর যখন প্রকৃত মালিক তাদের কাছে বস্তুটি ফেরত চায়, তখন তারা অস্থিরতা ও দুঃখ প্রকাশ করে।

এটা খুবই জঘন্য কাজ।

এবার উম্মে সুলাইম ﵂ বললেন, আপনার এই পুত্রটি আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে আমাদের কাছে গচ্ছিত ছিল। আর ইতোমধ্যেই তিনি তা নিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং আপনার পুত্র আল্লাহ ﷻ-র কাছেই আছে।

আবু তালহা ﵁ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ, আজ রাতে তুমি আমাকে ধৈর্য্যে পরাস্ত করতে পারবে না। অতঃপর তিনি পুত্রের দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

সকালে রাসুল ﷺ-র কাছে গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসুল ﷺ তাদের জন্য বরকতের দোআ করলেন।

এই হাদিসের বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি মসজিদে তাদের সাতজন সন্তান দেখেছি, যাদের প্রত্যেকেই কোরআনের আলেম ছিল।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে উম্মে সুলাইম ﵂ এর শিক্ষা সচেতনতা ও সৎকাজেরর প্রতি আগ্রহের প্রমাণ মিলে। তাছাড়া ইসলামের শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা যে কেবল পুরুষদের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়; বরং নারীদেরও রয়েছে এতে বিশাল অবদান তিনি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে নারীদেরও যে অবদান রাখার বহু সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তিনি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, হে আল্লাহ! আমরা যেন জান্নাতে আল্লাহর রাসুল ﷺ ও উম্মে সুলাইম ﵂-র সাথে মিলিত হতে পারি।

পলায়নপর সুফিয়ান সাওরি

রাসুল ﷺ-র উপদেশ–

সুখের দিনে তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো, দুঃখের দিনে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসুল ﷺ-র পেছনে (আরোহী) ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি– আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করবে, তাহলে তিনিও তোমাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখবে, তাহলে প্রয়োজনের সময় তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ ﷻ-র কাছেই চাইবে। সাহায্য চাইলে তাঁর কাছেই চাইবে। মনে রেখ, সকল মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতিত তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সকল মানুষ তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতিত অন্য কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজগুলোও শুকিয়ে গেছে। [তিরমিযি : ২৫১৬]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল ﷺ বলেন–

তোমরা সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো, তিনি বিপদ অবস্থায় তোমাদের স্মরণ করবেন।

আল্লাহভীরু সুফিয়ান সাওরি

চলো, প্রখ্যাত আলেম ও জগতসেরা বুযুর্গ সুফিয়ান সাওরির একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনি। যিনি তার সুখের দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ

করেছিলেন। ফলে তার দুঃখের দিনে আল্লাহ তাআলাও স্মরণ করেছিলেন তাকে। এসো জানি সেই সত্য সুন্দর গল্পটি–

সুফিয়ান সাওরি। পুরো নাম সুফিয়ান বিন সাঈদ আস সাওরি। হাদিস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম তিনি। বসবাস করতেন বাগদাদে। খলিফা আবু জাফর মানসুর তাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে আহবান জানালেন। সেকালের আলেমদের স্বভাব ছিল তারা বিচারকের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করতেন। তারা ভয় করতেন যে, বিচারকার্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কোনো ভুল হয়ে যায়। যদি কারো প্রতি জুলুম করে ফেলি। কারণ, বিচারকদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন যাকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা হল তাকে যেন ছুরি ছাড়াই হত্যা করা হল। [তিরমিযি : ১৩২৫]

অন্য হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন–

اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ

> বিচারক তিন ধরনের–দু’জন জাহান্নামি, একজন জান্নাতী। [তিরমিযি : ১৩২২]

তাই আল্লাহভীরু আলেমগণ এ দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করতেন। সুফিয়ান সাওরি رحمه الله-ও সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

কঠোর ও অনমনীয় স্বভাবের অধিকারী খলিফা আবু জাফর মানসুর এ কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠালেন। সুফিয়ান সাওরি رحمه الله তার দরবারে যাবার পর তিনি তাকে বললেন, হে সুফিয়ান! আমি তোমাকে বিচারক হিসেবে চাই।

আমিরুল মুমিনিন! আমি বিচারক হতে চাই না। বিনীত কণ্ঠে বললেন সুফিয়ান সাওরি رحمه الله।

তোমাকে বিচারক হতেই হবে। খলিফার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

না, আমার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল।

যদি তুমি অসম্মতি প্রকাশ কর তাহলে এর বদলা হবে নাতা এবং তরবারি। (নাতা হল চামড়ার তৈরি এক প্রকার মাদুর, যাতে মানুষের মাথা রেখে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হয়)।

ঠিক আছে, আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত অবকাশ দিন। আমি ভেবে দেখি।

বেশ, তোমাকে আগামীকাল পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হল।

রাত গভীর হলে তিনি আসবাবপত্র খচ্চরের পিঠে বোঝাই করলেন। তার কোনো স্ত্রী-সন্তান ছিল না। রাতেই তিনি ইরাক ত্যাগ করে অজানার পথে পাড়ি জমালেন।

এদিকে খলিফা মানসুর তাকে না পেয়ে ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি সুফিয়ান সাওরিকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারবে তাকে বিপুল পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে।

সুফিয়ান সাওরি ﷺ ততক্ষণে ইরাকের সীমানা পার করেছেন। কিন্তু কোথায় যাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন ইয়েমেন যাবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি ইয়েমেনের পথ ধরলেন। পথিমধ্যে তার পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তিনি এক বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ নিলেন। সেখানে তার দিনগুলো ভালোই কাটতে লাগল। একদিন বাগানের মালিক তাকে ডেকে বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

বাগানের মালিক জানত না যে, তার এই শ্রমিকটিই বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ও বুযুর্গ সুফিয়ান সাওরি।

মালিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আমি ইরাক থেকে এসেছি।

ইরাকের আঙ্গুর বেশি ভালো নাকি আমাদের এখানকার আঙ্গুর? বাগানের মালিক জানতে চাইলেন।

সুফিয়ান সাওরি বললেন, আমি তো এখনও আপনাদের এখানকার আঙ্গুর খেয়ে দেখিনি, তাই বলতে পারব না।

সুবহানাল্লাহ! তুমি এতদিন ধরে আমার এখানে কাজ করছ অথচ একটি আঙ্গুরও খাওনি? বাগানের মালিকের কণ্ঠে বিস্ময়।

সুফিয়ান সাওরি বললেন, আপনি তো আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি। আর অনুমতি ছাড়া যদি আমি একটি আঙ্গুরও খাই তাহলে আল্লাহর কাছে এর জবাব দিতে হবে।

বাগানের মালিক তার তাকওয়া দেখে অভিভূত হলেন। বললেন, তার মানে তুমি আল্লাহর ভয়েই এমনটি করেছো? তুমি তো দেখছি সুফিয়ান সাওরি বনে যাবে!

একথা বলে তিনি বাজারে চলে গেলেন। সেখানে কথা প্রসঙ্গে তার এক বন্ধুর কাছে বললেন, জানো আজ আমার এক অবাক করা অভিজ্ঞতা হল। আমার বাগানে কাজ করা এক যুবকের আশ্চর্য তাকওয়া দেখলাম। অতঃপর তিনি সুফিয়ান সাওরির সাথে ঘটে যাওয়া পূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিল। তার কথা শুনে বন্ধুর কৌতুহল বেড়ে গেল। বন্ধুটি বলল, সে দেখতে কেমন? তার কিছু বিবরণ দাও তো?

বাগানের মালিক তার বিবরণ দিল। বিবরণ শুনে বন্ধুটি বলল, আল্লাহর কসম এই লোক সুফিয়ান সাওরি ছাড়া আর কেউ নয়। এর নামে খলিফা মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। চলো, তাকে ধরিয়ে দিয়ে খলিফা থেকে পুরস্কার নিয়ে নিই।

তারা যতক্ষণে বাগানে পৌঁছল, ততক্ষণে সুফিয়ান সাওরি সেখান থেকে ইয়েমেনের পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

ইয়েমেনে পৌঁছে তিনি সেখানকার একটি বাজারে কাজ খুঁজতে লাগলেন। কারণ, তিনি বৈধভাবে উপার্জনকরে জীবিকা নির্বাহ করতে চান। কারো করুণা চান না। কিন্তু বাজারে প্রবেশের পর কিছু লোক তার ওপর চুরির অপবাদ দিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি চুরি করিনি। কিন্তু তারা তার কথা কানে তুলল না। তারা তাকে ইয়েমেনের গভর্নরের কাছে নিয়ে গেল। ইয়ামানের গভর্নর ছিল খলিফা আবু জাফর মানসুরের একান্ত অনুগত।

তিনি দেখলেন লোকেরা যাকে ধরে নিয়ে এসেছে তাকে দেখতে আলেমের মতো লাগছে। তার চেহারায় ইলমের নূর ভাসছে। এমন

চেহারার লোক কখনও চোর হতে পারে না। তাই গভর্নর লোকদেরকের বললেন, তোমরা চলে যাও। তার বিষয়টি আমি দেখছি।

আপনি কে? গভর্নর জানতে চাইলেন।

আমি আবদুল্লাহ। সুফিয়ান সাওরির জবাব।

দোহাই লাগে, আপনার আসল নাম বলুন।

আমি সুফিয়ান।

কার পুত্র সুফিয়ান?

সাঈদের পুত্র সুফিয়ান।

আপনিই কি সুফিয়ান সাওরি?

জি।

আপনিই সেই বিখ্যাত আলেম সুফিয়ান সাওরি?

জি, আমিই।

তার মানে খলিফা আপনাকেই খুঁজছেন?

জি।

আপনাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যেই খলিফা মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন?

জি।

একথা শুনে গভর্নর মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর মাথা ওঠিয়ে বললেন, হে সাঈদের পুত্র! ইয়েমেনের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আপনি অবস্থান করতে পারেন। আল্লাহর কসম, আপনি আমার পায়ের কাছেও লুকিয়ে থাকতেন, তথাপি আমি আপনাকে ধরিয়ে দিতাম না।

আহা! এই হল রাসুল ﷺ-র বাণীর সত্যতা। 'সুখের দিনে তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো, দুঃখের দিনে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন'।

অর্থাৎ, তুমি যদি সুস্থ অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তোমার অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহ ﷻ তোমাকে স্মরণ করবেন।

তুমি যদি স্বচ্ছলতার সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার দরিদ্রতার সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন।

তুমি যদি সামর্থ্যবান থাকা অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার দুর্বল অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন।

তুমি যদি স্বাধীনতার সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার পরাধীনতার সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন।

তুমি যদি সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার পতন ও অপদস্ত হওয়ার সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন।

অতঃপর সুফিয়ান সাওরি গভর্নরের দরবার থেকে বের হয়ে গেলেন। তিনি ইয়েমেনে থাকাটা নিজের জন্য সমীচীন মনে করলেন না। তাই মক্কায় চলে গেলেন।

এদিকে খলিফা আবু জাফর মানসুরের কাছে এই সংবাদ পৌঁছল যে, সুফিয়ান সাওরি মক্কায় অবস্থান করছেন। সামনেই ছিল হজের মওসুম। তাই খলিফা সুফিয়ানকে ধরার জন্য বাগদাদ থেকে সরাসরি মক্কায় সৈন্য পাঠালেন।

সৈন্যদল মক্কা শহরের হারাম শরীফে পৌঁছে ঘোষণা দিতে লাগল, কে আছো যে, সুফিয়ান সাওরির সন্ধান দিতে পারবে? ওদিকে খলিফা আবু জাফর মানসুরও মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সুফিয়ান সাওরির কানে ঘোষকের ঘোষণা পৌঁছার পর তিনি কিবলামুখী হয়ে দু হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোআ করতে লাগলেন– হে আল্লাহ! আমি আপনার সাহায্য চাই। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাফরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবেন না। সে আমার ওপর জুলুম করেছে। সাধারণ মানুষের ওপরও জুলুম করেছে। হে আল্লাহ! আবু জাফরকে মক্কায় প্রবেশ দেবেন না।

রাসুল ﷺ বলেন—

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছেন যারা আল্লাহর নামে শপথ করে দোআ করলে তিনি তা কবুল করে নেন। [বোখারী : ২৭০৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে—

'অনেক এলোমেলো চুল বিশিষ্ট, ধূলিমলিন ও ছেঁড়া কাপড় পরিহিত লোক রয়েছে, যাদের দিকে তাকালে মনে হবে গরিব-নিঃস্ব। তাদের পোষাক জীর্ণশীর্ণ। মানুষের চোখে তারা ঘৃণিত। দেখবে তারা রাস্তার ডানে বামে চেতনাহীনভাবে চলাফেরা করে। আর মানুষ তাদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। তার কোনো যত্ন নেই, কেউ তাকে ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু সে যখন আল্লাহর শপথ দিয়ে দোআ করে, তখন আল্লাহ তা কবুল করে নেন।

সুফিয়ান সাওরি রহ.-র অবস্থাও তেমনি। এদিকে তিনি দুহাত তুলে দোআ করছেন। ওদিকে আকাশ থেকে ফেরেশতা এসে মক্কায় প্রবেশ পথে খলিফা আবু জাফর মানসুরের রূহ কবজ করে নিল। অতঃপর আবু জাফর মক্কায় ঠিকই প্রবেশ করেছে। কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। অতঃপর তাকে হারামে উপস্থিত করা হয়। সেখানেই তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

মুমিন ব্যক্তি এমনই হয়ে থাকে

সুফিয়ান সাওরি রহ.-র এই ঘটনায় মুমিনের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। শত কষ্ট সত্ত্বেও তিনি কারও কাছে হাত পাতেননি। আসলে প্রকৃত মুমিনের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। কারণ, রাসুল ﷺ বলেছেন, একজন কর্মঠ ও উদ্যোমী মুমিন একজন দুর্বল মুমিন থেকে শ্রেয়।

তিনি আরও বলেছেন–

নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। [তিরমিযি]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে গাঁটরি বেঁধে পিঠে কাঠ এনে বিক্রি করে এবং তাতে আল্লাহ তার অভাব দূর করে তাহলে সে ওই ব্যক্তি হতে উত্তম যে মানুষের কাছে হাত পাতে। মানুষ ইচ্ছা করলে তাকে সাহায্য করে আর ইচ্ছা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়'। [বোখারী]

এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল ﷺ-র কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আমি একজন নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তি। আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, তোমার ঘরে সামান্য যা কিছু আছে তা নিয়ে আসো। লোকটি তখন মাত্র একটি জুতা নিয়ে আল্লাহর রাসুলের দরবারে উপস্থিত হল। রাসুল ﷺ তাকে জুতাটি বিক্রি করতে বললেন। কিন্তু সে তা বিক্রি করতে পারল না। রাসুল ﷺ সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এই জুতাটি কিনবে? এক সাহাবি দু দিরহাম দিয়ে জুতাটি কিনে নিলেন। রাসুল ﷺ লেকাটির হাতে দিরহাম দুটি দিয়ে বললেন, 'এক দিরহাম দিয়ে রশি এবং কুঠার কিনবে আর এক দিরহাম দিয়ে পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবে।

লোকটি রশি ও কুঠার কিনে রাসুল ﷺ-র কাছে এল। তিনি তাকে বললেন, 'অমুক জায়গায় গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করে নিয়ে আসো।

লোকটি দূর জঙ্গালে গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করে রাসুল ﷺ-র কাছে নিয়ে এল।

রাসুল ﷺ সেগুলো এক দিরহামে বিক্রি করে তাকে দিলেন। এবার লোকটির কাছে কুঠার ও রশির পাশাপাশি রয়েছে মূলধনও। রাসুল ﷺ তাকে প্রতিদিনি এভাবে কাজ করার নির্দেশ দিলেন।

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ-ও জানতেন যে, রাসুল ﷺ ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করেন না। তাই উপরে আমরা দেখেছি তিনি পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, কিন্তু কারো কাছে হাত পাতেননি।

এক ভিক্ষুকের গল্প

বর্তমান সময়ের কিছু লোক কোনো কাজ করতে চায় না। চায় না পরিশ্রম করতে। তারা শুধু চায় অন্যের ওপর নির্ভর করে জীবন কাটাতে। চায় অন্যের কাছে হাত পেতে অপমানিত হতে।

একটি গল্প বলছি। গল্পটি আমার এক বন্ধু ও এক আশ্চর্য ভিক্ষুকের। ভিক্ষুকটি তার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসে বলল, ভাই আমি একজন অসহায় মানুষ। আমাকে কিছু দান করুন। ভিক্ষুকটি ছিল স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম দেহের অধিকারী।

তাই আমার সেই বন্ধুটি তাকে জিজ্ঞেস করল, মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার পরিবর্তে কাজ করো না কেন?

ভিক্ষুকটি বলল, ভাই, কেউ আমাকে কাজ দেয় না। অনেক খুঁজেও কাজ পাইনি। তাই ভিক্ষা করছি। দয়া করে আপনি আমাকে দু একটা রিয়াল দিয়ে সাহায্য করুন।

আমার সেই বন্ধুটি তখন তাকে বলল, আপনি আমার সাথে আসুন। আমি আপনাকে কাজ দেব। সে তার গাড়ির পেছনের পকেট খুলে একটি নেকড়া ও বালতি বের করল। অতঃপর লোকটিকে বলল, এই নাও নেকড়া আর এই নাও বালতি। বালতিতে পানি ভরে আমার গাড়িটা একটু ধুয়ে দাও। আমি তোমাকে দু রিয়াল নয় পনের রিয়াল দেব।

ভিক্ষুকটি তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, ভাই, আমি কাজ করতে চাই না। পারলে আমাকে কিছু দান করুন।

তখন আমার বন্ধুটি বলল, আশ্চর্য! গাড়ি ধোয়ার নেকড়া-বালতি তোমার হাতে। আর নেকড়াটিও তোমার না, আমার। বালতিও আমার। আর পানি তো আল্লাহর দানই। তাছাড়া তুমি আমার কাছে দু রিয়াল চেয়েছো আর এখন তার পরিবর্তে পাবে পনের রিয়াল। কাজ শুধু পানিতে নেকড়াটি ভিজিয়ে গাড়িটা পরিষ্কার করা। এটা অন্যের কাছে হাত পেতে দু রিয়াল নেয়ার চেয়ে উত্তম নয় কী?

ভিক্ষুকটি তখন আমার বন্ধুর দিকে নেকড়াটি ছুঁড়ে মেরে সেখান থেকে চলে গেল। আসলে সেই লোকটির কাজ করারর মানসিকতাই ছল না। যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভিক্ষা করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারার কোনো গোস্ত থাকবে না।' [তিরমিযি]

তাই সুফিয়ান সাওরি رحمه الله এর গল্পে আমরা দেখেছি যে, তিনি পরিশ্রমের পথ খুঁজেছেন কিন্তু কারও কাছে হাত পাতেননি। তিনি সুখের দিনে আল্লাহকে স্মরণ করেছিলেন বলে তার দুঃখের দিনে আল্লাহ ﷻ-ও তাকে স্মরণ করেছেন।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে আমাদের প্রার্থনা, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত করেন, যাদের তিনি দুঃখের সময়ে স্মরণ করে থাকেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত। [সূরা ইউসুফ : ১১১]

হালাল খাবার গ্রহণ করো

এক ব্যক্তি সুফিয়ান সাওরি رحمه الله-কে জিজ্ঞেস করল, প্রথম কাতারের ডান পাশে সালাত আদায় করা উত্তম, নাকি বাম পাশে?

সুফিয়ান সাওরি رحمه الله তাকে বললেন, আপনি আগে আপনার প্রতিদিনের খাবারের ব্যাপারে সতর্ক হোন। আপনি যা খাচ্ছেন তা কি

না হারাম– সেদিকে লক্ষ্য করুন। তাহলে কাতারের ডান কিংবা বাম যেদিকেই সালাত আদায় করেন না কেন তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি আমাকে কাতারের কোন পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন– সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন অথচ আপনার থেকে কখনও এমনও প্রকাশ পায় যা আপনার ইবাদত কবুল হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। একদিন রাসুল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন–

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟

তোমরা কি জানো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব কে?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ!

الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ.

আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ব্যক্তি সে, যার অর্থ-সম্পদ নেই।

রাসুলে কারীম ﷺ বললেন–

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ওই লোক, যে কিয়ামতের দিন সালাত-সিয়াম-যাকাত নিয়ে আগমন করবে কিন্তু কাউকে সে গালি দিয়েছিল, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল, কারো রক্ত ঝরিয়েছিল। তো একে তার নেক আমল দিয়ে দেওয়া হবে, ওকেও তার নেক আমল দিয়ে দেওয়া হবে। যখন নেক আমলগুলো শেষ হবে তখন ঐসকল লোকের গুনাহ এই ব্যক্তির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এ হচ্ছে আমার উম্মতের সবচেয়ে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত।) [সহীহ মুসলিম : ৬৭৪৪]

তাই সুফিয়ান সাওরি ﷺ লোকটিকে বললেন, আপনি কাতারের ডান বামের পেছনে না পড়ে প্রথমে আপনার খাবার হালাল করুন।

পবিত্র বস্তু আহার করো

এসো, হালাল খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে কেমন ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী আলেমগণ সে ব্যাপারে খানিকটা জেনে নিই।

রাসুল ﷺ বলেছেন–

আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ নবী রাসুলদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনদের ক্ষেত্রেও দিয়েছেন একই নির্দেশ।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

> হে রাসুলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। [সূরা মুমিনুন : ৫১]

এ আয়াতে আল্লাহ সৎ কাজের পূর্বে হালাল খাবার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, তুমি সালাত, সিয়াম, শেষ রাতের আহাজারি ও কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি আগ্রহী হওয়ার পূর্বে হালাল খাবারের প্রতি আগ্রহী হও।

এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ একটি উত্তম উদাহরণ পেশ করেছেন–

এক ব্যক্তি অনেক পথ সফর করল। চুল তার উস্কখুস্ক। শরীর তার ধূলোমলিন। সে আকাশের দিকে দু হাত তুলে দোআ করছে, হে রব! হে রব!

রাসুল ﷺ বলেন,

> وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ
>
> অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে বেড়ে ওঠেছে হারাম খেয়ে, তাহলে তার দোআ কীভাবে কবুল হবে? [মুসলিম : ২৩৯৩]

একটুখানি হারাম

আবুল মাআলি আল জুয়াইনি হারাম শরীফের একজন সম্মানিত ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রবাদ প্রতিম বিতার্কিক। বিতর্কালোচনায় কেউ তাকে কখনও পরাজিত করতে পারেনি। তার পিতা ছিলেন একজন সৎ ও সাধারণ মানুষ। শত দারিদ্রতা সত্ত্বেও তিনি কখনও হারাম পথ অবলম্বন করেননি। আবুল মাআলি আল জুয়াইনির জন্মের পর থেকেই তিনি তার পেটে যেন কোনো হারাম খাবার প্রবেশ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। স্ত্রীকেও সতর্ক করতেন। বলতেন, সাবধান! তুমি ছাড়া আমার সন্তানকে যেন অন্য কেউ দুধ পান না করায়। আমি জানি তুমি তাকে যে দুধ পান করাও তা পুরোপুরি হালাল। কারণ, তোমার দুধ হালাল খাবার হতে উৎপন্ন। সে খাবার আমি এনে থাকি।

একদিনের ঘটনা। পাশের বাড়ির এক মহিলা তাদের ঘরে এলেন। তার স্ত্রী কোলের সন্তানকে রেখে মেহমানের জন্য কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে গেলেন। এদিকে শিশুটি কান্না শুরু করে দিল। আগন্তুক মহিলাটিও স্তন্যদানকারিণী ছিলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে নিয়ে নিজ স্তন পান করতে দিলেন। তখনকার সময় এটি সাধারণ বিষয় ছিল।

কিছুক্ষণ পর তিনি এসে দেখলেন, মহিলাটি তার সন্তানকে দুধ পান করাচ্ছে। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, হায়! আপনি এটা কী করলেন? আমার স্বামী আমাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। বলেছেন আমি ছাড়া যেন অন্য কেউ আমার সন্তানকে দুধ পান না করায়। তিনি একমাত্র আমার ওপরেই আস্থা রাখেন। যাতে আমার সন্তান একমাত্র হালাল খাবারে বেড়ে উঠে।

দেখতে দেখতে আবুল মায়ালি আল জুয়াইনি বড় হলেন। হলেন বিশ্বখ্যাত আলেম ও বিতার্কিক। তিনি বলতেন, আমি যখন বিতর্ক প্রতিযোগিতা করতাম, তখন মাঝে মাঝে এমন হতো যে, আমি একেবারে চুপসে যেতাম। আচানক আমার স্মৃতিশক্তি স্থবির হয়ে পড়ত। তিনি বলতেন, এটি হল সে মহিলার দুধ পানের ফল।

এ ঘটনা প্রমাণ করে, হালাল খাবার ও উপার্জন মানুষের জীবন ও মেধায় যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি প্রভাব ফেলে তার ঈমান, আমল, ইলম ও সালাত-সিয়ামে।

দুটি ঘটনা

হাদিস- ১

একদিন রাসুল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে খাটের ওপর কিছু খেজুর দেখতে পেলেন। তিনি তখন ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাই সেখান থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিতে গিয়ে রেখে দিলেন। ভাবলেন এটি সদকার খেজুর নয় তো? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি যদি খেজুরটির ব্যাপারে সদকার খেজুর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে আমি সেটি খেয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি খেজুরগুলো সদকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। [বোখারী]

হাদিস- ২

একবার রাসুল ﷺ-র কাছে কিছু সদকার মাল এলো। হাসান رضي الله عنه সেখান থেকে একটি খেজুর মুখে দিলেন। রাসুল ﷺ তখন তার মুখে হাত ঢুকিয়ে খেজুরটি বের করে আনলেন এবং বললেন, তুমি জানো না, এগুলো সদকার খেজুর? নিশ্চয় মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের জন্য সদকা খাওয়া হালাল নয়। [বোখারী : ৩০৭২]

রাসুল ﷺ ও তার পরিবারবর্গের জন্য যাকাত বা সদকা গ্রহণ করা হারাম ছিল। এ ঘটনা থেকে হালাল খাবারের ব্যাপারে রাসুল ﷺ-র সর্বদা সচেতন থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

মুসতাজাবুদ দাওয়া সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه একদিন রাসুল ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য দোআ করুন। আল্লাহ ﷻ যেন আমাকে মুসতাজাবুদ দাওয়া (যার দোআ তৎক্ষণাৎ কবুল হয় এমন) বানিয়ে দেন।

রাসুল ﷺ বললেন, সা'দ।

أَطِبْ مَطْعَمَكَ ، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

তোমার খাবারকে পবিত্র কর। তুমি মুসতাজাবুদ দাওয়া হয়ে যাবে। [আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানি : ৬৪৯৫]

বস্তুত সা'দ رضي الله عنه-র অনুরোধ শুনেই রাসুল ﷺ তার জন্য দোআ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করননি; বরং কিভাবে মুসতাজাবুদ দাওয়া হওয়া যায় সেই পদ্ধতি বাতলে দিলেন।

রাসুল ﷺ বরাবরই এমন করতেন। তিনি সাহাবিদেরকে প্রস্তুত কোনো কিছু দিয়ে দিতেন না; বরং সে জন্য করণীয় কর্তব্য কি– তা সে শিখিয়ে দিতেন।

রাসুল ﷺ-র দেয়া উপদেশের পর থেকে সাদ رضي الله عنه কখনও হালাল ব্যতিত হারাম খাবার গ্রহণ করেননি। বর্ণিত আছে, সাদ رضي الله عنه-র একটি বকরি ছিল। তিনি সেটির দুধ পান করতেন। একদিন সেই বকরিটি তার প্রতিবেশীর ক্ষেতে ঢুকে ফসল খেয়ে ফেলে। এ কথা জানার পর সাদ رضي الله عنه আমৃত্যু সেই বকরির দুধ পান করেননি। এভাবেই তিনি একসময় মুসতাজাবুদ দাওয়া হয়ে যান।

খলিফা ওমর رضي الله عنه-র সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه-কে ইরাকের এক শহরের গভর্নর নিযুক্ত করে সেখানে পাঠালেন। কিছুদিন না যেতেই সে শহরের কিছু লোক তার ব্যাপারে ওমর رضي الله عنه-র এর নিকট অভিযোগ পেশ করছেন। ওমর رضي الله عنه বিচক্ষণ মানুষ। অভিযোগ শোনা মাত্রই তিনি সাদ رضي الله عنه-র বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না। তিনি অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য সেখানে একজন দূত পাঠালেন। যেমনটি হুদহুদ পাখির ব্যাপারে সোলাইমান عليه السلام করেছিলেন। হুদহুদ পাখিটি সোলাইমান عليه السلام-র কাছে একটি সংবাদ নিয়ে এলো–

﴿إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾

আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদের সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। [সূরা নামল : ২৩-২৪]

তখন সুলাইমান ﷺ কী বলেছিলেন? তিনি কি তৎক্ষণাৎ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিয়েছিলেন– যাও তাদের ওপর আক্রমন কর। না; তিনি তখন বলেছিলেন-

﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ﴾

> তুমি মিথ্যা বলছ, না সত্য বলছ, আমি তা যাচাই করব। [সূরা নামল : ২৭]

শরীয়তের বিধানও এমনই। সেজন্যেই রাসুল ﷺ সাহাবিদেরকে প্রায়ই এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে শোনাতেন–

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ﴾

> হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমারা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কতৃকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। [সূরা হুজরাত : ৬]

অতএব, কোনো সংবাদ শুনলে সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়া আমাদের জন্য কর্তব্য।

তো ওমর رضي الله عنه সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه সম্পর্কে উত্থিত অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে সে অঞ্চলে একজন দূত পাঠালেন। তিনি সাদ رضي الله عنه-র কাছে গিয়ে বললেন, হে সাদ! তোমার ব্যাপারে যে অভিযোগ ওঠেছে তার সত্যতা যাচাই করতে মানুষের সাথে কথা বলতে হবে। আমি অমুক অমুক মসজিদে সালাত আদায় করব এবং সালাতের পর লোকদের মতামত জানবো। তুমিও আমার সাথে চলো।

সাদ رضي الله عنه দূতের সাথে চললেন। তারা একটি মসজিদের জোহরের সালাত আদায় করলেন।

সালাতের পর ওমর رضي الله عنه-র পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত দাঁড়িয়ে বললেন, ভাইয়েরা! আমি ওমর رضي الله عنه-র পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এসেছি। তার কাছে আপনাদের আমিরের বিরুদ্ধে এই এই অভিযোগ পৌঁছেছে।

যদি এগুলো সত্য হয় এবং প্রকৃতই আপনাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো অভিযোগ থেকে থাকে, তাহলে আপনারা দাঁড়ান এবং কথা বলুন।

তখন সবাই তাদের আমিরে প্রশংসা করল।

এভাবে দূত প্রতিটি মসজিদেই একই প্রশ্ন করলেন এবং মুসল্লিগণ সাদ رضي الله عنه-র বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিবর্তে তার প্রশংসা করতে লাগলেন।

পরিশেষে তারা মসজিদে বনি আসাদে পৌঁছলেন। সেখানে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দূত দাঁড়িয়ে বললেন– ভাইয়েরা! আমি খলিফা ওমর رضي الله عنه-র পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের আমির সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে আমার কাছে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। লোকেরা কেউ কোনো অভিযোগ করল না। সবাই যথারীতি সাদ رضي الله عنه-র ভূয়সী প্রশংসা করল। একজন বলল, তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান। রাসুল ﷺ-র একজন বিশিষ্ট সাহাবি তিনি। তাকে গভর্নর হিসেবে পেয়ে আমরা ধন্য। প্রস্থানের পূর্বে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দূত শেষবারের মতো বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনাদের কারো কোনো অভিযোগ থাকলে বলুন?

এবার পেছন থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়ায়ি বলল, আপনি যেহেতু আমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়েছেন তাই আপনার সাথে সত্য বলা দরকার।

জি অবশ্যই, বলুন। দূত তাকে অভয় দিলেন।

লোকটি বলল, সাদ আমাদের মাঝে সমবন্টন করেন না। সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচারও করেন না। বিচারের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি করেন। তাছাড়া তিনি খুবই ভীতু প্রকৃতির। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন না। আমরা যুদ্ধ করি আর তিনি বসে থাকেন।

বস্তুত সাদ رضي الله عنه-র বিরুদ্ধে আনিত এই অভিযোগটি পুরোপুরি অসত্য ছিল। সাদ رضي الله عنه তো সেই ব্যক্তি স্বয়ং রাসুল ﷺ যার প্রশংসা

করেছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে যখন সাহাবিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, তখন সাদ ﵁ একা তীরন্দাজ হিসেবে তীর ছুঁড়তে লাগলেন। যা দেখে রাসুল ﷺ বলেছিলেন–

> তোমার জন্য আমার মাতা পিতা কোরবান হোক। নিক্ষেপ কর হে সাদ! তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করতে থাকো। [বোখারী : ৪০৫৫]

তিনিই ছিলেন একমাত্র সাহাবি যার জন্যে রাসুল ﷺ বলেছিলেন– 'আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক।' অথচ লোকটি সেই সাদ ﵁-কে বলছেন–ভীতু-কাপুরুষ!?

সাদ ﵁ লোকটির দিকে তাকালেন। বুঝলেন, লোকটি তার প্রতি জুলুম করছে। তখন সতত হালাল খাবার গ্রহণকারী এই 'মুসতাজাবুদ দাওয়াহ'– দুহাত ওঠিয়ে বললেন–

হে আল্লাহ! আপনি তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, দারিদ্রতাকে তার জন্য প্রকট করুন এবং তাকে বিভিন্ন ফেতনায় নিপতিত করুন।

অতঃপর সাদ ﵁ মসজিদ থেকে বের হতে হতে লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার ও তোমার বিষয়টি আমি আল্লাহ ﷻ-র হাতে সোপর্দ করলাম। তিনি আমার সকল গোপন বিষয়ে অবগত। যেমন অবগত তোমার গোপন বিষয় সম্পর্কে। তিনি যেমন আমার অতীত সম্পর্কে জানেন, তেমনি জানেন তোমার অতীতও সম্পর্কেও। আমার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট। নেতৃত্ব কর্তৃত্ব কিছুই আমার দরকার নেই– এই বলে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তার বদদোআ সেই লোকটিকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। সাদ ﵁ ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ জীবত আছেন। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সে লোকটির হায়াত এতোটাই বাড়িয়ে দিলেন যে, সে বুড়ো হতে হতে চোখের ভ্রুতে তার দুচোখ ঢেকে গেল। কঠিন দরিদ্রতা তাকে আষ্টেপৃষ্টে ধরল। সে রাস্তার মোড়ে বসে বসে ভিক্ষা করত। যখন তার পাশ দিয়ে কোনো মহিলা হেঁটে যেতো তখন সে ভ্রু ওঠিয়ে তাদের দিতে তাকাতো। তাদের স্পর্শ করার চেষ্টা করত। তারা

তাকে চরমভাবে অপমান করে বলত– লজ্জা করে না? এতোটা বুড়ো হয়েছেন, রাস্তায় বসে ভিক্ষা করছেন, আবার নারীদের গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করছেন? এ কাজ কোনো যুবক করলে তাকেও তো শাস্তি দেয়া হয়, সেখানে আপনার মতো বুড়োর কী হওয়া উচিত?

وَيَقْبَحُ بِالْفَتى فِعْلُ التَّصَابِيْ * وَأَقْبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتّى

বাল্য আচরণ যুবকের জন্য নিন্দনীয়, বৃদ্ধের জন্যে তো তা আরো শোচনীয়।

বুড়ো বলত, আমি কী করব? ফেতনায় পতিত এক অসহায় বৃদ্ধ আমি। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের বদদোআ বয়ে বেড়াচ্ছি।

তাই, রিযিক হালাল হলে দোআ কবুল হবে। যেমন হয়েছে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه-র বেলায়।

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে প্রার্থনা করতে বলেছেন। কবুলের দায়িত্ব তাঁর। তিনি বলেছেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। [সূরা গাফির : ৬০]

হে আমাদের রব! আপনাকে ডাকলে লাভ কী হবে?

اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। [সূরা গাফির : ৬০]

তিনি আরো বলেন–

﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى﴾

আল্লাহর রয়েছে অনেক সুন্দর নাম। [সূরা আরাফ : ১৮০]

হে রব! কেন আপনার নামের কথা আমাদের জানালেন?

﴿فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ ۪

সে নামে তোমরা তাকে ডাকো। [সূরা আরাফ : ১৮০]

তাই এভাবে ডাকো–

হে সর্বশ্রোতা। আমার দোআ শুনুন।

হে সদা নিকটবর্তী! আমাকে নিকটবর্তী করে নিন।

হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করুন।

হে রোগ থেকে মুক্তিদাতা! আমাকে রোগ মুক্ত করুন।

হে (পাপ) গোপনকারী! আমার পাপ গোপন রাখুন।

হে মহাধনী! আমাকে ধনী করুন।

এভাবে আল্লাহ ﷻ-র নাম নিয়ে দোআ করতে হবে এবং খেতে হবে হালাল রিযিক। তাহলে আমাদের দোআ অবশ্যই কবুল হবে, ইনশাআল্লাহ।

হালাল খাবার : দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়েছে। মাথার চুল তার উশকো-খুশকো। শরীর তার ধূলোমলিন। এমতাবস্থায়ও সে দুহাত তুলে মিনতি করে– হে রব, হে রব। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, কাপড়-চোপড় হারাম। তার শরীর হারামে গঠিত। সুতরাং কীভাবে এমন ব্যক্তির দোআ কবুল হবে? [বোখারী]

কিছু মানুষ হারাম খাবার খায়, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মদ পান করে, আর বলে, ভাই! আমার রব আমার দোআ কেন কবুল করেন না?

আরে ভাই, তিনি কীভাবে তোমার দোআ কবুল করবেন? তুমি তো মদ পান করেছো?

রাসুল ﷺ বলেছেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ

> যে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে আল্লাহর সামনে মূর্তিপূজারী হিসেবে উপস্থিত হবে। [মুজামুত তাবরানি : ১২৪২৮]

তাই, ভেবে দেখো, তুমি কারো অধিকার অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করছ না তো? শ্রমিককে যথাসময়ে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক দিচ্ছ তো?

তোমার বাসায় কোন অসহায় কাজের মানুষ দীর্ঘ দিন কাজ করে যাচ্ছে অথচ তুমি তার বেতন দিচ্ছ না– এমন হচ্ছে না তো?

একবার আমাকে এক ব্যক্তি তার বন্ধুর কথা শুনিয়েছিল। বলেছিল, শায়খ! আমার এক বন্ধু সাত বছর যাবত তার বাসার কাজের মেয়ের বেতন দিচ্ছে না। এমনকি তাকে তার পরিবারের কাছেও যেতে দিচ্ছে না।

আশ্চর্য! সাত বছর? আমি হতবাক হলাম। তার কী কোনো অধিকার নেই?

আরে ভাই, এক মহিলা শুধু একটি বিড়ালকে কষ্ট দিয়েছিল বলে জাহান্নামী হয়ে গেছে। তাহলে তুমি যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক–মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ– তোমার কি হবে?

প্রিয় ভাই, তোমার অধীনে যদি কোনো ইহুদিও কাজ করে, তথাপি তাকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়া তোমার কর্তব্য। আর সে যদি হয় মুসলমান, তাহলে বিষয়টি কেমন হওয়া কাম্য ভেবে দেখেছ?

অতএব, তোমার খাবারকে হালার করো, দোআ কবুল হবে। হে যুবক-যুবতীরা! নেশা করো না। ধুমপান থেকে সতর্ক থাকো। এগুলো অনিষ্টকর। তোমাদের জন্য পবিত্র তথা উত্তম জিনিসকে হালাল করা হয়েছে। অনিষ্টকর বস্তুকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। চুরি করো না। মানুষের সাথে প্রতারণা করো না।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে সঠিকপথ প্রদর্শন করুন। আমাদের জীবনকে বরকতময় করুন। আমাদের সকলকে হালাল খাবার গ্রহণের তাওফিক দান করুন।

আঁধার থেকে আলোর পথে

আবু মিহজান সাকাফি। আল্লাহর রাসুল ﷺ-র একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার বেশিরভাগ সময় কাটতো শরাব খানায়। উন্মত্ত মাদকতায়। শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে তিনি পড়ে থাকতেন এখানে সেখানে। শরাবের প্রতি তার আসক্তি এতোটাই চরমে পৌঁছেছিল যে, অজ্ঞতার যুগে তিনি কবিতাকারে একটি ওসিয়তনামা লিখেছিলেন। যেখানে তিনি তার সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

إِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ * يُرَوِّيْ عِظَامِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ عُرُوْقُهَا
وَلَا تَدْفِنِّيْ بِالْفَلَاةِ فَإِنَّنِيْ * أَخَافُ إِذَا مِتُّ أَنْ لَا أَذُوْقُهَا

মৃত্যুর পর কোনো এক আঞ্জুর বাগিচায় করিও আমায় দাফন। যেন মরণের পরেও আঞ্জুর–রসে সিক্ত হয় আমার অস্থি মজ্জা মন।

মরুভূমির কোনো কোণে আমায় দাফন করো না হয়তো সেথায় আমি আমি শরাবের স্বাদ পাবো না।

তারপর। ইসলাম এলো। আবু মিহজান সাকাফি ইসলাম গ্রহণ করলেন। শরাব পানে তখনও তিনি অভ্যস্ত। এরপর মদ হারামের বিধান নাযিল হল–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।

> শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে? [সূরা মায়েদা : ৯০-৯১]

এই হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর মদ পানে অভ্যস্ত সাহাবীরা বললেন, হে রব! আমরা মদ পান করা ছেড়ে দিলাম। আবু মিহজানও বললেন, ছেড়ে দিলাম হে রব, ছেড়ে দিলাম।

সে গল্প বড়ই কষ্টের, নিতান্ত বেদনার

মদ ছাড়া যার এক মুহূর্তও চলেনা সেই আবু মিহজান সাকাফী কীভাবে মদ পান ত্যাগ করলেন? সে গল্প বড়ই কষ্টের। বড়ই বেদনার। আবু মিহজান পূর্বের অভ্যাস মতো কখনও কখনও মদ পান করে ফেলতেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাত করা হতো। তিনি আবার ভুলে যেতেন। আবার পান করতেন। তাকে আবার বেত্রাঘাত করা হতো। এরপর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতেন। তারপর আবার একই ভুল করে বসতেন। আবার শাস্তি পেতেন। এভাবেই চলছিল। কিন্তু তিনি মুমিন ছিলেন। তিনি সালাত আদায় করতেন। রাসুল ﷺ-র অভ্যাস ছিল, তিনি অবাধ্যদের ভালো দিকগুলো বিবেচনা করতেন, খারাপ দিকগুলো নয়।

কেননা, অনেক সমসয় দেখা যায় কোনো মানুষের ৭০% গুণাবলিই মন্দ। বাকি ৩০% গুণাবলি ভালো। কিন্তু তার মধ্যে থাকা এই সল্প পার্সেন্ট ভালো গুণগুলোই প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তার সালাত আদায়, দান-খয়রাতের প্রতি আগ্রহ, সন্তানকে দীনি শিক্ষা প্রদান, মা-বাবার সাথে সদাচরণ, তার অভ্যন্তরীণ উত্তম চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করে। কখনও বা দেখা যায়, কারও মধ্যে অপরাধের পরিমাণ ৩০% কিংবা ৪০% বাকি ৬০% কিংবা ৭০% হল ভালো দিক। একে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কল্যাণের পথে ডাকতে হবে। সবসময় তার খারাপ দিকগুলোকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করা সমীচীন হবে না।

তাকে বলা যাবে না– তুমি মদ পান করো, তাই তোমার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে হয়তো দেখা যাবে, তার মন্দ দিকগুলো ৪০ থেকে ৫০% এ বেড়ে যাবে। তারচে বরং তাকে বলতে হবে, ভাই, একথা ঠিক যে, তুমি মদ পান করছ, পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছ। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া করছি এজন্য যে, তোমার ভেতরে ঈমানের মত মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। যা তোমাকে এ ধরণের কাজ থেকে একদিন না একদিন ফিরিয়ে আনবেই। তাছাড়া তুমি তোমার মা-বাবর সাথে সদাচরণ করো। ইনশাআল্লাহ, তাদের দোআয় তুমি একদিন এসব কাজ থেকে ফিরে আসবে। তুমি তো সালাতও আদায় করো। তোমার সালাতই তোমাকে অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

এভাবে বললে দেখা যাবে আস্তে আস্তে তার খারাপ দিকগুলোর ওপর একটা চাপ তৈরি হবে। ধীরে ধীরে এ বদঅভ্যাসগুলো ত্যাগ করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

অবশেষে ছেড়েই দিলেন

আবু মিহজন সাকাফি ﷺ ছিলেন একজন সৎ ও আল্লাহভীরু সাহাবি। কদাচিৎ ভুলে মদ পান করে ফেলতেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর সদস্য হিসেবে তিনিও যুদ্ধে গেলেন। সেনাপতি ছিলেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ। যুদ্ধের শুরুতে প্রায় সপ্তাব্যাপী সাদ ﷺ ও পারস্য বাহিনীর সেনাপতির মাঝে চিঠি আদান প্রদান চলতে থাকে। দীর্ঘ অবসর পেয়ে আবু মিহজান সাকাফি ﷺ একদিন মদ পান করে বসলেন। তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সেনাপতির সামনে হাজির করা হল। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সেনাপতি তাকে একটি ঘরে আটকে রাখার নির্দেশ দিলেন। পাশাপাশি তার যুদ্ধে অংশগ্রহণেও আরোপ করলেন নিষেধাজ্ঞা। সেনাপতির এই সিদ্ধান্তে আবু মিহজান ﷺ এমন ভাবলেন না যে, যাক ভালোই হল, আমার আর যুদ্ধ করতে হবে না। আরামে ঘরে বসে থাকবো। না, তিনি এমনটি ভাবলেন না। বরং তিনি অনুধাবন করলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার অর্থ হল বহু নেকি ও আল্লাহর পথে জেহাদ করার সৌভাগ্য

থেকে বঞ্চিত হওয়া। যুদ্ধ শুরু হল। তিনি খুব ছটফট করছিলেন। কারণ, তাকে যে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে তিনি যুদ্ধের ঢংকা, অশ্বের হ্রেসা ধ্বনি, ধনুক থেকে তীর ছোঁড়ার শোঁ শোঁ শব্দ, বীর–বাহাদুরদের গগনবিদারী হুংকার, আঘাত পাল্টা আঘাতের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। রণক্ষেত্রের পূর্ণ চিত্র তার কল্পনায় ভেসে ওঠছিল। তিনি আবেগের আতিশয্যে বলতে লাগলেন–

كَفَى حُزْنًا اَنْ تَرْدِيَ الْخَيْلَ بِالْقَنَا * وَاُتْرَكُ مَشْدُوْدًا عَلَيَّ وِثَاقِيَا

اِذَا قُمْتُ عَنَّانِي الْحَدِيْدَ وَغُلِّقَتْ * مَصَارِيْعُ دُوْنِي تُصِمُّ الْمُنَادِيَا

এ দুশ্চিন্তাই আমার জন্য যথেষ্ট যে, আরোহীরা তীর চালাচ্ছে আর আমি শিকলে বন্দি অবস্থায় পড়ে আছি।

আমি দাঁড়াতে চাইলে শিকল আমাকে উঠতে দেয় না। দরজাও করে দেয়া হয় বন্ধ। আর চিৎকারকারী চিৎকার করতে করতে হয়ে যায় ক্লান্ত।

তিনি যখন এই কাব্যকথা বলছিলেন তখন ঘরের চারপাশে কেউ নেই। না কোনো বন্ধু, না কোনো শত্রু। তিনি চিৎকার শুরু করলেন, কেউ কি আছেন?

তখনকার দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীদেরকেও সাথে নিয়ো যাওয়া হতো। কারণ সে সময় যুদ্ধের জন্য মাসের পর মাস বাড়ির বাইরে থকতে হতো। তাই তার আওয়াজ শুনে সাদ رضي الله عنه-র স্ত্রী সালমা رضي الله عنها ছুটে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কিছু লাগবে?

আবু মিহজান বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে একটি তলোয়ার ও সাদ رضي الله عنه-র বালকা নামক ঘোড়াটা দিন। তিনি জানতেন, সাদ رضي الله عنه যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ, আসার পথে ঘোড়ার পা লম্বা হওয়ায় সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه-র উরুর চামড়া ছুলে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ক্ষত ভালো হওয়ার পূর্বে তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারবেন না। তাই তিনি বাড়ির ছাদে ওঠে যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার বালকা নামক ঘোড়াটি নিচে বাঁধা ছিল। অসুস্থতার কারণে সাদ رضي الله عنه যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও

মুশরেকদের ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা থেকে তিনি রক্ষা পাননি। তাদের একজন বলেছিল–

وَعَدْنَا وَقَدْ أَمَتْ نِسَاءُ كَثِيْرَةٌ * وَنِسْوَةُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ أَيِّمٌ

যুদ্ধের ময়দান থেকে আমরা যখন ফিরবো, ততক্ষণে অনেক নারীই হয়ে যাবে বিধবা।

কিন্তু সাদ ﷺ-র কোনো স্ত্রী বিধবা হবে না। (কেননা সে মৃত্যু ভয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি)।

আবু মিহজান বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি দুশমনের সাথে দুহাত করে নিজের আফসোস দূর করব। আল্লাহর কসম, জীবিত থাকলে ফিরে এসে নিজেই আবার বেড়ি পরে নেব। আর শহিদ হয়ে গেলে আমাকে আল্লাহর জন্যে মাফ করে দেবেন।

সালমা ﷺ-র ভয় হল। তিনি তার বেড়ি খুলে দিলেন। তাকে একটি তলোয়ার ও বালকা নাম ঘোড়াটি এগিয়ে দিলেন। এসব কিছুই সাদ ﷺ-র অজান্তে ঘটল। তিনি তখনও যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চলছেন।

আবু মিহজান বলকায় চড়ে বিদ্যুতের মতো যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলেন। বীর-বীক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি যেদিকেই যাচ্ছিলেন কাতারের পর কাতার উলট পালট করে দিচ্ছিলেন। শত্রুপক্ষের কারো ধনুক কেড়ে নিচ্ছিলেন, তা দিয়ে এক কাফের সেনাকে তীরবিদ্ধ করছিলেন।

সেনপতি সাদ ﷺ ওপর থেকে এ দৃশ্য দেখে হয়রান হচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, কে এই বাহাদুর? মনে মনে বলছিলেন, আক্রমনের রূপ তো আবু মিহজানের মতো। ঘোড়ার পদ সঞ্চালন আমার ঘোড়া বালকার মতো। কিন্তু আবু মিহজান তো বন্দি আর বালকাও তো নিচে বাঁধা!

বিকালে যুদ্ধ শেষে আবু মিহজান ফিরে এলেন। তার শরীর রক্তমাখা, জামা কাপড় ছেঁড়া-ফাটা। তিনি বালকা কে পূর্বের জায়গায় রেখে দিলেন। তারপর নিজের স্থানে গিয়ে বেড়ি পরে নিলেন।

সাদ ﷺ নিচে এসে বালকার দিকে তাকালেন। দেখলেন তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। তখন সালমা ﷺ তার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। সাদ ﷺ তখনই আবু মিহজান সাকাফিকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি এভাবে মুসলমানদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, আমি তাকে বন্দি করে রাখতে পারি না।

আবু মিহজান বললেন, তাহলে আল্লাহর শপথ, আমিও আজ থেকে মদ পান করব না।

আশ্চর্য হাদিয়া!

রাসুল ﷺ-র এক সাহাবি। নাম আবদুল্লাহ। তাকে হিমার (গাধা) বলে ডাকা হতো। সেকালে এ ধরণের নামকরণ দোষণীয় ছিল না। যেমন বর্তমানে দেখা যায় অনেকের পারিবারিক নাম সকর (বাজপাখি)। এটি আরবদের মাঝে বহুল ব্যবহৃত একটি প্রসিদ্ধ নাম। এর অর্থ এই নয় যে, সে মানুষ নয়, বাজপাখি। বরং উদ্দেশ্য হল, তার মধ্যে বাজপাখির মতো আত্মমর্যাদা ও গর্ববোধ রয়েছে।

তদ্রূপ দেখা যায়, বর্তমানে অনেকের নাম রাখা হয় আসাদ (সিংহ)। এর অর্থ এই নয় যে, সে সিংহের মতো হিংস্র। বরং উদ্দেশ্য হল, তার মধ্যে সিংহের ন্যায় বীরত্ব ও সাহসিকতার গুণাবলি রয়েছে।

সে যুগেও হিমার (গাধা) নামকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির ধৈর্য ও সহনশীলতাকে বোঝানো হতো। তো ওই সাহাবির মূল নাম ছিল আবদুল্লাহ। রাসুল ﷺ-র প্রতি ছিল তার নিখাঁদ ভালোবাসা। রাসুল ﷺ-কে কিছু হাদিয়া দেয়ার আশা তিনি দীর্ঘদিন ধরে মনের ভেতর লালন করছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে দিতে পারছিলেন না। একদিন তিনি বাজারে গেলেন। খুব পছন্দ করে রাসুল ﷺ-র জন্য একটি জিনিস কিনলেন। বিক্রেতাকে বললেন, তোমার দ্রব্যের মূল্য নিতে আমার সাথে চলো। বিক্রেতা তার পিছু পিছু চলল। তিনি তাকে নিয়ে রাসুল ﷺ-র বাড়ি গেলেন।
রাসুল ﷺ-র ঘরের দরজায় কড়া নাড়ালেন। দরাজা খোলার পর তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটা আপনার জন্য হাদিয়া।

রাসুল ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করলেন।

সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এবার আপনি এটির মূল্য পরিশোধ করে দিন।

রাসুল ﷺ বললেন, তুমি কি এটা আমাকে হাদিয়া দাও নি?

জি, এটা হাদিয়া। তবে আমার কাছে এটির মূল্য পরিশোধ করার মতো টাকা নেই। কিন্তু আমি আপনাকে কিছু হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। আজ দিলাম। দয়া করে আপনি এটির মূল্য পরিশোধ করে দিন।

রাসুল ﷺ বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

বস্তুত ওই সাহাবির সাথে রাসুল ﷺ-র চমৎকার সম্পর্ক ছিল। তিনিও রাসুল ﷺ-কে অনেক ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই সাহাবি শরাবের নেশায় আসক্ত ছিলেন। পুরনো অভ্যাস। সহজে ছাড়তে পারছিলেন না। প্রায়ই মদ পান করে বসতেন। তখন তাকে রাসুল ﷺ-র কাছে নিয়ে আসা হতো।

তিনি তাকে মদ পানের শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিতেন। এভাবে যতবারই সে অপরাধ করত ততবারই তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো। একদিন রাসুল ﷺ এর সামনেই তাকে বেত্রাঘাত করা হল। শাস্তি শেষে যখন তিনি বেরিয়ে যাবেন তখন এক সাহাবি বললেন, তোমার ওপর আরোপিত শাস্তির চেয়েও অধিক আল্লাহ ﷻ-র অভিসম্পাত হোক। রাসুল ﷺ সেই সাহাবিকে শুধরে দিয়ে বললেন, একে অভিসম্পাত দিয়ো না। আল্লাহর কসম, তুমি জানো না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কত ভালোবাসে।

আসলে এক্ষেত্রে রাসুল ﷺ সাহাবির ভালো গুণগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাই, পূর্ণ মুমিন বান্দার হাতে আল্লাহ ﷻ যেমন দীনের খেদমত নিয়ে থাকেন, তেমনি কখনও কখনও অবাধ্য-পাপীর হাতেও দীনের খেদমত নিয়ে থাকেন। কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করলে বাঁধা কীসে? হতে পারে তিনি বড় পাপ করেছেন। কিন্তু মসজিদ নির্মাণেও তো আল্লাহর নৈকট্য রয়েছে। হতে পারে, মসজিদ নির্মাণের

মতো এই মহৎ কর্মটি তাকে কবিরা গুনাহ থেকে ফিরিয়ে আনার ওসিলা হবে। হয়তো সে তওবা করে নেকের ফিরে আসবে। যে ব্যক্তি ঠিক মতো সালাত আদায় করে না, সে যদি অন্যকে সৎপথের দিকে ডাকে– তাহলে বাধা কীসে?

নবীরা ছাড়া পৃথিবীতে নিষ্পাপ কে আছে? কে আছে যার মাঝে কেবল ভালো গুণেরই সমাহার? মন্দের ছিটেফোঁটাও তাকে স্পর্শ করেনি কখনও? মানুষ যত বড় পাপীই হোক না কেন, আল্লাহ ﷻ-র এই বাণী তার ভুলে গেলে চলবে না। আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

> ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾
>
> আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে, উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।। [সুরা নাহল : ১২৫]

তিনি আরো বলেন–

> ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
>
> যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? [সূরা ফুসসিলাত : ৩৩]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সম্বোধন করেই এসব বলেছেন। আমরা যে যতই পাপী হই না কেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ–'র দায়িত্ব থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই।

শয়তান এটাই চায়

একদিন হাসান বসরি رحمه الله এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করেন?

লোকটি বলল, না।

তিনি জানতে চাইলেন, কেন করেন না?

লোকটি বলল, এ ভয়ে যে, আমার আশংকা হয় আমি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেব, কিন্তু নিজে সে অনুযায়ী নিজে আমল করতে পারব না। আমি মানুষকে অসৎ কাজ ছাড়তে বলব, কিন্তু নিজে অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ব।

হাসান বসরি ﷺ বললেন, আশ্চর্য! শয়তানও তো এটাই চায়– যেন আমরা এসব অর্থহীন যুক্তি দেখিয়ে দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকি। আচ্ছা বলো, আমাদের মাঝে কে আছে যে পাপ থেকে মুক্ত? তাই আমাদেরকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো আমার দাওয়াতে কেউ মুক্তির দিশা খুঁজে পাবে। হয়তো আমরাও খুঁজে পাবো পাপ থেকে মুক্তির পথ।

তাই শয়তানকে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে খেলার সুযোগ দেয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। যদি কেউ পতিতালয় কিংবা মদ্যশালা থেকে বের হয়ে কোনো অসহায়কে দান করে তাহলেও সে সাওয়াব পাবে। প্রশ্ন করতে পারো, আমি এইমাত্র ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। মদ পান করেছি। এরপরেও...

আরে ভাই, তোমাকে মনে রাখতে হবে পাপ ও পূণ্য দুটি আলাদা আলাদা বিষয়।

যে পাপ তুমি করেছ তার জন্য তোমাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। কিন্তু তোমার পাপের কারণে তোমার পূণ্যকে তিনি নষ্ট করবেন না।

রাসুল ﷺ যখন জিহাদে বের হতেন, তখন তিনি এ ঘোষণা দিতেন না যে, যারা গুনাহ থেকে পবিত্র কেবল তারাই আমাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অন্যকেউ পারবে না। তিনি কখনও এমনিটি বলেনটি। তাঁর সাথে যারা জিহাদে বের হতেন তারা কেউ নিষ্পাপ ফেরেশতা ছিলেন না। তারা সবাই আদম ﷺ-রই বংশধর ছিলেন। তাই তিনি বলতেন–

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ فَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

সকল আদম সন্তানই ভুল করে। তবে যারা ভুল করার পর তওবা করে তারাই উত্তম। [মুসনাদে অহমাদ : ১৩০৪৯]

সুতরাং, আমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে যাব। যখনই দেখব কেউ সালাত আদায় করছে না, তাকে বলব– ভাই, সালাত পরিত্যাগ করা অনেক বড় পাপের কাজ। রাসুল ﷺ বলেছেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

> ব্যক্তির ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত আদায় করা। [মুসনাদে আহমাদ : ১৫১৮৩]

অপর এক হাদিসে তিনি বলেছেন,

الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

> আমাদের ও তাদের মাঝে যে অঙ্গীকার তা হল সালাত। অতএব যে সালাত ত্যাগ করল, সে কুফরি করল। [নাসায়ি : ৪৬২]

তুমি যত বড় পাপীই হওনা কেন মানুষকে যত বেশি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, ততবেশি তোমার নিজের মাঝেও এই বোধ জাগ্রত হবে যে, আমার নিজেরও তো এর উপর আমল করা উচিত।

উপরে বর্ণিত ঘটনায় আমরা দেখেছি, আবু মিহজান সাকাফি যদিও ইসলামের একটি বিধান অমান্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি। একটি পাপে লিপ্ত হয়েছেন বলে অন্য নেক কাজের সুযোগ ছেড়ে দেননি। তিনি ভেবেছিলেন, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমি যখন মদ পান করেই ফেলেছি, তখন তাকে পুনরায় আমার আমার উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেব না। আমার সামনে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার যে সুযোগ এসেছে আমি তা হাতছাড়া করব না।

এভাবেই বিশ্বময় দীনের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। শয়তানকে পরাজিত করে যুগেযুগে দীনের বহু সাহায্যকারী এমনি দৃঢ়পদে দীনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

সাওয়াব লাভে অগ্রগামী হও

রাসুল ﷺ-র সাহাবীগণ জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভে সদা সচেষ্টা ছিলেন। রাসুল ﷺ-র কাছে জানতে চাওয়া তাদের প্রশ্নগুলোর দিকে তাকালে এর প্রমাণ মিলে। নবীজির কাছে কৃত তাদের বেশিরভাগ প্রশ্নই অগ্রাধিকারসূচক বিশেষণ– যেমন– সুন্দরতম কোনটি, বৃহত্তম কোনটি, শ্রেষ্ঠতম কোনটি ইত্যাদি শব্দদ্বারা শুরু হতো।

উদাহরণ-১. একবার এক সাহাবি রাসুল ﷺ-র কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ ﷻ-র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কি?

রাসুল ﷺ বললেন–

الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا

যথাসময়ে সালাত আদায় করা। [বোখারী : ৫৯৭০]

উদাহরণ-২. আরেক সাহাবি এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন আপনার সবচেয়ে কাছে কে অবস্থান করবে?

রাসুল ﷺ বললেন–

তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর সে আমার সর্বাধিক প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন সে আমার সবচেয় কাছে থাকবে। [বোখারী : ৬০৩৫]

উদাহরণ-৩. যুদ্ধ শুরুর আগ মুহূর্তে এক সাহাবি এসে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! বান্দার কোন কাজ দেখে আল্লাহ ﷻ অধিক খুশি হন?

রাসুল ﷺ বললেন, শত্রুদলের মাঝে বর্মহীন ঢুকে পড়া। [সহিহ ইবনু হাজাম]

উদাহরণ-৪. আরেক সাহাবি এসে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ ﷻ-র নিকট সর্বোত্তম আমল কোনটি?...

আহা! কত সাওয়াব ছুটে গেল

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه। একজন সম্মানীত সাহাবি। তিনি একদিন আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে রাসুল ﷺ-র একটি হাদিস শুনলেন। হাদিসটি হল–

রাসুল ﷺ বলেছেন–

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ

> যে ব্যক্তি জানাযায় শরিক হবে সে এক কিরাত (ওহুদ পাহাড় সমতুল্য) সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকবে সে দু কিরাত সাওয়াব লাভ করবে। [বোখারী : ১৩২৫]

এ হাদিস শুনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه আবু হুরায়রা رضي الله عنه-কে বললেন, আফসোস! তুমি এসব কী বলছ?

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসুল ﷺ-র থেকে এমনই শুনেছি।

হাদিসের মর্মার্থ হল– তুমি যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করো, তাহলে তোমার জন্য রয়েছে এক কিরাত সাওয়াব। আর যদি সালাতের পর তুমি জানাযার পিছু পিছু কবরস্থান পর্যন্ত যাও এবং দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকো, তাহলে তোমার জন্য রয়েছে দু কিরাত সাওয়াব।

নিঃসন্দেহ লাশ বহন, কবরস্থানে গমন, লাশকে কবরস্থ করণ ইত্যাদি সকল প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে উপদেশ। তাছাড়া এটি একটি মুসলমানের লাশ। তার দাফন কাজে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করা, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করা, তার পরিবারের লোকদের সান্ত্বনা দেয়া ইত্যাদি সমাজের লোকের কাছে তার অধিকারও বটে। তদুপরি এতে

অন্তর নরম হয়, হৃদয় বিগলিত হয়, সর্বোপরি নিজের জন্য শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি দু কিরাত সাওয়াব অর্জন হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ রাসুল ﷺ-র এই হাদিসটি এই প্রথম শুনলেন। তাই পাশে থাকা একজনকে বললেন, যাও, আম্মাজান আয়েশা ﵂-র কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। লোকটি যাওয়ার পর সে কি সংবাদ নিয়ে আসে তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এবং আনমনে একটি পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। ভাবছিলেন, আহা! হাদিসটি যদি সত্যি হয় তাহলে এত বছর যাবত কত সাওয়াব থেকেই না তিনি বঞ্চিত হলাম।

লোকটি এসে জানাল, আয়েশা ﵂ বলেছেন হাদিসটি সত্য। তিনিও রাসুল ﷺ থেকে এই হাদিস শুনেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ তখন পাথরটি মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন, হায়! কত কিরাত সাওয়াব আমার ছুটে গেল।

জামাত না ছুটে যদি আমার একটি সন্তান মারা যেতো

সায়িদ ইবনে আবদুল আযিয ﵀ জামাতে সালাত আদায়ের প্রতি সর্বদাই গুরুত্ব দিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন তার জামাত ছুটে গেল। তার বন্ধু ইবনে মারওয়ান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আল্লাহ তোমাকে উত্তম সান্ত্বনা দেবেন।

সায়িদ ইবনে আবদুল আযিয বললেন, জামাত না ছুটে যদি আমার একটি সন্তান মারা যেতো তাহলে আমি একশগুণ বেশি সান্ত্বনা পেতাম।

সুবহানাল্লাহ! তারা সন্তানের মৃত্যুর চেয়ে জামাতে সালাত ছুটে যাওয়াকে বড় মনে করতেন।

একই সালাত সাতাইশ বার

একবার এক বুযুর্গের এশার সালাতের জামাত ছুটে গেল। তিনি বলেন, আমি সাথে সাথে পাশের মসজিদে ছুটে গেলাম। দেখলাম সেখানেও জামাত শেষ। গেলাম আরেক মসজিদে। সেখানেও একই অবস্থা। এভাবে কয়েক মসজিদ ঘুরে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। আফসোস করতে লাগলাম, হায়! আমার জামাত কীভাবে ছুটে গেল? কীভাবে আমি সাতাশ গুণ বেশি ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলাম। অতঃপর আমি সে সালাত একাকি সাতাশ বার আদায় করলাম।

সুবহানাল্লাহ! একটি সাওয়াবের কাজ ছুটে যাওয়া তাদের কাছে কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তারা ভাবত না যে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মাঝে মাঝে জামাত ছুটতেই পারে। আমি তো প্রায়ই জামাতে সালাত আদায় করে থাকি। একদিন ছুটে গেলে কি হবে?

কিংবা কোনো দারিদ্রকে কিছু দান করে ভাবেনি যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো অনেক দান খয়রাত করি। না, তারা কখনই এমনটি বলেননি, ভাবেনও নি। বরং তারা তাদের কোনো নেক আমল ছুটে গেলে তারা যারপর নাই আফসোস করতেন। অন্য উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করতেন। বস্তুত তারা পার্থিব কোনো জিনিস হারানোর চেয়ে নেক আমল হারানোকে বড় জ্ঞান করতেন।

সেই বুযুর্গ বলেন, এই সালাত সাতাশ বার আদায় করার পর আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি, আমি একটি ঘোড়ায় বসে আছি। যারা আমার সাথে নিয়মিত মসজিদে সালাত আদায় করে তারাও ঘোড়ায় আরোহণ করে আছে। তাদের ঘোড়া আমার ঘোড়া থেকে দ্রুত এগিয়ে চলছে। আমি পেছন থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে তাদের ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। তখন তাদের একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, তুমি আমাদের নাগাল পাবে না। কেননা আমরা এশার সালাত জামাতে আদায় করেছি।

সেই ব্যক্তির মতো হয়ো না

রাসুল ﷺ সর্বদা সাহাবায়ে কেরামাকে নেকির কাজে আগ্রহী হওয়ার নির্দেশ দিতেন। কোনো নেক আমল ছুটে গেলে অনুতপ্ত হতে বলতেন। একবার তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه-কে ডেকে বললেন, আবদুল্লাহ, (তখন তিনি মাত্র পনের বছরের তরুণ) সেই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদে) অভ্যস্ত ছিল পরবর্তীতে তা ছেড়ে দিয়েছে। [বোখারী : ১১৫২]

ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস رضي الله عنه ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতিত সারা বছর রোযা রাখতেন। সারা রাত জেগে সালাত আদায় করতেন। প্রতিদিন এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তাই তিনি জনগণকে সময় দিতে পারতেন না।

একদিন রাসুল ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ! তুমি নাকি রাতভর সালাত আদায় করো?

তিনি বললেন, জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।

রাসুল ﷺ বললেন, রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অথবা অর্ধেক রাত সালাত আদায় করবে। রাসুল ﷺ তাকে আরো জিজ্ঞেস করলেন, শুনেছি তুমি দিনভর কুরআন তেলাওয়াত কর?

তিনি বললেন, জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ!

রাসুল ﷺ বললেন, না এমন করবে না। বরং প্রতিমাসে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করবে।

তিনি বললেন, আমি এরচেয়েও বেশি পারব।

রাসুল ﷺ বললেন, তাহলে প্রতি তিন দিনে এক খতম।

তিনি বললেন, আমি এরচেয়েও বেশি পারব।

রাসুল ﷺ বললেন,না, যে তিন দিনের কমে কুরআন খতম দেবে সে কোরআন বুঝবে না। আর সাওমের ব্যাপারে বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে।

তিনি বললেন, আমি এরচেয়েও বেশি পারব।

রাসুল ﷺ বললেন, তাহলে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করবে।

তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও বেশি পারব।

রাসুল ﷺ বললেন, তাহলে একদিন সওম রাখবে এবং একদিন ভাঙবে।

তিনি বললেনন, আমি এর চেয়েও বেশি পারব।

রাসুল ﷺ বললেন, এর চেয়ে বেশি সওম রাখা উত্তম নয়। এটি দাউদ عليه السلام-র সওম রাখার পদ্ধতি। তিনি একদিন সওম রাখতেন, একদিন রাখতেন না। [বোখারী : ১৯৭৭]

এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه ইবাদতের প্রতি গভীর আগ্রহ ও উদ্যমতা থাকা সত্ত্বেও এ পদ্ধতি মেনে ইবাদত করতেন।

একবার রাসুল ﷺ তাঁর পবিত্রা স্ত্রীদের নিয়ে হজ করেছিলেন। হজ চলাকালীন সময়ে একদিন রাসুল ﷺ আয়েশা رضي الله عنها-র ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, আয়েশা رضي الله عنها কাঁদছেন। রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন আয়েশা, তুমি কাঁদছ কেন?

তিনি আবারো কেঁদে ওঠলেন।

রাসুল ﷺ বললেন, তোমার কি ঋতুস্রাব হয়েছে? যে জন্যে তুমি ওমরা পূর্ণ করতে পারছ না?

তিনি বললেন, জি। আমার সাথীরা হজ ও ওমরা দুটোই পালন করে মদিনায় ফিরবে। আর আমি ফিরব শুধু হজ পালন করে। এটি কী করে হতে পারে?

উম্মে সালামা ﵂, হাফসা ﵂, যয়নব ﵂– তারা সবাই হজ ও ওমরা উভয়টিই পালন করেছেন। অথচ আমি শুধু হজ পালন করে ফিরব, ওমরা পালন করতে পারব না। এই বলে তিনি কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলেন। আয়েশা ﵂-র এই কান্না রাসুল ﷺ-কে আনন্দিত করল। কারণ, নেক আমলের প্রতি আগ্রহীদের তিনি অনেক ভালোবাসতেন। তিনি আয়েশা ﵂-র ভাই আবদুর রহমানকে আয়েশা ﵂-কে নিয়ে নিকটতম হিল তথা তানঈমে যেতে বললেন। তানঈম হল বর্তমানের মসজিদে আয়েশা ﵂। মক্কাবাসী এবং দ্বিতীয়বার ওমরা করতে আগ্রহীদের মিকাত এটি। অনেকে দূর থেকে ওমরা পালন করতে আসেন। তারা একবার ওমরা পালন করে নিজের মৃত বাবা-মায়ের জন্য ওমরা পালন করতে চাইলে ইহরাম বাঁধতে তানয়িমে যান। এখানেই রয়েছে সেই মসজিদ। আয়েশা ﵂ ও ভাইয়ের সাথে এখান থেকেই ইহরাম বেঁধেছিলেন। আজও এখান থেকে ইহরাম বাঁধার সময় মানুষের মনে আয়েশা ﵂-র সেই স্মৃতি ভেসে ওঠে।

যার মনের ভেতর আনুগত্যের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, ছোট্ট একটি নেক আমল ছুটে গেলেও যে আফসোস করে, সে অবশ্যই নেক আমলে সামর্থ্যবান হবে। যেমন সালাতে পূর্বের সুন্নত ছুটে গেলে সে তা পরে আদায় করে নিতে সচেষ্ট থাকবে।

উম্মে সালমা ﵂ বলেন, একদিন নবী করিম ﷺ আসরের সালাতের পর আমার ঘরে নফল সালাত পড়ছিলেন। আমি দেখে অবাক হলাম। এটা না সালাতের নিষিদ্ধ সময়? রাসুল ﷺ নিজেই এ সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আমি দাসীকে বললাম, রাসুল ﷺ-র পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! উম্মো সালমা বলেছেন, তিনি আপনার থেকে শুনেছেন এ সময়ে কোনো সালাত আদায় নিষেধ, তাহলে আপনি যে সালাত আদায় করছেন? যদি তিনি কোনো ইশারা করেন, তাহলে তুমি চলে আসবে।

দাসী রাসুল ﷺ-র পাশে দাঁড়িয়ে সেই কথাগুলো বলল। রাসুল ﷺ ইশারা করলেন। সে চলে এলো। সালাত শেষে তিনি বললেন, হে

উম্মে সালামা! আমার কাছে আবদে কায়সের প্রতিনিধি দল এসছিল, যে জন্যে আমি জোহরের সালাতের পরের দুরাকাত আদায় করতে পারিনি। সেটাই এখন পড়ে নিলাম। [বোখারী : ৩৫১০]

রাসুল ﷺ এমনই ছিলেন। তিনি যদি কখনও প্রাত্যহিক অজিফা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরের পর তিনি তা আদায় করে নিতেন।

আমাদেরও উচিত নেক আমলের সুযোগ হাতছাড়া হলে আফসোস করা। ব্যথিত হওয়া। হায়! আমি যথা সময়ে সালাত আদায় করতে পারলাম না। হায়! আমি উত্তম সময়ে ওমরা পালন করতে পারলাম না। আহা! দোআ কবুলের সময়ে আমি দোআ করতে পারলাম না। মসজিদ নির্মাণে আমি অংশগ্রহণ করতে পারলাম না।

আল্লাহ ﷻ-র নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে ঈমান, হেদায়াত ও তাওফিক দান করুন। যেখানেই থাকি আমাদের জন্য কল্যাণের ফয়সালা করুন।

আলেমদের মর্যাদা

আল্লাহ ﷻ আলেমদের সম্মানকে সমুন্নত করেছেন। পবিত্র কোরআনে তিনি আলেমদের সাক্ষ্যকে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের সাথে উল্লেখ করে বলেন–

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আলে ইমরান : ১৮]

অন্য আয়াতে বলেন—

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا﴾

> বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করে। [সূরা ফাতির : ২৮]

সুতরাং আলেমরা হচ্ছেন আল্লাহর সেসব নির্বাচিত বান্দা যাদের অন্তরে রয়েছে তাঁর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা। তাছাড়া জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও সেবায় তাদের মত অবদান অন্য কারো নেই।

'মিফতাহু দারিস সাআদাহ'— কিতাবে ইবনুল কাইয়িম ﷺ লিখেছেন—

প্রকৌশলী ছাড়াও মানুষ বাড়ি নির্মাণ করতে পারে। হ্যাঁ বর্তমানে প্রকৌশলীর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু তাদরে অবর্তমানে মানুষ নিজেরাই নিজস্ব চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গৃহ নির্মাণের সক্ষমতা রাখে।

এমনিভাবে ডাক্তার ছাড়াও মানুষ চলতে পারে। কারণ, অভিজ্ঞতা থেকেও সে বুঝতে পারে যে, তার জন্য কোন জিনিসটি ক্ষতিকর ও কোন জিনিসটি উপকারী। বুঝতে পারে ভালো-মন্দের ফারাক।

কিন্তু আলেমের বিষয়টি ভিন্ন। তিনি একজন শরীয়ত বিশেষজ্ঞ। মানুষের পক্ষে তার থেকে বিমুখ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, শরয়ী বিধি-বিধান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। এটি একমাত্র ঐশী বাণীর ধারক—নবীদের কাছে আসা ইলমের মাধ্যম অর্জিত হয়। তাইতো আল্লাহ ﷻ আলেমদেরকে বসিয়েছে সম্মান ও মর্যাদার আসনে। যা বহাল থাকবে পরকালেও। নবী করিম ﷺ বলেন—

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

> সাধারণ ইবাদতকারীর চেয়ে একজন আলেমের মর্যাদা তেমন, যেমন তারকারাজির চেয়ে চাঁদের মর্যাদা। [মুসনাদে আহমাদ : ২১৭১৫]

এ হাদিস থেকে আলেমদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি অনুমেয়।

প্রশ্নের মাঝেই রয়েছে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি

একবার সাহাবায়ে কেরাম কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। তাদের একজন প্রচন্ড আহত ছিলেন। তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। সেই আহত সাহাবি ঘুমিয়ে পড়লে তার ওপর জানাবাতের গোসল ফরয হয়ে যায়। ঘুম থেকে ওঠে তিনি সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো আহত। আমার জন্য গোসল ছাড়া সালাত আদায়ের কোনো সুযোগ আছে কি?

সাথীরা বলল, না, এ অবস্থায় গোসল ছাড়া সালাত আদায়ের কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বললেন, কিন্তু আমি তো মাথায় আঘাত পেয়েছি। সেখানে পানি লাগলে ক্ষতি হতে পারে। সাথীর বলল, না, আমরা তোমার গোসল না করে সালাত আদায়ের কোনো উপায় দেখছি না। অগত্যা সে গোসল করে সালাত আদায় করল। এতে তার অসুস্থতা বেড়ে গেল। অবশেষে সে মারা গেল।

রাসুল ﷺ এ ঘটনা শোনার পর বললেন, সে যদি গোসল করার কারণে মৃত্যুবরণ করে থাকে, তাহলে তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন তাদেরকেও হত্যা করেন। তারা কেন এ ব্যাপারে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করল না? কারণ, অজ্ঞতার প্রতিকারই হচ্ছে জানতে চাওয়া। অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন, দু হাত দ্বারা পবিত্র মাটিতে আঘাত করে উভয় হাত মাসেহ ও সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করলেই তার জন্য যথেষ্ট হতো। আর জখমের ওপর ব্যন্ডেজ বেঁধে তার ওপর মাসেহ করে নিলেই হতো। [বোখারী :

উযির ইবনে হুবাইরা ﵀ একজন মন্ত্রী ছিলেন। ছিলেন সম্পদশালী ও সম্মানিত। তার বাড়িতে প্রায়ই ধর্মীয় বিষয়ে আলেমদের বিতর্কমজলিস হতো।

একদিন আসরের পর তিনি আলেমদের সাথে বসে আছেন। সেখানে মালেকি মাযহাবের একজন ফকিহ ছিলেন। একটি মাসআলা নিয়ে

উপস্থিত আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, মাসআলাটি এমন হবে; তবে উত্তম হল এটি।

কিন্তু মালেকি মাযহাবেরর ফকিহ বললেন, না, এক্ষেত্রে উত্তম হল ওটি। সকল আলেমের মতের বিপরীতে তার মত দেখে উযির ইবনে হুবাইরাহ অবাক হলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে তার সাথে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। তাকে বোঝালেন, ভাই সকল আলেমের মতের বিপরীতে আপনি মত দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি তার মতের উপর অটল থাকলেন। বললেন, আমার মতটিই সঠিক।

ইবনে হুবাইরাহ রেগে গিয়ে বলরেন, আপনি কি গাধা?

একথা শুনে মালেকি মাযহাবের সেই ফকিহ চুপ হয়ে গেলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর ইবনে হুবাইরাহ তার কথার জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হলেন। একজন আলেমকে আমি গাধা বললাম– এই ভেবে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। দুশ্চিন্তায় সে রাতে তিনি ঘুমাতে পারলেন না।

বস্তুত আলেমগণ ইলম অন্বেষণে তাদের হাঁটু গেঁড়ে বসেছেন। পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছেন। সুন্নতে নববী সংকলন, লিখন ও সংরক্ষণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই সৌভাগ্যবান লোকগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাঁর দীন সংরক্ষণ করে থাকেন। তাই, এরা সম্মান পাওয়ার দাবিদার। অথচ বর্তমানে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তাদের চরিত্রকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আসলে যারা এমনটি করছে, তারা মূলত দীনেরই ক্ষতি করছে।

ইবনে হুবাইরাহ'র সারাটি রাত বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও পেরেশানির মধ্য দিয়ে কাটল। পরদিন সকালে যখন আবার আলেমগণ তার বাড়িতে সমবেত হলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সেই আলেমকে সম্মান জানালেন। তার মাথায় চুমু খেলেন। অতঃপর সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, উপস্থিত সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম! গতকাল আমার মুখ ফসকে একটি মন্দ কথা বেরিয়ে পড়েছিল। আল্লাহর কসম, এটি আমাকে এতোটাই পীড়া দিয়েছিল যে, অনুশোচনার আগুনে জ্বলে আমি সারা রাতঘুমাতে পারিনি।

হে ভাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

আলেম লোকটি বলল, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।

না, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।

সত্যিই ক্ষমা করে দিয়েছি।

ভাই, আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন।

না, আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্যি করে বলুন আপনার কোনো ঋণ আছে কি না?

যেহেতু আপনি আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন তাই বলছি, হ্যাঁ, আমার ঋণ আছে।

কত?

আমাকে মাফ করুন।

আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আপনার ঋণ কতো?

একশ দিনার।

এই নিন একশ দিনার। আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে এটা আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য দিলাম। আর এ নিন আরো একশ দিনার। এটা হল গতরাতের কটুকথার বিনিময়ে।

দেখো, ইনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাঁধা দিতেন। তিনি চাইলে ওই ফকিহকে হত্যার হুকুমও দিতে পারতেন। কিন্তু তার অন্তরে ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত ছিল।

আলেমের আত্মমর্যাদাবোধ

শায়খ সাঈদ হালাবি নামের এক বড় আলেম ছিলেন। মানুষ তাকে অনেক শ্রদ্ধা করত। তিনি তার যুগের খলিফার চাটুকারী ছিলেন না। ছিলেন না মুখাপেক্ষিও। কারণ, কোনো আলেম যদি শাসকের প্রতি মুখাপেক্ষি হন, শাসকের কাছ থেকে উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করেন, শাসকশ্রেণির সাথে তার দহরম মহরম সম্পর্ক থাকে, তাহলে শাসকের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুধ্বে তিনি কথা বলতে পারবেন না। উল্টো তার পক্ষপাতিত্ব করবেন। কিন্তু কোনো আলেম যদি শাসকশ্রেণি থেকে পুরোপুরি অমুখাপেক্ষি থাকেন, তাহলে তার প্রতিটি বক্তব্য ও ফতোয়া এক আল্লাহর জন্য হবে।

সাঈদ হালাবি ছিলেন এমনই শাসক বিমুখ একজন আলেম। বিচারকের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে একবার খলিফা তার জন্য কিছু হাদিয়া পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে নির্ধারিত বেতন ব্যতিত আমি কিছুই গ্রহণ করব না।

খলিফা বললেন, এটা হাদিয়া হিসেবে এটা গ্রহণ করুন।

তিনি বললেন, আপনি যদি আমাকে হাদিয়া দিতে চান, তাহলে বিচারকের দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যহতি দিন।

খলিফা বললেন, না; আমি আমার হাদিয়া ফেরত নিচ্ছি। তবুও আপনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করুন।

সাঈদ হালাবি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আলেম ছিলেন। পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিনের কথা। তিনি মসজিদে বসে ছাত্রদের কাছে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তার দুপায়ে কিছুটা ব্যথা ছিল। তাই তিনি পা দুটি বিছিয়ে দিয়েই ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছিলেন। এসময় ইবরাহিম পাশা ইবনে মুহাম্মাদ আলি মসজিদ প্রদর্শনে এলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও প্রচন্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি। তাই সবাই তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে মুসাফাহা করল। কপালে চুমু খেল। দরসের কাছাকাছি আসার পরও সাঈদ

হালাবি তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। কয়েকজন ছাত্র তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। কিন্তু সাঈদ হালাবি আগের মতোই দু পা প্রসারিত করে হাদিস বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। তিনি খলিফার জন্য হাদিস বর্ণনা বন্ধ করে দাঁড়ালেন না। লোকটিও সাঈদ হালাবির সাথে সালাম কিংবা কুশল বিনিময় করলেন না। মসজিদ প্রদর্শন শেষে ইবরাহিম পাশা মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, পা প্রসারিত করে বসে থাকা এই শায়খ কে?

উপস্থিত সবাই বলল, আমরা তাকে চিনি না।

তখন ইবরাহিম পাশা এক লোকের হাতে এক হাজার দিনার দিয়ে বললেন, এ দিনারগুলো শায়খকে দিয়ে আসুন।

লোকটি সাঈদ হালাবির কাছে গিয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম, শায়খ! এই এক হাজার দিনার আপনার জন্য হাদিয়া।

তখনকার সময় এ পরিমাণ টাকার দিয়ে অনায়াসে কোনো ব্যক্তির প্রায় বিশ বছরের ভরণ পোষণ চলে যেত।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ হাদিয়া কে দিয়েছে?

লোকটি বলল, ইবরাহিম পাশা।

তিনি বললেন, যাও, তার হাদিয়া তাকে ফেরত দিয়ে বল, যে তার দু পা প্রসারিত করেছেন, সে তার দু হাত প্রসারিত করবে না।

এর কারণ হল, মূলত যারা কারো কাছে হাত বিছায়, তাদের পা বিছানোর ক্ষমতা থাকে না। যে আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে তিনি জীবন যাপন করছেন, কারো অনুগ্রহ গ্রহণ করলে তা আর থাকবে না।

যেমন বলা হয়, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। তাহলে তাদের অন্তর তোমার প্রতি ঝুঁকে যাবে। অনুগ্রহ কত মানুষকে দাস বানিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ইলম সবার কাছে নেই

বাদশাহ হারুনুর রশিদ। জগদ্বিখ্যাত শাসক। একবার তিনি হজে গেলেন। সেখানে তার হজ সংক্রান্ত একটি মাসআলা জানার প্রয়োজন পড়ল। তিনি কয়েকজন আলেমকে সেটি জিজ্ঞেস করলেন। তারা কেউ সমাধান দিতে পারল না। সবাই বলল, আতা ইবনে আবি রাবাহ ব্যতিত এই মাসআলার সমাধান কেউ দিতে পারবে না।

বাদশাহ তাকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। আতা ইবনে আবি রাবাহ ছিলেন এক নিগ্রো গোলাম। গায়ের রঙ ছিল কুচকুচে কালো। নাক ছিল চেপ্টা। হাঁটতেন খুঁড়িয়ে। বাদশাহর দূত তার কাছে পৌঁছল। তিনি তখন একটি ইলমের মজলিশে বসা। যেখানে উপস্থিত সবাই বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের সমাধানের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসে হাজির হয়েছিলেন। তাদের কেউ কাজিখিস্তান থেকে, কেউ আফ্রিকা থেকে, কেউ ইয়েমেন থেকে, কেউ ইরাক থেকে, কেউ সিরিয়া থেকে এসে এখানে জড়ো হয়েছিলেন। তাই তিনি বাদশাহর দূতকে বললেন, এতগুলো মানুষকে এখানে রেখে আমি খলিফার কাছে কিভাবে যাই? তাছাড়া তারা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে। আমি চলে গেলে তাদের প্রশ্নের জবাব কে দেবে? তাই আপনি খলিফাকে গিয়ে বলুন, আমি ব্যস্ত আছি। আর এটাও বলবেন যে, ইলম এমন এক সম্পদ যার কাছে সবাই যায়। সে কারো কাছে যায় না। ইলমের অন্বেষণকারী ইলমকে খুঁজে বেড়ায়। ইলম নিজে কাউকে খোঁজে না।

দূত গিয়ে খলিফাকে তার কথাগুলো শোনাল। খলিফা তার দুই সন্তান– আমিন ও মামুন কে নিয়ে আতা ইবনে আবি রাবাহের কাছে গেলেন। খলিফাকে দেখে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো ভয়ে জায়গা করে দিল। এ দৃশ্য দেখে আতা ইবনে আবি রাবাহ ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন, সবাই আমরা এখানে হজের মাসআলা জানতে এসেছি। আল্লাহ ﷻ-র কাছে আমরা সবাই সমান।

খলিফা এসে সালাম দিয়ে বললেন, শায়খ, আমার একটি মাসআলা জানার ছিল। আতা ইবনে আবি রাবাহ খলিফাকে বললেন, দয়া করে লাইনে দাঁড়ান। আল্লাহ ﷻ-র কাছে আমরা সবাই সমান।

খলিফা তার দু সন্তানকে নিয়ে লাইনে দাঁড়ালেন। যথাসময়ে তার পালা এলে তিনি তার প্রশ্ন বললেন। আতা ইবনে আবি রাবাহ উত্তর দিলেন এবং তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করলেন।

খলিফা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেরার সময় সন্তানদেরকে বললেন, প্রিয় বৎস, ইলম অর্জন কর। আল্লাহর কসম, এই নিগ্রো গোলাম ব্যতিত আমি জীবনে কোনো জায়গায় অপমানিত ও লজ্জিত হইনি। আজ তার নিকট আমার লজ্জিত হওয়ার কারণ হল, তার কাছে এমন জিনিস আছে, যা আর কারো কাছে নেই। অথচ দেখো, আমার কাছে আছে কেবল পদবি ও সম্পদ। সম্পদ তো অনেকের কাছেই আছে। কিন্তু ইলম সবার কাছে নেই।

দুর্ভাগারাই আলেমদের নিয়ে কটুক্তি করে

তারা আলেমদেরকে মর্যাদা বুঝতেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে কিছু দুর্ভাগা শ্রেণি আলেমদের নিয়ে নানা রকমের ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাসি ঠাট্টা করে থাকে। কিছু হলুদ মিডিয়া প্রায়ই আলেমদেরকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করে। শুধু তাই নয় যারাই দীনের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের নিয়ে তারা উপহাস করার স্পর্ধা দেখায়। তাদের দেয়া ফতোয়া নিয়ে তামাশা করে। ইন্টারনেটে কিছু ব্লগ ও ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত আলেমদের বিশোদাগারে ব্যস্ত থাকে। কিছু টিভি চ্যানেলও একই কাজ করে।

অথচ এ ঘৃণ্য কাজগুলো শরয়িত ও রাষ্ট্র উভয় আইনেই অবৈধ। আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরী। তাদের নিয়ে বিদ্রূপ-উপহাস কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিশেষ করে কোনো মুসলমান এমন কাজ কখনও করতে পারে না।

হ্যাঁ, আলেম থেকে যদি কোনো বিচ্যুতি প্রকাশ পায় তাহলে পূর্ণ আদব বজায় রেখে ভদ্র ভাষায় তাকে সরাসরি সেকথা বলা যেতে পারে। জানানো যেতে পারে চিঠির মাধমেও। কিংবা চাইলে তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে যথাযথ সম্মান বজায় রেখে শালীন ভাষায় পত্র-পত্রিকায় লেখা যেতে পারে। কিন্তু এমন কিছু লেখা যাবে না, যা

আলেমদের সম্মানে আঘাত হানে কিংবা দীনকে ছোট করে দেয়। আল্লাহ ﷻ স্বয়ং আলেমের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। সেই মর্যাদাকে হেয় করার অধিকার কারও নেই।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে আলেমদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা পোষণ করার তাওফিক দান করুন। একই সাথে আমাদেরকেও প্রকৃত আলেম হিসেবে কবুল করুন।

ইমাম আবু হানিফা ﷺ ও তার শিষ্যের গল্প

যোগ্য উত্তরসূরী কিংবা প্রতিনিধি রেখে যেতে কে না চায়? আলেম চান তার প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য আলেম গড়ে যেতে, যিনি হবেন তার যোগ্য উত্তরসূরী। তেমনি পদার্থ, রসায়ন, কিংবা জীববিজ্ঞানীও চান, স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিনিধি তৈরি করে যেতে। এ ক্ষেত্রে সেই উত্তরসূরী কিংবা প্রতিনিধি যদি হন মেধাবী, সুযোগ্য, সচ্চরিত্রবান, দীনদার ও বিনম্র, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

ইমাম আবু হানিফা ﷺ (৮০-১৫০ হি.)। বিশ্বসেরা ফকিহ। মুসলিম উম্মাহর গর্ব। সাহাবায়ে কেরামের সান্নিধ্য ধন্য মহান তাবেঈ। বিশ্বময় মানিত অবিসংবাদিত ইমাম। শাফেয়ি মাযহাবের প্রধান ইমাম শাফেয়ি ﷺ তার সম্পর্কে বলেছিলেন–

‘ফিকহের ক্ষেত্রে আমারা সবাই ইমাম আবু হানিফা ﷺ-র পরিবারের অন্তর্ভূক্ত।’

আশ্চর্য প্রশ্ন!

ইমাম আবু হানিফা ﷺ মসজিদে বসে দরস দিতেন। সেখানে উপস্থিত থাকত দূর-দূরান্ত থেকে আসা শত শত ছাত্র। এদের মধ্যে

দশ-বারো বছরের ছোট্ট একটি বালকও ছিল। সে মাঝে মাঝে দরসে হাজির হতো। সাধারণত কোনো প্রশ্ন করত না। তবে মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন করত, যা থেকে তার উন্নত মেধার পরিচয় মিলত।

প্রশ্নের ব্যাপারটা এমনই। কিছু প্রশ্ন ব্যক্তির মেধার আলো ছড়ায়। আর কিছু প্রশ্ন ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে।

একবারের কথা। ইমাম আবু হানিফা ﷀ দরস দিচ্ছেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে দরসে বসল। তার চেহারায় ছিল ব্যক্তিত্বের ছাপ। গায়ে ছিল মূল্যবান পোশাক। পায়ে ব্যথা অনুভব করায় ইমাম আবু হানিফা ﷀ তার পা দুটি ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিলেন। লোকটিকে দেখে তার সম্মানে তিনি পা দুটি খানিকটা গুটিয়ে নিলেন। ইমাম আবু হানিফা ﷀ লোকটিকে চিনতেন না। ভাবলেন লোকটি হয়তো আলেম হবেন।

দরস শেষে তিনি প্রতিদিনের মতো ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন– তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

সেই লোকটি বলল, হুজুর, আমার একটা প্রশ্ন আছে।

জি বলুন, কি প্রশ্ন?

হুজুর, রমযান মাস এলে আমরা কী করব?

আমরা সওম রাখব।

আর হজের মওসুম এলে?

হজের মওসুম এলে আমরা হজ পালন করব।

যদি সওম ও হজ একসাথে আসে তাহলে আমরা কী করব?

এ প্রশ্ন শুনে আবু হানিফা ﷀ মনে মনে বললেন, এখন আবু হানিফার পা প্রসারিত করার সময় হয়েছে। রমযান আর হজ একসাথে কী করে আসতে পারে? হজ ও রমযান দুটি দু মাসে হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানিফা ﷀ বুঝতে পারলেন, তিনি এর বাহ্যিক গাম্ভীর্য দেখে অযথাই প্রয়োজনের অধিক সম্মান দেখিয়েছেন।

কিন্তু সেই বালকটি এমন ছিল না। তার প্রশ্নগুলো হতো অর্থবহ। তাৎপর্যপূর্ণ। বালকটির নাম ছিল আবু ইউসুফ। বালকটি ইমাম আবু হানিফা ﵀-র বিশেষ দৃষ্টিতে চলে এলো। কিন্তু তিনি দেখলেন, বালকটি প্রায়ই দরসে অনুপস্থিত থাকছে। একদিন তিনি তাকে দাঁড় করালেন। বললেন, বাবা, তুমি প্রায়ই দরসে অনুপস্থিত থাকো কেন?

বালকটি বলল, আমি খুবই গরিব ঘরের সন্তান। সংসারের খরচ যোগাতে আমাকে বাজারে কুলির কাজ করতে হয়।

আবু হানিফা ﵀ বললেন, বাবা! তুমি ইলম অর্জন করো। আল্লাহ তাআলা তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।

উস্তাদের উপদেশ মেনে বালকটি ইলম অর্জনে মনোযোগী হল। কিন্তু তার পিতা তার ইলম অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তিনি মসজিদে এসে তাকে জোর করে সেখান থেকে নিয়ে যেতে চাইলেন। আবু হানিফা ﵀ তার পিতাকে বললেন, আপনি কেন আপনার ছেলেকে ইলম শিখতে দিচ্ছেন না?

তিনি বললেন, হুজুর! আপনার রুটি প্রস্তুত। আমাদের কষ্ট আপনি কি বুঝবেন? আমরা গরিব মানুষ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা নির্বাহ করি। সে কাজ করে আমাকে সহযোগিতা করে।

ইমাম আবু হানিফা ﵀ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলে প্রতিদিন কত টাকা উপার্জন করে?

সে প্রতিদিন দু দিরহাম উপার্জন করে।

বেশ, তাকে আমার কাছে রেখে যান। আমি তাকে প্রতিদিন দু দিরহাম দেব।

ইমাম আবু ইউসুফের পিতা এ শর্তে রাজি হল। আবু হানিফা ﵀ তাকে বললেন, শুনে রাখুন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আপনার সন্তানকে এমন ইলম শিক্ষা দেব, যদি সে তা আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে খলিফার সাথে দামি গালিচায় বসে বাদাম মিশ্রিত

ফালুদা খাবে। (এটি তৎকালীন একটি মূল্যবান খাবার; যা সাধরণত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা খেয়ে থাকতেন।)

আবু ইউসুফের পিতা অবজ্ঞার সুরে বললেন, আমার ছেলে খাবে বাদাম মিশ্রিত ফালুদা? সে বসবে খলিফার সাথে?

হ্যাঁ।

সেদিন থেকে ইমাম আবু হানিফা রহ. বালক আবু ইউসুফকে প্রতিদিন দু দিরহাম করে দিতেন।

দেখতে দেখতে আবু ইউসুফ রহ. বড় হয়ে গেলেন। তিনি এখন অনেক ইলমে ঋদ্ধ। বুদ্ধিতে পরিপক্ক।

হঠাৎ একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে তার রোগ তীব্র থেকে তীব্রতর হল। প্রিয় শিষ্যকে দেখতে ইমাম আবু হানিফা রহ. তার বাড়ি গেলেন। দেখলেন তিনি খুবই অসুস্থ। একেবারে মুমূর্ষ অবস্থা। এমনকি শেষ অবস্থার ব্যক্তির মতো তাকে কিবলামুখি করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। প্রিয় ছাত্রের এ অবস্থা ইমাম সাহেবকে বিচলিত করে তুলল। তিনি তার জন্য দোআ করলেন। বললেন, আহা! আমি তো আশা করেছিলাম, আমার পর তুমিই উম্মাহকে পথ দেখাবে। এখন তো দেখছি আমার আগে তুমিই চলে যাচ্ছ।

তারপর ইমামর আবু হানিফা রহ. ফিরে এলেন। এর কিছুদিন পর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সুস্থ হয়ে ওঠলেন। তিনি তার নিজের ব্যাপারে আপন গুরু ইমাম আবু হানিফার সুউচ্চ মন্তব্যটি শুনেছিলেন। তাই তিনি মনে করলেন গুরুর কাছে আমার শিক্ষা অনেকটাই পূর্ণতা পেয়েছে। এমন ভাবনা থেকেই তিনি ভিন্ন একটি জায়গায় নিজেই ছাত্রদের পাঠদান শুরু করলেন। কিছুদিন পর ইমাম আবু হানিফা রহ. জানতে পারলেন প্রিয় শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ভিন্ন একটি জায়গায় স্বতন্ত্র দরস বা শিক্ষাদান করছেন। তখন তিনি প্রিয় ছাত্রকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন দিয়ে এক ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠালেন। এ প্রশ্ন ও উত্তর থেকেই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সুক্ষ্মদর্শিতার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, আবু ইউসুফকে জিজ্ঞেস

করবে, এক ব্যক্তি একটি জামা কিনল। জামাটি তার একটু বড় হতো। তাই তিনি জামাটি ছোট করে দেয়ার জন্য এক দর্জির কাছে দিলেন। ঘটনাক্রমে জামাটি দর্জির পছন্দ হয়ে গেল। কিছুদিন পর দিন পর তিনি জামা আনতে গেলেন। দর্জি অস্বীকার করে বলল আপনি আমাকে কোন জামা দেননি। তখন জামার মালিক পুলিশের শরণাপন্ন হয়ে বিষয়টি পুলিশকে জানালেন। পুলিশ দর্জির দোকানে অভিযান চালিয়ে জামাটি উদ্ধার করল। এবং তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দিল। তারপর দর্জিটি জামার মালিককে বলল, তোমার জামা তো আমি ছোট করেছি। হয়তো তোমাকে যথাসময়ে দিইনি। কিন্তু ছোট তো করেছি। এখন আমার মজুরি দাও। এখন প্রশ্ন হল, এ দর্জি কি জামা ছোট করার মজুরি পাবে?

ইমাম আবু হানিফা ﷺ ওই ব্যক্তিকে বলে দিলেন, যদি আবু ইউসুফ (কোনো ব্যখ্যা ছাড়া) বলে, হ্যাঁ। তাহলে বলবে, আপনার উত্তর হয়নি। আর যদি (কোনো ব্যখ্যা ছাড়া) বলে, না। তাহলেও বলবে আপনার উত্তর হয়নি।

লোকটি যথারীতি ইমাম আবু ইউসুফের কাছে গিয়ে হুবহু প্রশ্নটি করল।

তিনি বললেন, হ্যাঁ., পাবে।

লোকটি বলল, আপনার জবাব হয়নি।

এবার তিনি বললেন, না পাবে না।

লোকটি বলল, আপনার জবাব হয়নি।

আবু ইউসুফ ﷺ ধরে ফেললেন, এটি অবশ্যই তার গুরুর কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইমাম আবু হানিফা ﷺ-র কাছে গেলেন। বললেন, আমার ব্যাপারে আপরনার সুউচ্চ মন্তব্যের কারণেই আমি স্বতন্ত্রভাবে দরস শুরু করেছি। এখন আপনিই বলে দিন প্রশ্নটির সমাধান। আমি অপারগ।

ইমাম আবু হানিফা বললেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখতে হবে দর্জি জামাটি ছোট করে কার মাপে কেটেছে? যদি সে তার নিজের মাপে কেটে

থাকে তাহলে সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। আর যদি জামার মালিকের মাপে কেটে থাকে তাহলে পারিশ্রমিক পাবে।

আবু ইউসুফ ﵀ মাসআলাটির সমাধান পেলেন। এরপর থেকে ইমাম আবু হানিফা ﵀-র মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার দরসে বসতেন। পরবর্তীতে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

উস্তাদের কথাই সত্য হল

একদিনের কথা। আবু ইউসুফ ﵀ খলিফার দরবারে বসা। চারিদিকে সম্মানী লোকদের উপস্থিতি। খলিফা অনুচর ও সেবক বেষ্টিত অবস্থায় তার নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। উপস্থিত লোকদের মাঝে বিচারক ও আলেমগণও রয়েছেন। সবাই খলিফার অনুগ্রহ প্রার্থী। আবু ইউসুফ ﵀ তখন প্রধান বিচারক। সকলের জন্য খাবার আনা হল। খলিফার জন্য আনা হল বিশেষ খাবার— বাদাম মিশ্রিত ফালুদা। খলিফার সামনে সেটি রাখা হলে তিনি সেবককে বললেন, প্রথমে শায়খকে দাও।

সেবদ বাদাম মিশ্রিত ফালুদার পেয়ালাটি আবু ইউসুফ ﵀-র সামনে রাখল। তিনি তার সামনে এই বিশেষ খাবারটি দেখে হাসতে লাগলেন।

খলিফা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার শায়খ, আপনি হাসছেন কেন?

আবু ইউসুফ ﵀ বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার এ হাসির কারণ অন্যকিছু নয়। আসলে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেছে। আমার শায়খ ইমাম আবু হানিফা ﵀ আমার পিতাকে বলেছিলেন, আমি আপনার ছেলেকে এমন ইলম শিক্ষা দেবো, যদি সে তা আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে খলিফার সাথে দামি গালিচায় বসে বাদাম মিশ্রিত ফালুদা খাবে। আমার পিতার তখন সে কথা বিশ্বাস হয়নি। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, সত্যিই আল্লাহ ﷻ ইলম দ্বারা আমার মর্যাদা কত উঁচু করেছেন। আমি আজ খলিফার সাথে দামি গালিচায় বসে সম্মানী লোকদের সাথে বসে বাদাম মিশ্রিত ফালুদা খাচ্ছি। সত্যিই, আল্লাহ ﷻ ঈমানদার ও আলেমদের মর্যাদা সুউচ্চ করে দেন।

চলো ঘুরে আসি আন্দালুস থেকে

চলো আন্দালুস থেকে ঘুরে আসি কিছুক্ষণ। কল্পনায় চলে যাই হাজার বছর আগের প্রাচীন শহরে। সেখান থেকে মক্কা হয়ে যাব বাগদাদে। আন্দালুসে দেখব ঘরে ঘরে চলছে ইলমের চর্চা। মসজিদগুলোর এখানে ওখানে বসেছে ইলমের মজলিশ। আলোর ফেরিওয়ালা আলেমগণ ব্যস্ত পাঠদানে। ছাত্ররা কিতাব হাতে ছুটোছুটি করছে। তারা ব্যস্ত ইলম অন্বেষণে।

তারপর যখন মক্কায় পৌঁছব, দেখব সেখানে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আসা হাজিগণ জড়ো হয়েছেন। তারা ভক্তিভরে উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করছেন– লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারীকা লাকা।

এখন যে গল্পটি বলব সেটি এক ইলম অন্বেষীর। ইলমের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক মহামানবের। নাম তার নাকি ইবনে মাখলাদ। তৎকালিন শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﷺ-র সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি আন্দালুস থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা হয়ে মক্কায় পৌঁছেন। সেখান থেকে নিরাশ হয়ে চলে যান বাগদাদে। সেখানে গিয়ে শোনেন, ইমাম আহমদ রহ. কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত রয়েছেন।

কোরআন আল্লাহ ﷻ-র কালাম। এটি তাঁর সিফাত তথা গুণ। এটি সৃষ্ট নয়– একথার প্রবক্তা তিনি। এই অপরাধে খলিফার মুতাসিম বিল্লাহ তাকে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি করে রেখেছেন।

পুরো ঘটনাটি খুলে বলি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾

আর মোশরেকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্যে যে, এরা জ্ঞান রাখে না। [সুরা তাওবা : ৬]

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। [সূরা নিসা : ১৬৪]

তাই কোরআন যে আল্লাহ ﷻ-র কালাম সেটি প্রমাণিত সত্য। এটি তিনি আমাদের নবীজির মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কিছু লোক একথা মানতে চায় না। তাদের মতে আল্লাহ ﷻ-র অন্যান্য সৃষ্টির মতো কোরআনও একটি সৃষ্টি। ইমাম আহমদ رحمه الله-র অভিমত এর বিপরীত। তার মতে কোরআন সাধারণ সৃষ্টি মত সৃষ্টি নয়। কোরআন হল আল্লাহ ﷻ-র কালাম। তাঁর সিফাত তথা গুণ। তাই তাঁর অন্যান্য গুণাবলির মতো এটিও অনাদি, অবিনশ্বর।

তার এই অভিমত খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর কানে পৌঁছল। আহমদ ইবনে আবি দুআদ নামে খলিফার এক দুষ্ট মন্ত্রী ছিল। ইমাম আহমদ رحمه الله-র এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত– বলে সে খলিফাকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। ফলে খলিফা ইমাম আহমদ رحمه الله-কে ডেকে এনে তার ওপর অত্যাচার শুরু করল। তাকে কারাগারে বন্দি করে রাখল। প্রতিদিন সে ইমামকে তার এই মতবাদ থেকে ফিরে আসার জন্য নিপীড়ন করতে লাগল।

আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করুন, নিপীড়নের ধরণ এমন ছিল যে, খলিফা মুতাসিম প্রতিদিন জল্লাদ নিয়ে জেলখানায় যেত। জল্লাদকে বলত, তাকে যে চাবুক দিয়ে মারবে সেটি আমাকে দেখাও। জল্লাদ দেখাতো। খলিফা সেটির প্রহার ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিত। যথাযথ মজবুত হলে তা জল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে ইমাম আহমদ رحمه الله-কে প্রহার করতে

বলত। জল্লাদ প্রহার করতে থাকত। খলিফা জল্লাদকে ধমক দিয়ে বলত, আল্লাহ ﷻ তোমার হাতকে বিচ্ছিন্ন করুন, আরো জোরে প্রহার করো। এভাবেই সে জগদ্বিখ্যাত আলেম, বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম আহমদ رحمه الله-র ওপর অত্যাচার চালাতে লাগল।

দু বছর চার মাস পর ইমামর আহমদ رحمه الله জেল হতে মুক্তি পেলেন। তাকে যে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তা ছিল নিতান্ত সংকীর্ণ ও পুরনো। সেখানে ছিল না কোনো খাদেম। ছিল না প্রাকৃতিক কার্যাদি সম্পন্ন করার উত্তম কোনো ব্যবস্থা। এমনকি ছিল না বাতাস চলাচলের জন্য বড় কোনো জানালাও।

এতো কষ্টের পরও তিনি তার মতের ওপর অবিচল ছিলেন। অতঃপর যখন খলিফা বুঝতে পারল, ইমাম আহমদ رحمه الله-কে তার মত থেকে সরানো সম্ভব নয়, তখন বাধ্য হয়ে তাকে মুক্ত করে দিল। কিন্তু তার ব্যাপারে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল–

১. তিনি কোথাও দরস দিতে পারবেন না।

২. সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে পারবেন না।

৩. কোনো সভা সেমিনার বক্তৃতা দিতে পারবেন না।

৪. তার সাথে কেউ সাক্ষাত করতে পারব না।

৫. যে তার সাথে সাক্ষাত করবে তাকে বন্দি করা হবে।

তাই ঘরের চার দেয়ালের মাঝেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمه الله-র জীবন কাটতে লাগল। এদিকে নাকি বিন মাখদলদ আন্দালুস থেকে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মক্কা হয়ে বাগদাদ পৌঁছলেন। এ দীর্ঘ পথ তিনি পায়ে হেঁটে পাড়ি দিলেন। কারণ, বাহন কেনার সামর্থ্য তার ছিল না। বাগদাদে পৌঁছে তিনি একজনের কাছে আহমদ ইবনে হাম্বল رحمه الله-র ঠিকানা জানতে চাইলেন। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, তার কাছে তোমার কী প্রয়োজন?

তিনি বললেন, আমি তার কাছ থেকে ইলম শিখতে চাই।

লোকটি বলল, তিনি তো তোমাকে ইলম শেখাতে পারবে না। তিনি গৃহবন্দি হয়ে আছেন।

লোকটির কথা শুনে একরাশ হতাশা তাকে জেঁকে ধরল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক মসজিদে এসে পৌঁছলেন। দেখলেন, সেখানে বিখ্যাত আলেম ইয়াহইয়া বিন মঈন দরস দিচ্ছেন। তিনি তার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বললন, হুজুর, আমি আন্দালুস থেকে এসেছি। আমার কিছু প্রশ্ন ছিল।

ইয়াহইয়া বিন মঈন বললেন, বলুন, কি প্রশ্ন আপনার।

অমুক বর্ণনাকরী সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

তিনি বিশ্বস্ত ব্যাক্তি। তবে খুব বেশি ভুলে যান। তাই তার বর্ণিত হাদিসের ওপর নির্ভর করা যায় না।

অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

তিনি সত্যবাদী এবং খুবই বিশ্বস্ত।

এসময় দরসে উপস্থিত ছাত্ররা তাকে বলল, অনুগ্রহ করে জলদি করুন।

নাকি বিন মাখলাদ ওঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আরেকজন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার জানার ছিল?

কে সে?

আহমদ ইবনে হাম্বল।

ইয়াহইয়া বিন মঈন তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে মতামত দেয়ার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। বরং আমার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আহমদ বিন হাম্বলের নিকট প্রশ্ন করা যেতে পারে। আহমদ বিন হাম্বলের সামনে আমি নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য। তিনি যদি আমার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করেন তাহলে আমি ধন্য।

নাকি বিন মাখলাদ সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা ইমাম আহমদ ﷺ-র বাড়ি চলে গেলেন। দরজার কড়া নাড়তেই আহমদ ﷺ দরজা

খুললেন। নাকি বিন মাখলাদ বললেন, আমি ইলম শেখার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

আহমদ ﷺ বললেন, সম্ভবত আপনি আমার ব্যাপারে সবকিছু শুনেছেন।

জি, শুনেছি।

কিন্তু হুজুর, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

আন্দালুস থেকে।

আমহদ বিন হাম্বল ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম, আপনার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আপনি তো জেনেছেন আমি কী পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি। এ অবস্থায় আমি আপনাকে কীভাবে শেখাব?

নাকি বিন মাখলাদ অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। অবশেষে ইমাম আহমদ ﷺ রাজি হলেন। কিন্তু তিনি জানতে খলিফা তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে অবশ্যই তার চারপাশে গোয়েন্দা নিয়োগ করেছে। তাই তিনি তাকে একটি শর্ত দিলেন। বললেন, আপনাকে প্রতিদিন ভিক্ষুকের বেশ ধরে এখানে আসতে হবে। আপনি দরজায় এসে ভিক্ষা চাই, ভিক্ষা চাই বলে আওয়াজ দিলে আমি দরজা খুলব। আপনার জন্য খাবার তৈরি করব এবং সেই ফাঁকে আপনার কাছে হাদিস বর্ণনা করব। পাশাপাশি আপনি অন্য কোনো ইলমের মজলিসে অংশগ্রহণ করবেন না।

নাকি বিন মাখলাদের সামনে আহমদ ইবনে হাম্বল ﷺ থেকে ইলম অর্জন করার এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তাই প্রতিদিন ভিক্ষুকের পোশাক, লাঠি ও থলে নিয়ে ভিক্ষাচাওয়ার ভান করে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ﷺ-র ঘরের দরজায় আওয়াজ দিতেন— আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন। আমাকে সাহায্য করুন। আল্লাহ ﷻ আপনার প্রতি দয়া করবেন।

ইমাম আহমদ رحمه الله ঘর থেকে বের হয়ে তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যেতেন। তার কাছে হাদিস বর্ণনা করতেন। প্রতিদিন তিনি তার কাছে চার পাঁচটি হাদিস বর্ণনা করতেন। নাকি বিন মাখলাদ রহ. সেগুলো মুখস্ত করে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। এভাবে সময় বয়ে চলল।

কিছুদিন পর খলিফা আহমদ বিন হাম্বল رحمه الله-র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। এমনকি তার জন্য কিছু হাদিয়াও পাঠাল। আহমদ বিন হাম্বল رحمه الله তার গ্রহণ করলেন না। তার কোনো এক সন্তান তা গ্রহণ করল। ইমাম আহমদ رحمه الله আবার আগের মতো মসজিদে দরস দিতে শুরু করলেন। নাকি বিন মাখলাদ অন্যান্য ছাত্রদের সাথে সেই দরসে উপস্থিত হতে লাগলেন। আহমদ رحمه الله তাকে কাছে কাছে রাখতেন। কারণ ইলম অর্জনের প্রতি তার আগ্রহ ও ভালোবাসার কথা তিনি জানতেন।

ইলমের বরকত...

নাকি বিন মাখলাদ رحمه الله একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আহমদ বিন হাম্বল رحمه الله তাকে দরসে উপস্থিত না দেখে তাকে দেখতে গেলেন। তিনি এক বাসায় ভাড়া থাকতেন। নাকি বিন মাখলাদের নিজের বর্ণনা। তিনি বলেন, একদিন আমি ঘরের বাইরে লোক সমাগমের আওয়াজ শুনলাম। কেউ একজন বলছিলেন, জি, তিনি এখানে আছেন। আসুন, আপনারা ভেতরে আসুন। আমি কামরার ভেতর থেকে বুঝতে পারছিলাম না, তারা কার সম্পর্কে কথা বলছে। কিছুক্ষণ পর দেখি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। তিনি নিজে এসেছেন আমাকে দেখতে। তার সাথে রয়েছে ছাত্রদের বিশাল এক জামাত। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। ছাত্ররা এ দৃশ্য দেখছিল আর রাসুল ﷺ-র সুন্নত শিখছিল।

তিনি আমাকে বললেন, ধৈর্য ধরো, আল্লাহর নিকট সাওয়াবের প্রত্যাশা করো। পীড়ার সময় সুস্থতা নেই। আশা করছি, আল্লাহ তোমার সাওয়াব বাড়িয়ে দেবেন।

তিনি চলে যাবার পর বাসার মালিক এসে বলল, ইমাম আহমদের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

আমি বললাম, আমি তার ছাত্র। তিনি আমাকে মুহাব্বত করেন।

মালিক বলল, আজ থেকে আপনি বিনা ভাড়ায় এখানে থাকবেন।

নাকি বিন মাখলাদ বলেন, এরপর থেকে সেখানে আমার কদর বেড়ে গেল। বাড়ির মালিক আমার দিকে খুব খেয়াল করতে লাগল। এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে, হয়তো নিজের বাড়িতেও আমি এতোটা নিরাপদ ও সুবিধা পেতাম না। আল্লাহর কসম, এসবই ছিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رحمه الله-র আগমনের বরকত।

ইলম অর্জনের একাল সেকাল

ইবনুল জাওযি رحمه الله বলেন, ইমামর আহমদ رحمه الله-র দরসে প্রায় পনের হাজার ছাত্রের সমাগম হতো। এরমধ্যে পাঁচ হাজার ছাত্র হাদিস লিখতো বাকি দশ হাজার ছাত্র হাদিস অধ্যয়ন ও পাঠদানের রীতিনীতি শিখতো।

আসলে আমাদের পূর্বসূরী আলেমগণ ইলম অর্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ব্যয় করেছেন তাদের সম্পদ ও সময়ের সবটুকুই। কিন্তু বর্তমানে আমরা ইলম বিমুখ হয়ে পড়েছি। এ যুগের কথাই হয়তো রাসুল ﷺ ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন–

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ

> কেয়ামতের আগে আগে ইলম ওঠিয়ে নেয়া হবে এবং মুর্খতার প্রসার ঘটবে। [বোখারি : ৭০৬৪]

অর্থাৎ, সে সময় মানুষের মাঝে মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে। এমনকি মানুষ কখনও কখনও এমন প্রশ্ন করবে যা শুনে আশ্চর্য হতে হবে, আহা! এটিও বুঝি তারা জানে না। দেখা যাবে কেউ তোমাকে পবিত্রতা বিষয়ক এমন প্রশ্ন করবে যা অনেক আগেই তার জানার কাথা ছিল। কেউবা সালাত সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করবে যে, তুমি বলতে বাধ্য হবে–

আশ্চর্য! তোমার বয়স চল্লিশের বেশি, অথচ তুমি সালাতের এই মাসআলাটি এখনও জানো না?

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানের মুসলমিগণ ইলম অর্জনে বিমুখ। জাগতিক সকল বিষয়ে তাদের ধারণা থাকলেও পরলৌকিক বিষয়ে তারা যথেষ্ট অজ্ঞ। মানুষ আজ কম্পিউটারে পারদর্শী। গাড়ি চালনায় দক্ষ। মোবাইল ব্যবহারে পটু। কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানে রিক্ত। তুমি যদি এরূপ জাগতিক বিষয়ে দক্ষ কাউকে জিজ্ঞেস করো, ভাই

(اَللّٰهُ الصَّمَدُ) 'আল্লাহ সামাদ' অর্থ কি বলতে পারেন?

বলতে পারেন– غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ এর মানে?

আচ্ছা বলুন তো ইমাম সাহেব যদি চতুর্থ রাকাতে না বসে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সাহু সেজদা কি সালামের আগে করবে নাকি পরে?

দেখবে, তখন তার উত্তর হবে অতি সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য– জানি না। অথচ দেখো, ইলম অর্জনের উপকরণগুলো এখন কতো সহজসাধ্য। পূর্বের যুগে যা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তদুপরি সে যুগের মানুষেরা ইলম অর্জনে ছিলেন সদা সচেষ্ট। ইলম অন্বেষণে তারা ভ্রমণ করেছিলেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত । নিজের দেশের জন্য হয়েছিলেন আলোকবর্তিকা। আল্লাহ ﷻ-র বান্দাদের জন্য হয়েছিলেন জ্ঞানের নক্ষত্র। ইলম অর্জন করতে তারা পাড়ি দিয়েছিলেন কতো পাহাড়-সাগর, বন-অরণ্য। ধুঁ ধুঁ মরুভূমির বুকে চলতে চলতে তারা কখনও কখনও পথ হারিয়ে ফেলতেন। ফুরিয়ে যেতো সাথে আনা শুকনো খাবার। শেষ হয়ে যেতো পাথেয়। কারো বা শেষ হয়ে যেতো জীবনটাই। এভাবে কষ্ট করে তারা তারা ইলম অর্জন করেছেন। অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বর্তমানে আমাদের জন্য ইলম অর্জন করা কত সহজ। শরয়ি জ্ঞান অর্জন করা তো আরো অনায়াসসাধ্য। বই-পুস্তক এখন সহজলভ্য। অনেক ক্ষেত্রে তো বিনামূল্যেও বই-পুস্তক পাওয়া যায়। চাইলে আমরা বই পড়ে শিখতে পারি। এছাড়াও সিডি-ডিভিডি, ইন্টারনেট থেকেও রয়েছে ইলম অর্জনের অবাধ সুযোগ। শেখা যায় ইলমের বিভিন্ন

মজলিশে উপস্থিত হয়েও। সবচেয়ে বড় কথা হল বর্তমানে শরঈ জ্ঞান অর্জনে কোনো বাধা নেই। যা পূর্বের যুগে ছিল। তখন ইলম অর্জনের উপকরণগুলো এতোটা সুলভ ছিল না। তথাপি এ কালের মানুষেরা ইলম বিমুখ। এমনকি মুসলিম মা-বাবারও তাদের সন্তানদের ইলমে দীন শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী।

চমৎকার একটি ঘটনা

পূর্বের যুগে শিক্ষার্থীদের মাঝে ইলম অর্জনের বিপুল আগ্রহ ছিল। তারা ইলম শেখার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করত। ইমাম আ'মাশ ﷫ ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ট আলেমদের একজন। তার এক ছাত্র অনেক দূর থেকে তার কাছে ইলম শিখতে আসত। একদিন সে মাগরিবের সময়ে এসে উপস্থিত হল। ইমাম সাহেবের সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করল। সালাত শেষে সেই ছাত্রটি যখন দরসে যেতে উদ্যত হল তখনই অন্য ছাত্ররা বলল, আজ দরস হবে না।

কিন্তু আমি যে অনেক দূর থেকে এসেছি।

সে যাই হোক। আজ দরস হবে না। আজ উস্তাদজি খুব রেগে আছেন।

কেন?

আজ আমরা তাকে কিছু অসংলগ্ন প্রশ্ন করেছিলাম। তাই তিন রেগে গিয়ে শপথ করেছেন, আগামী একমাস কোনো দরস দেবেন না।

ছাত্রটি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, তার মানে পূর্ণ একমাস কোন দরস হবে না। গোটা এক মাস হাদিস বর্ণনা বন্ধ থাকবে?

হ্যাঁ, ভাই। দেখো, আমরাও তো যত দ্রুত সম্ভব হাদিস লেখা শেষ করে বাড়ি ফিরে যেতে চাই। কিন্তু উপায় কি বলো?

সেই ছাত্রটি তখন ইমাম আ'মাশ ﷫-র কাছে গেল। আ'মাশ ﷫ ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি রাতে চোখে কম দেখতেন। ছাত্রটি তাকে বিনিত স্বরে বলল, শায়খ আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। দয়া করে আমার বিষয়টি একটু বিবেচনা করুন।

তিনি বললেন, না, আগামী একমাস কোনো দরস হবে না। কোনো হাদিস বর্ণনা করা হবে না। এ মর্মে আমি শপথ করেছি।

ছাত্রটি বলল, বেশ। তাই হবে। শায়খ, চলুন আমি আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি।

আল্লাহ ﷻ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি ছাত্রটির জন্য দোআ করলেন।

এদিকে ছাত্রটি একটি কৌশল অবলম্বন করল। মসজিদ থেকে শায়খের বাড়ি ছিল বামদিকে। ডানদিকে ছিল মরুভূমি। ছাত্রটি তাকে তার বাড়ির পথে না নিয়ে মরুভূমির পথে নিয়ে চলল। তিনি রাতে চোখে কম দেখতেন বিধায় বিষয়টি বুঝতে পারলেন না। অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কতটুকু এসেছি?

ছাত্রটি বলল, শায়খ, আরা তো মরুভূমিতে চলে এসেছি। এটা এক নির্জন বিরানভূমি। এখন আপনি হয়তো আমার কাছে একশ হাদিস বর্ণনা করবেন, নয়তো আমি আপনাকে এখানে রেখে চলে যাব। যেহেতু এখন রাত তাই এখানে থাকলে আপনি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পতিত হবেন। হয়তো আপনাকো কোনো নেকড়ে খুবলে খাবে। কিংবা কোনো বিষধর সাপ দংশন করবে। তাই ভালোয় ভালোয় আপনি আমার কাছে একশ হাদিস বর্ণনা করুন, নয়তো আপনাকে রেখে আমি চললাম।

ইমাম আ'মাশ ছাত্রটিকে বললেন, তুমি এমন করতে পারো না।

আপনিও এমন করতে পারেন না। আমি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি। আমি তো আপনার সাথে কোনো অন্যায় করিনি।

নিরূপায় হয়ে ইমাম ইমাম আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ বললেন, ঠিক আছে আমি বলছি তুমি লেখো, অমুক থেকে অমুক...। এভাবে তিনি এক এক করে একশটি হাদিস বর্ণনা করলেন। ছাত্রটি সেগুলো খাতায় তুলে নিল। অতঃপর শায়খকে তার বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্য অগ্রসর হল। শহর পৌঁছার পর ছাত্রটি তার খাতা এক সহপাঠীর কাছে রেখে আ'মাশকে

বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছার পর তিনি ছাত্রটিকে জাড়িয়ে ধরে চোর চোর বলে চিৎকার করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, এর হাত থেকে খাতাটি নাও, এর হাত থেকে খাতাটি নাও।

ছাত্রটি বলল, শায়খ, আপনি কোন খাতার কথা বলছেন? আমার কাছে তো কোনো খাতা নেই। আমি তো সেটি আমার এক সহপাঠীর কাছে রেখে এসেছি।

আ'মাশ ﵀ বললেন, আচ্ছা, তাই? এবার শোনো, আমি তোমার কাছে যে একশ হাদিস বর্ণনা করেছি, তার সবকটিই দুর্বল। এগুলোর কোনো সনদ নেই।

ছাত্রটি বলল, আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ সম্পর্কে মিথ্যা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আপনি অধিক মুত্তাকি ও সর্বাধিক সতর্ক ব্যক্তি।

আ'মাশ ﵀ বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে আমি চেয়েছিলাম, তুমি যাতে খাতাটি হারিয়ে ফেল। তারপর তুমি আমাকে যতটুকু যাতনা দিয়েছ, ততটুকু তুমিও ভোগ করো।

সেকালের ছাত্রদের মাঝে ইলম অর্জনের আগ্রহ এতোটাই প্রবল ছিল যে, তারা এরূপ কৌশল অবলম্বন করতেও দ্বিধা করত না।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে কল্যাণকর ইলম দান করুন এবং নেক আমল করার তাওফিক দিন।

পরিবেশ ও প্রতিবেশির প্রভাব

মানুষ সাধারণত তার পরিবেশ ও প্রতিবেশি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। জীবনধারার পরিবর্তনের পরিবেশ ও প্রতিবেশির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

উদাহরণত আমরা যখনই আমাদের সন্তানের মাঝে এমন কোনো স্বভাব দেখি; যা কাম্য নয়। কিংবা তার মুখ থেকে এমন কোনো কথা

শুনি যা কাঙ্ক্ষিত নয়, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি ইদানিং কাদের সাথে চলাফেরা করছ?

একটি গল্প বলছি–

এক কবি ছিল। নাম তার আলী বিন জাহাম। মরুভূমির জীর্ণশীর্ণ এক তাঁবুতে ছিল তার বসবাস। তাঁবুর বাইরে চোখ মেললেই সে উট-বকরির বিচরণ, রাখালদের কর্মতৎপরতা, কূপে বালতি ফেলে পানি তোলা– এসব দৃশ্য দেখতে পেতো। এই মরু-সভ্যতার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তার জীবন। তাই তার চিন্তা-কল্পনার জগতটাও ছিল এরই মাঝে সীমাবদ্ধ। সে কবিতা লিখত, ঠান্ডা-গরম, বাতাস-পানি, ভেড়া-উট ইত্যাদি নিয়ে।

একদিন সে মরুভূমি ছেড়ে শহরে এলো। তখন খলিফা মুতাওয়অক্কিল বিল্লাহ'র শাসকাল চলছে। সে শুনল খলিফা ভীষণ কবিতা প্রেমী। তিনি কবিদের বিশেষ সম্মান করেন। তাদের কবিতা শুনে দামি দামি উপহার দেন। তাই কবি তার দরবারে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল তার মতো আরো অনেক কবি উপস্থিত।

এক কবি এগিয়ে এসে খলিফার প্রশংসা করে বলল–

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَنْتَ كَالشَّمْسِ فِيْ سُطُوْعِكَ

হে আমিরুল মুমিনীন, সূর্যের ন্যায় আপনার জ্যোতি।

খলিফা তাকে কিছু উপহার দিলেন। তারপর এলো আরেকজন। সে বলল–

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! فَضْلُكَ كَالنُّجُوْمِ السَّارِيَاتِ

হে আমিরুল মুমিনীন, আকাশের তারকার ন্যায় উঁচু মর্যাদা আপনার।

খলিফা তাকেও কিছু হাদিয়া দিলেন। এভাবে একসময় মরুভূমির নির্দিষ্ট গন্ডির ভেতর বেড়ে ওঠা কবি আলী বিন হাজামের পালা এলো। সে বলল–

يَا أَيُّهَا الْخَلِيْفَةُ!

أَنْتَ كَالْكَلْبِ فِيْ حِفَاظِكَ لِلْوُدِّ * وَكَالتَّيْسِ فِيْ قِرَاعِ الْخُطُوْبِ

أَنْتَ كَالدَّلْوِ لَاعَدَمْتُكَ دَلْوًا * مِنْ كَبِيْرِ الدِّلَا كَثِيْرِ الذُّنُوْبِ

হে খলিফা, বন্ধুত্ব রক্ষায় আপনি কুকুরের ন্যায় । দুর্ঘটনা মোকাবেলায় ছাগলের ন্যায়।

বদান্যতায় সুবিশাল বালতির ন্যায়; যা থেকে কোনো (ছোট) বালতি শূন্য হয়ে ফেরে না।

খলিফা মুতাওয়াক্কিল ভীষণ রাগী ছিলেন। মরু-কবির কবিতা শুনে তিনি রেগে-মেগে আগুন হয়ে গেলেন। উপস্থিত মন্ত্রীবর্গ খলিফার এই রুদ্ররূপ দেখে ভাবল, আজ এই কবির শেষ দিন। খলিফা নিশ্চিত তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেবেন। দেহ থেকে তার মস্তক আলাদ করে ফেলবেন। তাই তারা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল। রক্তের ছিটে ফোটা থেকে বাঁচার জন্য পোশাক গুটিয়ে নিল। কিন্তু না, আল্লাহ তাআলা খলিফার অন্তর কোমল করে দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আসলে তার প্রশংসা করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, তার কাছে কুকুর হল বন্ধুত্ব রক্ষার সর্বোচ্চ প্রতীক। ছাগল হল দুর্যোগ মুহূর্তে অটল থাকার প্রতীক। আর বালতি ও পানি তার কাছে জীবনের তাৎপর্য। এসব ঘিরেই কেটেছে তার জীবন। তাই তার কবিতা জুড়ে কেবল এসবের প্রকাশ।

তিনি এই মরু-কবিকে রাজ মেহমান খানায় থাকার ব্যবস্থা করলেন। তাকে আধুনিক কবিদের আসরে যাতায়াত করতে বললেন। সুন্দরী সেবিকাদের একটি দলকে তার জন্য খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব দিলেন। এভাবে তাকে দুসপ্তাহ আধুনিক কবি ও সুন্দরী রমণীর সাহচর্যে রাখলেন। এরপর একদিন খলিফা তাকে তার দরবারে তলব করলেন। খলিফার সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি তাকে বললেন, আলী বিন জাহাম, আমাকে একটি কবিতা শোনাও। তখন সে বলল–

يَا أَيُّهَا الْخَلِيْفَةُ ا عُيُوْنُ الْمَهَا بَيْنَ الرَّصَافَةِ وَالْجِسْرِ * جَلَبْنَ الْهَوَي مِنْ حَيْثُ أَدْرِيْ وَلَا أَدْرِيْ

হে খলিফা, মাহার সুদৃঢ় ও সাহসি চাহনি আমার হৃদয়-মন আকর্ষণ করে।

আমি নিজেকে (তার মাঝে) হারিয়ে ফেলি।

খলিফা দেখল তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আলী বিন জাহামের কাব্যধারা মরুপথ ছেড়ে প্রেমের গলিতে হাঁটতে শুরু করেছে। খলিফার অনুচরেরাও বুঝতে পারল, খলিফা কেন মরু-কবিকে শাস্তি না দিয়ে রাজ মেহমান বানিয়েছিলেন।

আমাদের জীবন, আমাদের পরিবেশ

বর্তমানে আমাদের যুবকদের কেউ নানা অপকর্মে লিপ্ত। কেউবা আবার অনিশ্চিত গন্তব্যের পথিক। তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে, এর নেপথ্যে রয়েছে তার পরিবেশ ও প্রতিবেশি এবং তার নির্বাচিত বন্ধু ও গৃহিত সংস্কৃতি। আমাদের বোনদের দেখা যায় শিক্ষা জীবনের একটা স্তর পর্যন্ত তারা যথারীতি পর্দা করে। জবানের হেফাজত করে। অবৈধ সম্পর্ক থেকে মুক্ত থাকে। মা বাবার সাথে চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু যখন তারা প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর কিংবা মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন তাদের স্বভাব-চরিত্র ও জীবনধারা বদলে যায়। এর একমাত্র কারণ পরিবেশ। এ সবই তাদের নতুন পরিবেশ ও সঙ্গী-সাথীদের প্রভাবে হয়ে থাকে। মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আল্লাহর ﷻ-র বক্তব্য হল–

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

> জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! [সূরা ফুরকান : ২৭]

তোমাকে রাসুলের পথ অবলম্বন করতে কে নিষেধ করেছে? তোমার মাঝে ও আল্লাহর রাসুলের মাঝে কে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

﴿يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾

> হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! [সূরা ফুরকান : ২৮]

তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তোমার কী ক্ষতি হয়েছে?

﴿لَقَدْ اَضَلَّنِیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِیْ ؕ وَ کَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا﴾

আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। [সূরা ফুরকান : ২৯]

আমাকে সৎকাজ ও সৎপথ থেকে বিরত রাখত সে বন্ধু। যখনি আমার কোনো সৎকাজের সুযোগ আসত তখনই সে নানাভাবে আমাকে বাধা দিত। আমি কোরআন শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ করতে চাইলে সে বলত, কি দরকার ওখানে যাওয়ার?

ধর্মীয় কোনো স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখাতে গেলে সে বলত, এসব চ্যানেল দেখে কী লাভ?

আমি কোরআন পড়তে চাইলে সে বলত, গত শুক্রবারেই তো তুমি কোরআন পড়েছ, আজ বাদ দাও।

নফল সওম রাখতে চাইলে সে বলত, এরজন্যে তো পুরো রমযান মাসটাই পড়ে আছে।

সে আমাকে দীনি মজলিশে বসতে বাধা দিত। নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে বলত,আরে যৌবনটাকে উপভোগ করো।

এভাবে সে আমাকে সর্বপ্রকার ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখত।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কোরআনে এক জান্নাতবাসী ও তার অসৎ বন্ধুর আলোচনায় বলেন—

﴿قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّیْ کَانَ لِیْ قَرِیْنٌ﴾

তাদের (জান্নাতবাসীদের) একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। [সূরা সাফফাত : ৫১]

পৃথিবীতে সে ছিল আমার বন্ধু। আমরা একসাথে একই বিদ্যালয়ে পড়তাম। একসাথে চলাফেরা করতাম। সে ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু সে সৎ ছিল না।

﴿يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ﴾

সে (আমাকে) বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। তখন সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। [সূরা সাফফাত : ৫২-৬১]

তাই তুমি নিজেকে পরিবর্তন করতে চাইলে প্রথমে পরিবেশ পরিবর্তন করো। মরু-কবি ও খলিফা মুতাওয়াক্কিলের গল্পও আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়।

এক যুবকের গল্প

একবার আমি উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশে আমি সফর করছিলাম। সেখানে এক অনুষ্ঠানে আমি লেকচার দিচ্ছিলাম। লেকচারের বিষয় ছিল– আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও মন্দ পরিবেশ ত্যাগ।

আমি বললাম, নিজেকে সৎ ও সুন্দর করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই মন্দ পরিবেশ ত্যাগ করতে হবে। যেমন কেউ যদি মদ্যপান ত্যাগ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই মদ্যপায়ীদের আসর ত্যাগ করতে হবে। তাদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করত হবে। মোবাইল

থেকে তাদের নাম-নাম্বার মুছে ফেলতে হবে। তদ্রূপ ধুমপান ত্যাগে আগ্রহী ব্যক্তির তার ধুমপায়ী বন্ধুদের ত্যাগ করতে হবে। অবৈধ সম্পর্ক ও মেলামেশায় লিপ্ত ব্যক্তির অশ্লীলতা ত্যাগ করতে হলে সব খারাপ মেয়ের নাম্বার মুছে ফেলতে হবে। অতএব, প্রিয় ভাইয়েরা, নিজেকে পরিবর্তন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এমন কিছু কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, যা আপনার জীবনধারা বদলে দেবে।

লেকচার শেষে এক যুবক এসে বলল, শায়খ, আমার কিছু কথা ছিল।

কি কথা? বলো।

যুবকটি বলল, কিছুদিন আগে আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে একটি আরব মুসলিম রাষ্ট্রে ঘুরতে যাই। সেখানে গিয়ে আমি অবাক হই। আশ্চর্য! একটি মুসলিম দেশে অশ্লীলতা ও পাপাচারের এমন সয়লাব কীভাবে ঘটতে পারে? বন্ধুদের আমি আগেই বলে রেখেছিলাম, আমি তোমাদের সাথে এমন কোনো জায়গায় যাবো না, যেখানে কোনো ধরণের অপকর্ম চলে। তিন চার দিন কেটে গেল। আমরা বিভিন্ন মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে সময় পার করলাম।

একদিন তারা এক অশ্লীল স্থানে যাওয়ার মনস্থ করল। আমি বললাম, আমি তোমাদের আগেই বলেছি, আমি এসব জায়গায় যাবো না। এগুলো কবিরা গুনাহ ও মারাত্মক গর্হিত কাজ। আমি তাদের বললাম, তেমরা আল্লাহকে ভয় করো। শায়খ, আলহামদুলিল্লাহ, তখন আমার ভেতর এ পরিমাণ ঈমানের জোর ছিল যে, আমি তাদের বিপরীতে অটল থাকতে পেরেছি। আমি হোটেলেই রয়ে গেলাম। প্রায় দু তিন ঘন্টা পর তাদের আগমনের আওয়াজ পেলাম। সাথে শুনতে পেলাম নারী কণ্ঠের আওয়াজও। আমি তাদের কুমতলব আগেই আঁচ করেছিলাম। তাই রুমের দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম।

মিনিট দশেক পর আমার এক বন্ধু এসে আমাকে ডাকতে লাগল। দরজা খোলো। বেরিয়ে এসো। ফুর্তি করো। জীবনকে উপভোগ করো।

আমি দরজা খুললাম না। ভেতর থেকে বললাম, আমি জীবন ভালোভাবেই উপভোগ করছি। মদ আর ব্যভিচার ছাড়া কি জীবন উপভোগ করা যায় না?

কিছুক্ষণ পর আবার একজন এসে দরজায় আওয়াজ দিল, দরজা খোলো।

আমি বললাম, না, আমি দরজা খুলব না।

সে বলল, এই রুমে আমার মোবাইলের চার্জার আছে। চার্জারটা দাও।

তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তার চার্জার এখানে। আমি চার্জার দেয়ার জন্য দরজা খুলতেই সে ধাক্কা দিয়ে পুরো দরজা খুলে ফেলল। একটি মেয়েকে রুমের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বাহির থেকে লাগিয়ে দিল। আমি দরজা খোলো, দরজা খোলো বলে চিৎকার করতে লাগলাম। তাদের কেউ আমার চিৎকারে কান দিল না। বুঝতে পারলাম, তারা আমাকে বশ করার জন্য এই মেয়েটিকে ভাড়া করে এনেছে।

আমি মেয়েটিকে বললাম, দূর হও। আল্লাহকে ভয় করো।

কিন্তু সে আমাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল। যখন বুঝতে পারলাম একে উপদেশ দিয়ে কাজ হবে না; তখন আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম। বললাম, দেখো আমি এইডস রোগে আক্রান্ত। আমার সাথে মেলামেশা করলে তুমিও এইডসে আক্রান্ত হবে।

মেয়েটি বলল, এটা কোনো ব্যাপার না। তোমার এইডস হয়েছে কতদিন হল?

প্রায় একবছর।

আর আমি দু বছর ধরে এইডস আক্রান্ত। তাই আমরা দুজনই যখন এইডসের রোগী, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না।

যুবকটি বলল, শায়খ, আল্লাহর কসম, মেয়েটি যখন বলল সে এইডস আক্রান্ত; তখন আমি এইডস! এইডস! বলে চিৎকার করতে লাগলাম। আমার বন্ধুরা মরণব্যাধি এইডস শব্দ শুনে জলদি দরজা খুলে দিল এবং তড়িঘড়ি করে মেয়েটিকে বের করে দিল। আসলে তারা এইডসের ভয়ে মেয়েটিকে বের করে দিয়েছিল। আল্লাহর ভয়ে নয়। শায়খ, তখন থেকে আমি বুঝতে পারলাম, আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন– এটা পাপীরা চায় না।

কেবল স্বপ্ন দেখো না, পরিশ্রম করো

আমার যেসকল ছাত্র-ছাত্রী ও ভাই-বোনেরা প্রায়ই চিঠি পাঠিয়ে কিংবা ফোন করে পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করে দোআ চায়– আমি তাদের বলব উপরিউক্ত যুবকের গল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। বলব, কেবল মুখেই অন্যায় পরিত্যাগ ও ভালো হওয়ার আশা প্রকাশ করলে চলবে না; বরং সেজন্যে চেষ্টা করতে হবে পূর্ণরূপে। দুনিয়াতে কোনো কিছু পেতে হলে তা অর্জন করতে হয়। তাই যিনি হেদায়াতপ্রার্থী তাকেও অবশ্যই তা অর্জনের উপায় উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। কমলা লেবুর গাছ লাগিয়ে তাতে কলা বা আঙ্গুর কামনা করা অবান্তর। কমলা গাছ থেকে কেবল কমলাই জন্মায়। কিছু লোককে দেখা যায়, অযথা সময় নষ্ট করে আর আফসোস করে– মাশাআল্লাহ আল্লাহ আমার অমুক বন্ধুর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, সে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে সফল হয়েছে। আমার অমুক সাথী শরিয়াহ বিভাগ থেকে পাশ করেছে। অমুক সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। হায়! আমি কিছুই হতে পারলাম না?

হ্যাঁ, আসলেই তুমি কিছুই হতে পারোনি। কারণ তাদের মতো তুমি চেষ্টা করোনি। পরিশ্রম করোনি।

আমি অনেক জেলখানায় সফর করেছি। সেখানে অনেক মাদকাসক্তকে দেখেছি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অনেক খুনের আসামীকে দেখেছি। তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি, তাদের অধিকাংশেরই এ পথে আসার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল তাদের পরিবেশ-প্রতিবেশি ও সঙ্গী-সাথীর। কোনো মা তার সন্তানকে খুনি হিসেবে জন্ম দেয় না। কোনো মা তার সন্তানের হাতে নেশার দ্রব্য তুলে দেয় না। পারিপার্শ্বিকতাই তাকে বিপদগামী করে। সঙ্গী-সাথীরাই তাকে ধ্বংস করে।

হাসান বসরী رحمه الله একবার এক আলোচনায় জাহান্নামবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআনের এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন–

﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ﴾

> অতএব আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়, যদি কোনোরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। [সূরা আশ শোয়ারা : ১০০-১০৩]

তেলাওয়াত শেষে হাসান বসরি ﷺ বললেন, তোমরা পৃথিবীতে ভাল মানুষদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে তৎপর হও, কারন এই সম্পর্কের কারণে হয়তো তোমরা আখেরাতে উপকৃত হতে পারবে।

জিজ্ঞেস করা হল কিভাবে?

তিনি বললেন জান্নাতিরা জান্নাতে যাওয়ার পর পৃথিবীর অনেক কথা মনে পড়বে। স্মরণ হবে তাদের পৃথিবীর বন্ধুদের কথা। তখন তারা বলবে, আমি তো আমার সেই বন্ধুকে জান্নাতে দেখছিনা?

তার সেই বন্ধু কাফের না হলেও গুনাহগার ছিল। তখন তাকে বলা হবে, সে তো জাহান্নামে।

তখন সেই মু'মিন ব্যাক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ, আমার বন্ধু ছাড়া আমার ভালো লাগছে না। জান্নাতের স্বাধ পূর্ণ হচ্ছে না।

অতঃপর আল্লাহ ﷻ আদেশ দেবেন, অমুক ব্যাক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে এসো।

দেখেছো, তার এই বন্ধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল এই কারনে নয় যে, সে তাহাজ্জুদ পড়ত বা কুরআন পড়ত কিংবা সাদাকাহ করত অথবা রোজা রাখত, বরং তার মুক্তির একমাত্র কারণ তার সেই বন্ধু।

জাহান্নামিরা তখন অত্যন্ত অবাক হয়ে জানতে চাইবে কি কারনে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হল,

তার বাবা কি শহিদ?

(বলা হবে) না।

তার ভাই কি শহিদ?

না।

তার জন্য কি কোন ফেরেশতা বা নবী সুপারিশ করেছেন?

না;

তাহলে তার জন্য কে সুপারিশ করেছে?

তার এক জান্নাতী বন্ধু তার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেছে।

তখন জাহান্নামিরা আফসোস করে বলবে–

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

> অতএব আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়, যদি কোনোরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। [সূরা আশ শোয়ারা : ১০০-১০৩]

আফসোস! আমার যদি কোনো সৎ ও মুমিন ও নেককার বন্ধু থাকতো, তাহলে কতই না ভালো হতো।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদের সকলকে সৎলোকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার তাওফিক দান করুন।

জান্নাতি নারীদের সরদার

এসো, নবী-নন্দিনী, জান্নাতি নারীদের সরদার, মমতার আধার, বিদুষী রমণী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের আদরের কন্যা, রাসুল ﷺ-র কলিজার টুকরা ফাতেমা رضي الله عنها সম্পর্কে আলোচনা করি। তার কিছু ঘটনা জানি। বাবা-মেয়ের সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে খানিকটা অবগত হই।

তাছাড়া তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-র নয়নের মণি, জান্নাতি যুবকদের সর্দার হাসান-হুসাইনের আম্মাজান এবং জ্ঞানের শহর, সিংহশার্দুল, বিশিষ্ট সাহাবি আলি رضي الله عنه-র স্ত্রী। গঠন এবং চরিত্র উভয় দিক থেকেই ছিলেন রাসুল ﷺ-র সাথে অধিখ সাদৃশ্যপূর্ণ। ছিলেন রাসুল অতুলের ঘনিষ্ঠ প্রতিবিম্ব। সেই মুখচ্ছবি, সেই আকার-আকৃতি, সেই চিবুক, সেই চাল-চলন, সেই কথার ভঙ্গি। যিনি রাসুল ﷺ-কে দেখেছেন, তিনি ফাতেমা رضي الله عنها-কে দেখা মাত্রই চট করে চিনে ফেলতেন– ইনি রাসুল-তনয়া।

ঘটনা-১
হাসি-কান্না পাশাপাশি

রাসুল ﷺ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পবিত্রা স্ত্রীগণ তাঁর চারপাশে উপবিষ্ট। ফাতিমা رضي الله عنها ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসুল ﷺ-র অভ্যাস ছিল ফাতেমা رضي الله عنها এলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। তার কপালে চুমু খেতেন। মারহাবা মারহাবা বলে নিজের চাদরটি বিছিয়ে দিতেন।

কিন্তু আজ যে তিনি ভীষণ অসুস্থ। আজ তিনি ফাতেমার জন্য ওঠতে পারলেন না। আয়েশা رضي الله عنها বললেন, ফাতেমা এসেছে।

রাসুল ﷺ শোয়া অবস্থাতেই প্রিয় মেয়েকে স্বাগত জানালেন, 'এসো মা এসো'...

ফাতেমা رضي الله عنها কাঁদতে লাগলেন। রাসুল ﷺ তাকে কাছে ডাকলেন। তার কানে কানে কি যেন বললেন, যা শুনে ফাতেমা رضي الله عنها কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর আবার কানে কানে কি যেন বললেন, এবার তিনি হাসতে লাগলেন।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর কসম আমি ওই দিনের মতো এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কখনও দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ফাতেমা, আল্লাহর রাসুল ﷺ তোমাকে কী বলেছেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ-র গোপন বিষয় প্রকাশ করব না।

অতঃপর রাসুল ﷺ-র ইন্তেকালের কিছুকাল পর আমি আবার বললা, আমাকে একটু বলো, সেদিন আল্লাহর রাসুল ﷺ তোমাকে কী বলেছিলেন?

ফাতেমা رضي الله عنها বললেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন, জিবরাইল عليه السلام প্রতি বছর আমার কাছে একবার কোরআন পেশ করতেন। এ বছর তিনি দু'বার পেশ করেছেন। আমার মনে হচ্ছে আমার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।

একথা শুনে আমি কেঁদে ফেলি।

তখন নবী সা. বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতি নারীদের সরদার হবে? তখন আমি হেসে দিই।

ঘটনা-২
তাসবীহে ফাতেমী

ফাতেমা رضي الله عنها-র ব্যাপারে রাসুল ﷺ অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। আলি رضي الله عنه-র সাথে বিবাহের পরও এ ধারা অব্যাহত ছিল। একদা রাসুল ﷺ-র কাছে গনিমতের কিছু গোলাম-বাঁদী এলো। আলী رضي الله عنه ফাতেমা رضي الله عنها-কে বললেন, ফাতেমা, ঘরের সব কাজ একা সামাল দিতে তোমার কষ্ট হয়। কাজ করতে করতে তুমি ক্লান্ত হয়ে যাও। এক কাজ করো। রাসুল ﷺ-র দরবারে গিয়ে একজন খাদেম চেয়ে নিয়ে আসো।

আসলে আগেকার নারীগণ বর্তমানের নারীদের মতো এত সুযোগ সুবিধা পেতো না। তখনকার সময় মহিলাগণ পানিকর জন্য কলসি কাঁধে নিয়ে কূপের কাছে যেতেন। ভরা কলসি কাঁধে নিয়ে ঘরে ফিরতেন। নিজ হাতে ঘোড়ার জন্য বীচি সংগ্রহ করতেন, খেজুর কুড়াতেন, আটা পিষতেন, বর্তমানে তো আটা প্রস্তুত পাওয়া যায়। কাপড় চোপড় ধোয়র জন্য মহিলাদের পুকুরে যেতে হয় না। বর্তমানে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া যায়। এখন যাঁতাকল পিষতে হয় না।

পানির টেপ হাতের নাগালে। পূর্বের ন্যায় মহিলাদের এখন আর তেমন ভারি কাজ করতে হয় না।

আলি ﵁-র পরামর্শে ফাতেমা ﵂ নবীজির কাছে গেলেন। রাসুল ﷺ তখন ঘরে ছিলেন না। তিনি আয়েশা ﵂-র সাথে দেখা করলেন। তারা দুজনই ছিলেন স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষ। ছিলেন একে অপরের প্রতি সৌহার্দশীলা। তাদের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ছিল না। (যেমনটি বর্তমানে সৎ মা ও মেয়ের মাঝে থেকে থাকে)। রাসুল ﷺ কখনও আয়েশা ﵂-কে নিয়ে ফাতেমা ﵂-কে দেখতে যেতেন। তাদের উভয়ের মাঝে খুব মিল ছিল। আয়েশা ﵂ জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা, রাসুল ﷺ-র কাছে কি ব্যাপারে এসেছো?

ফাতেমা ﵂ বললেন, ঘরের সব কাজ একা সামাল দিতে খুব কষ্ট হয়। তাই রাসুল ﷺ-র কাছে একজন খাদেমের জন্য এসেছি।

আয়েশা ﵂ বললেন, ঠিক আছে, রাসুল ﷺ ঘরে এলে আমি তোমার কথা বলব।

শেষরাতের দিকে রাসুল ﷺ ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন। আয়েশা ﵂ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ফাতেমা এসেছিল।

রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছিল?

তিনি বললেন, ঘরের সব কাজ তার একা সামাল দিতে কষ্ট হয়। সেজন্যে একজন খাদেম চাইতে এসেছিল।

এখানে লক্ষ করো, ফাতেমা ﵂-র প্রতি আয়েশা ﵂ কতটা আন্তরিক ছিলেন। তিনি রাসুল ﷺ-র কাছে কোনো কথা গোপন করেননি। বরং উৎসাহ দিয়েছেন– হে আল্লাহর রাসুল, ফাতেমা একজন খাদেম পাওয়ার হকদার। বলেননি যে, আমাকেও একজন খাদেম দিন।

পরদিন রাসুল ﷺ ফাতেমা ﵂-র ঘরে গেলেন। দরজায় কড়া নাড়লেন। তারা নব দম্পতি ছিলেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, একটু অপেক্ষা করুন। আসছি।

রাসুল ﷺ বললেন, তোমদের আসার দরকার নেই, এই বলে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। বিছানার ওপর দুজনের মাঝখানে বসলেন। যাদের একজন নিজ কন্যা অপরজন জামাতা ও সন্তানসম চাচাতো ভাই। ফাতেমা رضي الله عنها-কে বিবাহ করার সময় আলি رضي الله عنه-র বয়স ছিল ২৬ বছর। রাসুল ﷺ-র বয়স তখন আনুমানিক ৬০। এ হিসেবে তিনি ছিলেন তার সন্তানের মতোই। তাছাড়া নবীজির ঘরেই তিনি লালিত পালিত হয়েছিলেন।

রাসুল ﷺ ফাতেমা رضي الله عنها-কে বললেন, তুমি কি গতকাল আমার কাছে গিয়েছিলে?

জি, আব্বাজান।

কি জন্যে গিয়েছিলে?

ফাতেমা رضي الله عنها চুপ করে রইলেন। আলী رضي الله عنه বললেন, চাক্কি পিষতে পিষতে তার হাতে ঠোসা পড়ে গেছে। পানি উঠাতে উঠাতে শরীরে দাগ পড়ে গেছে। আমি আপনার দরবারে কিছু গোলাম-বাঁদী দেখেছিলাম, তাই তাকে বলেছিলাম আপনার কাছে গিয়ে এককজন খাদেম চেয়ে আনতে।

রাসুল ﷺ খাদেম দানের পরিবর্তে বললেন–

اِتَّقِيْ اللهَ يَا فَاطِمَةَ! وَأَدِّىْ فَرِيْضَةَ رَبِّكَ وَاعْمَلِيْ عَمَلَ أَهْلِكَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعِكِ فَسَبِّحِيْ ثَلَاثاً وَثَلَاثِيْنَ وَاحْمَدِىْ ثَلَاثاً وَثَلَاثِيْنَ وَكَبِّرِىْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ مِاْئَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ.

হে ফাতেমা, আল্লাহকে ভয় কর। পরহেজগার হও। তোমার রবের ফরজ সমূহ আদায় কর। ঘরের কাজ নিজ হাতেই সম্পন্ন করতে থাকো। আর যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নাও। মনে রাখবে, এই আমল তোমার জন্য খাদেমের চেয়ে বহুগুণে উত্তম।

আলি رضي الله عنه ফাতেমা رضي الله عنها-র দিকে তাকালেন। ফাতেমাও আলির দিকে তাকালেন। অতঃপর ফাতেমা رضي الله عنها জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আর খাদেম?

দোজাহানের বাদশাহ ﷺ বললেন, ফাতেমা আমি এখনও আসহাবে সুফফার হকই আদায় করতে পারি নি। তাদের খেদমত থেকে এখনও অবসর হতে পারি নি। এছাড়া আরো অনেক ইয়াতিম-মিসকিনও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তোমাকে কোথা থেকে খাদেম দেবো বলো? যাও আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকো। দুনিয়ার দিকে মন দিও না। দুনিয়ার সব কিছুকে ঘৃণা করো।

ওই সকল মহৎ প্রাণ সাহাবি আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত, যারা মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের অনেকের পরিবারই কাফের ছিল। তাই ইসলাম গ্রহণের কারণে তারা তাদের কাছে ফিরে যেতে পারেনি। জ্ঞানার্জনের জন্য ভোগবিলাস ত্যাগ করে অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন তারা। থাকতেন মসজিদে নববীর চত্বরে। আসহাবে সুফফার সদস্যগণ খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদের মানবিক চাহিদার কোনো চিন্তা করতেন না। রাসুল ﷺ-র দরবারে হাদিয়া হিসেবে যা আসত তা থেকেই তারা তাদের প্রয়াজেন পূরণ করতেন। রাসুল ﷺ বললেন, আমি ওই গোলামগুলো বিক্রি করে সুফফাবাসীদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবো।

ঘটনা-৩
অনাহারেও কেটেছে দিন

আলি رضي الله عنه ও ফাতেমা رضي الله عنها একদিন না খেয়েও ছিলেন। তখন আলি رضي الله عنه কাজের জন্য এক ইহুদির বাগানে গেলেন। তাকে কূপ থেকে পানি আনার কাজ দেয়া হল। তখনকার সময় কূপের পাশে হাউজ থাকতো। কূপ থেকে পানি ওঠিয়ে হাউজে রাখা হতো। সেখান থেকে বাগানে পানি দেয়া হতো। আলি رضي الله عنه বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি ওঠিয়ে হাউজে রাখছিলেন। বাগানের মালিকের সাথে চুক্তি হল প্রতি বালতির বিপরীতে একটি করে খেজুর দিতে হবে।

একটু ভেবে দেখো। এই বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি উত্তোলন, বিশেষ করে একজন ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত মানুষের পক্ষে কতটা কষ্টকর। সেই তুলনায় বর্তমানে তো আমাদের কোনো কষ্টই নেই। অথচ তিনি ক্ষুধার্ত হয়েও বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে হাউজ ভর্তি করেছিলেন। বিনিময়ে পেয়েছিলেন মাত্র কয়েকটি খেজুর।

নবীদের সম্পদের ওয়ারিশ

আল্লাহ ﷻ রাসুল ﷺ-র ব্যাপারে শরয়ি বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, আপনার মৃত্যুর পর আপনার রেখে যাওয়া সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে। এ বিধান কেবল নবী ﷺ-র সাথেই নির্ধারিত ছিল না; বরং তার পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য ছিল। দাউদ আ. তাঁর পুত্র সুলাইমান ﵇-কেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানিয়ে যাননি; বরং নবুওয়াতের উত্তরাধিকার বানিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ যাকারিয়া ﵇-এর ভাষায় বলেন–

﴿فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক।। [সূরা মারয়াম : ৫,৬]

জাকারিয়া ﵇ মহান আল্লাহর কাছে সন্তান তথা উত্তরাধিকারী চেয়েছেন। ওই সন্তান কিসের উত্তরাধিকার হবে এ বিষয়ে আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, জাকারিয়া ﵇ মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে সন্তান চেয়েছেন যে, ওই সন্তান তাঁর নিয়ে আসা নবুয়তের উত্তরাধিকারত্ব পালন করবে এবং তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করবে।

এই উত্তরাধিকারত্ব ব্যক্তিগত কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এটি নবুয়ত ও আসমানি জ্ঞানের উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারত্ব ইয়াকুব ﵇-র বংশধররা ব্যাপকভাবে ধারণ করেছে। জাকারিয়া ﵇

চেয়েছেন তাঁর সন্তান যেন সেই উত্তরাধিকারত্ব গ্রহণ করে। সর্বোপরি তিনি চেয়েছেন এমন একটি সন্তান, যে আল্লাহর ওপর রাজি থাকবে, মহান আল্লাহও তার ওপর রাজি থাকবেন।

এ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে আল্লাহর নবীরা সম্পদের উত্তরাধিকারী রেখে যান না। তাঁরা রেখে যান নবুয়ত, আদর্শ ও আসমানি জ্ঞানের উত্তরাধিকারী।

এক হাদিসে এসেছে :

আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ। আর নিশ্চয়ই নবীরা দিনার ও দিরহাম তথা অর্থকড়ির উত্তরাধিকারী বানিয়ে যান না; বরং তাঁরা ইলম ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারী রেখে যান।

অন্য হাদিসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমরা নবীদের কোনো ওয়ারিশ নেই। আমরা যা কিছু (অর্থকড়ি) রেখে যাই, তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। [বোখারি : ৭৩০৫]

একবার রাসুল ﷺ এক ইহুদি থেকে বাকিতে কিছু খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং সেই ঋণের গ্যারান্টি হিসেবে তার বর্মটি ইহুদির কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

ইন্তেকাল সময়ও সেই বর্মটি ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল। ফলে রাসুল ﷺ-র কোনো সহায় সম্পত্তি ছিল না। শুধু ফাদাক নামক স্থানে এক খন্ড জমি ছিল। যা থেকে উৎপাদিত ফসল দিয়ে রাসুল ﷺ-র স্ত্রী সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

নবী করিম ﷺ-র ইন্তেকালের পর ফাতেমা رضي الله عنها আবু বকর رضي الله عنه-র কাছে এলেন। তিনি ফাতেমাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুলের মেয়ে, তুমি আমার কাছে আমার সন্তানের চাইতেও অধিক প্রিয়। তুমি আমার সম্পদ থেকে যা তোমার ভালো লাগে নিয়ে যাও। চাইলে আমার বাড়িটি নিয়ে নাও। আমার উট, বকরি বা অন্য সম্পত্তি যা তোমার মন চায় নিয়ে যাও।

তবে আল্লাহর রাসুল ﷺ যে জমি রেখে গেছেন সেটি সদকার মাল। বর্তমানে আমি খলিফা। তাই এটি এখন আমার দায়িত্বে। আমি কখনোই এটা আমার নিজের ভোগের জন্য গ্রহণ করব না। এটা মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে। ফাতেমা রাঃ তার কথা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন।

পবিত্র মৃত্যু

জান্নাতের সম্রাজ্ঞী নবী করিম ﷺ-র ইন্তেকালের মাত্র ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন। তিনি মত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আবু বকর ও ওমর রাঃ তার সাথে বিদায়ি সাক্ষাতের জন্য এলেন। আলি রাঃ বললেন, আবু বকর এবং ওমর তোমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। তিনি অনুমতি দিলেন। তারা ঘরে প্রবেশ করলেন। ফাতেমা রাঃ পরিপূর্ণ পর্দাতে ছিলেন। তারা ফাতেমা রাঃ-র জন্য দোআ করলেন। ফাতেমা রাঃ-ও তাদের জন্য দোআ করলেন।

রাসুল ﷺ-র দেওয়া তা'লিম-তরবিয়ত ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলে ফাতেমা রাঃ-র অন্তর ছিল পূত-পবিত্র এবং হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত। তার অন্তরে ছিল সমস্ত মুসলমানদের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনা।

রাসুল ﷺ-র সকল পবিত্রা স্ত্রীদের সাথে তার গভীর হৃদ্যতা ছিল। তিনি খাদিজা রাঃ-র কন্যা হলেও রাসুল ﷺ-র সকল স্ত্রীর প্রতিই তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা, জান্নাতি নারীদের সরদার ফাতেমা রাঃ-র প্রতি তিনি রহম করুন। আমাদেরকে তার ও রাসুল ﷺ-র সকল পবিত্রা স্ত্রী ও সকল সাহাবির সাথে জান্নাতে একত্রিত করুন।

গুপ্তচরবৃত্তি

গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস বহু পুরনো। মুসলিম, অমুসলিম, আরব অনারব নির্বিশেষে অনেক শাসকই নিজেদের ও রাষ্ট্রের কল্যাণে গোপনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য এই চর্চা করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের অনেকেই অবলম্বন করেছেন অদ্ভুত সব উপায়। কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় কল্যাণের বাহিরে ব্যক্তিগত স্বার্থে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যা নিতান্তই অনধিকার চর্চার শামিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের বাণী অনুযায়ী সতর্ক করে বলেছেন,

لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا

> তোমরা গোয়েন্দাগিরি করোনা এবং অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে জানতে চেয়ো না। [বোখারী : ৫১৪৩]

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন–

> তোমাদের কারো জন্য বিনা অনুমতিতে তার ভাইয়ের চিঠি পড়া বৈধ নয়। [ফাতহুল কাবির : ১৩৪৭২]

উদাহরণত তুমি কোথাও একাকী যাচ্ছো। চলার সময় এদিক ওদিক তাকাচ্ছো। মানুষের ঘরের দরজা-জানালা দিয়ে উঁকি মারছো। কিংবা গোপনে ক্যামেরায় কারো ছবি তুলছো– এ সবই গুপ্তচরবৃত্তির অন্তর্ভূক্ত।

রহস্যময় এক গুপ্তচর

খলিফা মু'তাদিদের কাসেম বিন আবদুল্লাহ নামের এক মন্ত্রী ছিল। সে ছিল খলিফার বিশেষ আস্থাভাজন। অন্য দশজন গুরুত্বপূর্ণ পদধারী ব্যক্তির মতো পরিবার, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে মন্ত্রীরও একান্ত ব্যক্তিগত এক জীবন ছিল। স্বাভাবিকভাবেই

খলিফা তার সে জীবন সম্পর্কে ওয়াকিফ ছিলেন না। রাজ দরবারের দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফেরার পর মন্ত্রী তার সেই জীবনে প্রবেশ করতেন। মেতে ওঠতেন হাসি-আনন্দে। খেল-তামাশায়।

একদিনের কথা। মন্ত্রী খলিফার দরবারে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার পর খলিফা তাকে ডেকে বললেন, কাসেম!

জি হুজুর।

গতকাল তুমি অমুক জায়গায় অমুক অমুকের সাথে সময় কাটানোর সময় আমাকে ডাকলে না কেন?

খলিফার মুখে তার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য শুনে মন্ত্রীর চেহারা মলিন হয়ে গেল। খলিফা কী করে তার ব্যক্তিগত বিষয় জানতে পারল– তা ভেবে তিনি অবাক হলেন। তথাপি তিনি ঠোটের কোণে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রেখে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন।

রাজ দরবার থেকে বেরিয়ে তিনি তার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজনকে ডেকে বললেন, খলিফা মুতাদিদ আজ আমাকে এই এই বলেছেন। আল্লাহর দোহাই লাগে, আমাকে বলো, তিনি কী করে এসব জানতে পারলেন?

বন্ধুটি বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে বিষয়টি আমি দেখছি।

পরেরদিন বন্ধুটি খুব ভোরে মন্ত্রীর বাড়ি চলে এলো। সে দূর থেকে বাড়ির প্রহরীদের ওপর নজর রাখল। অনেকক্ষণ পর সে দেখল হামাগুড়ি দিয়ে চলা পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক ভিক্ষুক মন্ত্রী কাসেমের বাড়ির সামনে এলো। প্রহরীদের সাথে তার বেশ খাতির দেখা গেল। সবাই তার সাথে হাসি তামাশা করল। কুশল বিনিময় শেষে একপর্যায়ে সে জিজ্ঞেস করল, মন্ত্রী কাসেমের কী খবর?

প্রহরীরা বলল, তিনি ভালোই আছেন।

গতরাতে তিনি কখন বাড়ি ফিরেছেন?

গতরাতে তিনি বেশ দেরি করে বাড়ি ফিরেছেন। তিনি গতরাতে অমুকের সাথে ছিলেন।

অতঃপর ভিক্ষুকটি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। ভিক্ষুক বলে প্রহরীদের কেউ তাকে বাধা দিল না। সে হামাগুড়ি দিতে দিতে বাড়ির চৌহদ্দির ভেতর ঢুকে গেল।

সেখানেও সে চমৎকার কৌশলে মন্ত্রী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করল। এমনকি গতকাল কি রান্না হয়েছে সে সম্পর্কেও জানল। অতঃপর সবার কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বন্ধুটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলল। দেখল, সে একটি ঘরে প্রবেশ করে সেখান থেকে সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসছে। তার গায়ে সেই ভিক্ষুকের পোশাকের পরিবর্তে এখণ শোভা পাচ্ছে মূল্যবান পরিপাটি পোশাক। হামাগুড়ির বদলে সে এখণ দিব্যি হেঁটে চলছে। হাতে থাকা থলে থেকে ভিক্ষুকদের দান করছে।

এ অবস্থা দেখে বন্ধুটি যারপর নাই আশ্চর্য হল । অতঃপর সে আরেকটি বাড়িতে প্রবেশ করল। সন্ধ্যার পর এক আগন্তুক সেই বাড়ির সামনে এলো। দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে একটি কাগজ দেয়া হল। আগন্তুক কাগজটি নিয়েই চলে যাচ্ছিল। এরইমধ্যে সেই বন্ধুটি তাকে জাপটে ধরে আটকে তাকে কাসেমের কাছে নিয়ে এলো।

কাসেম তাকে বলল, বাঁচতে চাইলে সবকিছু খুলে বলো।

সে বলল, দেখুন, আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি কিছুই জানি না। আপনারা আমাকে কেন ধরে এনেছেন?

কিছু উত্তম-মাধ্যম দেওয়ার পর সে স্বীকার সবকিছু স্বীকার করল। বলল, খলিফা মুতাদিদ আমাকে এক হাজার দেরহাম দিয়ে আপনার ব্যাপারে সব তথ্য জোগাড় করতে বলেছেন। তাই আমি পক্ষাঘপাতগ্রস্ত রোগীর ভান করে ভিক্ষুক সাজি। কাজের সুবিধার্থে আপনার বাড়ির পাশেই একটি ঘর ভাড়া নিই। এবং ভিক্ষুক সেজে আপনার ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করি। অতঃপর সারাদিনের

যোগাড় করা তথ্যগুলো একটা কাগজে লিখি। রাতে খলিফার পক্ষ থেকে একজন দূত এসে কাগজটি আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়।

মন্ত্রী তার বর্ণনা শুনে তাকে আটক করে রাখেন।

পরদিন রাতে যথারীতি খলিফার দূত এসে দরজার কড়া নাড়লে তার স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে বলল, আমার স্বামীতো গতকাল থেকে বাড়ি আসেনি। কারা যেন তাকে ধরে নিয়ে গেছে। জানি না তার কী হয়েছে। পরের রাতেও স্ত্রী তার স্বামী বাড়ি না ফেরার কথা জানালো।

প্রতিদিনের ন্যায় মন্ত্রী কাসেম কাজে যোগ দিলেন। রাজদরবারে খলিফার পাশে এসে আসন গ্রহণ করলেন। বসতে না বসতেই খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির কী খবর কাসেম?

আমি জানি না, হে আমিরুল মুমিনীন।

না, তুমি জানো। আল্লাহর কসম, যদি তুমি তাকে হত্যা করো অথবা তার কোনো ক্ষতি করো তাহলে আমি তোমাকে... তবে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে তোমার সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমি তোমার ব্যাপারে আর কখনও গুপ্তচরবৃত্তি করব না। তুমি লোকটিকে ছেড়ে দাও।

আচ্ছা ঠিক আছে...। অতঃপর তিনি সম্মানস্বরূপ তাকে কিছু দিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

গল্পটি আমি ইবনুল জাওযির 'আল মুনতাযাম ফি আখবারিল মুলূকি ওয়াল উমাম' গ্রন্থে পড়েছিলাম। পড়েই বিস্মিত হয়েছিলাম, সুবহানাল্লাহ! অন্যের গোপন বিষয় জানার জন্য মানুষ এতোটা কৌতূহলী হতে পারে?

গুপ্তচরের চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ

অন্যের গোপন বিষয়ে জানার আগ্রহ অধিকাংশ মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। তুমি দেখবে, একান্ত আপন ভেবে কারও কাছে যে গোপন বিষয়টি প্রকাশ করেছ, সে তা অন্যের কাছে বলে দিয়েছে। অতএব,

নিজের গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করাটা সমীচীন নয়। কেননা, যে গোপন কথা তুমি নিজেই তোমার মাঝে আটকে রাখতে পারছ না, অন্যের জন্য তা আটকে রাখা দুঃসাধ্যই বটে।

তাই কারও পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করা বৈধ নয়। তবে এতে যদি কোনও কল্যাণ নিহিত থাকে সেটা ভিন্ন কথা। উদাহরণত, কারও ব্যাপারে সন্দেহ হল যে, সে হয়তো নেশাজাত দ্রব্য পাচারের সাথে জড়িত। তাহলে তার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করাটা কল্যাণকামিতার পর্যায়ভূক্ত। এক্ষেত্রে গুপ্তচরবৃত্তি অবৈধ নয়।

তদ্রূপ কারও ব্যাপারে সন্দেহ হল যে, সে ব্যাভিচার কার্যের সহযোগিতা করে থাকে। তাহলে তার ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি করাটাও কল্যাণকামিতার পর্যায়ভূক্ত। বরং এধরণের ব্যক্তিদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা দায়বদ্ধ। কারণ, এসবই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পর্যায়ভূক্ত। কিন্তু ঢালাওভাবে গুপ্তচরবৃত্তি করা যাবে না। এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ-র নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এক হাদিসে রাসুল ﷺ গুপ্তচরের চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, এটি বিনিময়হীন [বোখারী]। অর্থাৎ, এর বিপরীতে কোনো জরিমানা নেই।

রাসুল ﷺ একবার হরিণের শিং দিয়ে মাথা ঘষছিলেন। এসময় একজন লোক এসে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালো। রাসুল ﷺ লোকটির চোখ উপড়িয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিলেন। কিন্তু সে দৌঁড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপারে রাসুল ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, এটি বিনিময়হীন। যাতে মানুষ অন্যের গোপন বিষয় জানার আগ্রহী না হয়। কারণ এর দ্বারা সমাজে ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

অন্য এক হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন–

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

> কারো মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে। [সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৯২]

ইসলামের সৌন্দর্য

রাসুল ﷺ বলেছেন–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

> ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকা। [মুসনাদে আহমাদ : ১৭৩৭]

প্রিয় বন্ধু! কারও পারিবারিক ঝামেলার কথা জেনে তোমার কী লাভ? গতরাতে কে কার সাথে ঝগড়া করেছিল তা জেনে তুমি কী করবে? মনে রেখো, অপ্রয়োজনীয় কাজ এড়িয়ে চলাই একজন মুসলমানের প্রকৃত সৌন্দর্য।

ইসলামের সুন্দরতম শিক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কোরআন তেলাওয়াত করা। পূর্বাহ্নের সালাত আদায় করা। অধিকহারে আল্লাহ ﷻ-র জিকির করা। অপ্রয়োজনীয় কথা কিংবা কাজ এড়িয়ে চলা।

নবী করিম ﷺ সর্বদা অর্থহীন কর্মকান্ড এড়িয়ে চলতেন। তুচ্ছ বিষয়ে তিনি কখনও দৃষ্টি দিতেন না। ইতিহাস বলে সাহাবায়ে কেরামও এমনই ছিলেন। নবী করিম ﷺ কখনও সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিগত বিষয় জানার চেস্টা করতেন না। তবে যদি কারো সংশোধনের প্রয়োজন পড়ত, সেটি ভিন্ন কথা।

একবার রাসুল ﷺ কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। জাবের বিন আবদুল্লাহ رضي الله عنه তাঁর সাথে ছিলেন। মরুভূমির বুক চিরে এগিয়ে চলছে সারিবদ্ধ মুসলিম কাফেলা। মাথার ওপরের জ্বলজ্বলে সূর্যের প্রখর তাপে পুড়ছে সবাই। খানিক দূরেই মদিনা। হঠাৎ জাবের رضي الله عنه-র উটটি মাটিতে থুবড়ে পড়েল। রাসুল ﷺ কাছে এসে বললেন, জাবের, দ্রুত চলো। জাবের رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার উটটি হাঁটছে না। রাসুল ﷺ বললেন, তাকে ওঠানোর চেস্টা করো। তিনি চেস্টা করলেন। রাসুল ﷺ বললেন, আমাকে একটি লাঠি দাও। জাবের رضي الله عنه লাঠি দিলেন। রাসুল ﷺ লাঠি দিয়ে উটটিকে আঘাত করলেন এবং দোআ করলেন। অতঃপর উটটি আল্লাহর ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে গেল এবং চলতে শুরু করল।

রাসুল ﷺ ও জাবের رضي الله عنه দুজন পাশাপাশি চলছিলেন। জাবের رضي الله عنه তখন ২১ বছরের টগবগে যুবক।

রাসুল ﷺ জাবের رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করলেন, জাবের, তুমি কি বিয়ে করেছ?

জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি বিয়ে করেছি।

রাসুল ﷺ খুশি হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী নাকি পূর্ব বিবাহিতা?

পূর্ব বিবাহিতা।

রাসুল ﷺ বললেন, তুমি কেন একজন কুমারী যুবতী মেয়েকে বিয়ে করলে না। যার সাথে তুমি আনন্দ উপভোগ করতে এবং সেও তোমার সাথে আনন্দ উপভোগ করত?

ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতা শহিদ হয়েছেন। আমার বিবাহ বয়স্কা নয়জন যুবতী বোন রয়েছে। আমি তাদের মাঝে তাদেরই মতো আরেকটি মেয়েকে নিয়ে আসতে চাইনি। তাই তাদের চেয়ে বয়সে বড় একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি। যেন সে তাদের জন্য মায়ের ভূমিকা পালন করতে পারে।

তার এ ত্যাগ রাসুল ﷺ-র খুব পছন্দ হল। তিনি তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে চাইলেন। বললেন, জাবের, তোমার উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে?

জাবের رضي الله عنه অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটি তো এখন সুস্থ। এখন কি এটিকে বিক্রি করে দেব?

হ্যাঁ ওটাই আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

বেশ, আপনি এটি নিয়ে যান।

না এমনি নেবো না; আমার কাছে বিক্রি করো।

ইয়া রাসুলাল্লাহ, দাম কত দেবেন?

এক দিরহাম।

ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে ঠকাবেন? একটি উট মাত্র এক দিরহাম।

আচ্ছা, তাহলে দু'দিরহাম?

হে আল্লাহর রাসুল আপনি আমাকে ঠাকবেন!

তিন, চার, পাঁচ এমন করে রাসুল ﷺ চল্লিশ দিরহার পর্যন্ত পৌঁছলেন।

জাবের رضي الله عنه বললেন, আমি এখন বিক্রি করতে রাজি আছি। তবে একটি শর্ত আছে। মদিনা পৌঁছা পর্যন্ত আমি এ উটে আরোহণ করব।

মদিনায় পৌঁছার পর জাবের رضي الله عنه বাড়িতে গিয়ে পরিবারের কাছে মালসামানা রেখে রাসুল ﷺ-র কাছে এলেন। উটটি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। রাসুল ﷺ বেলাল رضي الله عنه-কে ডেকে বললেন, বেলাল, উটটি বেঁধে রাখো আর জাবেরকে চল্লিশ দেরহাম দিয়ে দিয়ে দাও। সাথে কিছু বাড়িয়ে দাও।

বেলাল رضي الله عنه জাবের رضي الله عنه-কে চল্লিশ দেরহাম দিয়ে দিলেন। সাথে আরো কিছু বেশি দিলেন। জাবের رضي الله عنه টাকা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলেন, এ টাকা দিয়ে কী করা যায়? আরেকটা উট কিনব নাকি আরেকটা বিয়ে করব? কোনো বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করব নাকি বাড়ির জন্য খাবার কিনে নেব? উটটি যখন ছিল তখন তা নিয়ে সফরে বের হতাম, পরিবারের জন্য জ্বালানি ও খাবার পানি সংগ্রহ করতাম। কিন্তু এখন এ টাকাগুলো দিয়ে আমি কি করতে পারি?

জাবের رضي الله عنه-কে ইতঃস্তত দেখে রাসুল ﷺ বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে ডেকে বললেন, বেলাল, জাবেরকে উটটি দিয়ে দাও। আর তাকে বল উট এবং দেরহাম দুটোই তোমার।

জাবের رضي الله عنه অত্যন্ত খুশি হলেন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদের গোপন বিষয়গুলোকে গোপন রাখুন। দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। বরকত ও কল্যাণ দিয়ে আমাদের জীবন পূর্ণ করুন।

কখনও জুলুম করো না

ইতিহাসের পাতায় পাতায় বহু রহস্যময় ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেগুলোর রয়েছে ব্যাপক আবেদন। বিস্তর তাৎপর্য। রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমারা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা ছিলেন সেসব ঘটনার মূলনায়ক। ঘটনাগুলোর কারণ আজও অজানা। ইতিহাসের তেমনি এক রহস্যময় ঘটনার নাম– বারামাকি দুর্ঘটনা। বারামিকা দুর্ঘটনা নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করব না। কারণ সেটি অনেক দীর্ঘ। তবে দুজন ব্যক্তির কথা না বললেই নয়। একজন– শায়খ আবুল ফজল ইয়াহইয়া বারমাকি। অপরজন–তার ছেলে আবু খালেদ ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকি। ইয়াহইয়া বারমাকি বাদশাহ হারুনুর রশীদের দুধ-সম্পর্কীয় পিতা ছিলেন। বাদশাহ তাকে অনেক সম্মান করতনে। তথাপি বাদশাহ হারুনুর রশীদ তাকে বন্দি করেছিলেন এবং এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। বারমাকিদের সাথে এরূপ আচরণ সম্পর্কে বাদশাহ হারুনুর রশীদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– আপনি কেন বারমাকিদের সাথে এমনটি করলেন? কেন এক সকালে হঠাৎ তাদেরকে বন্দি করলেন, তাদের সমুদয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আমার এ হাত যদি এর কারণ জানতো কিংবা এরসাথে জড়িত থাকতো, তাহলে আমি এটিকে কেটে ফেলতাম। এভাবে বাদশাহ হারুনুর রশীদ কেন তার দুধ-সম্পর্কীয় পিতা ও তার সন্তানদের সাথে এরূপ আচরণ করলেন, তা অজানাই থেকে গেল। বারমাকি দুর্ঘটনা রয়ে গেল ইতিহাসের একটি রহস্যময় অধ্যায় হয়ে।

রহস্যঘেরা সেই ঘটনা

পূর্বেই জেনেছি বারমকি হারুনুর রশিদের দুধ-সম্পর্কীয় পিতা ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তথাপি হারুনুর রশিদ তাকে জেলখানায় বন্দি করলেন। তার সন্তানাদির মধ্য হতে কাউকে হত্যা ও কাউকে বন্দি করলেন। ইয়াহইয়া বারমাকি ছিলেন একজন ৮০ উর্ধ্ব বৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তার পুত্র খালেদকেও তার সাথে একই কারাগারে বন্দি করা হয়। খালিদ ছিল তার পিতার একান্ত অনুরক্ত। পিতার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসায় তার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। কথিত আছে, তাদেরকে যেই জেলখানায় রাখা হয় সেটি ছিল বহু পুরনো। দেয়ালগুলো ছিল জীর্ণশীর্ণ। প্রাকৃতিক কার্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থপনা ছিল অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় পানির অভাব ছিল প্রকট। বন্দিদেরকে সর্বদা পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হতো কিংবা একের সাথে অন্যকে বেঁধে রাখা হতো। এরমধ্যে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধির জন্য তাপ গ্রহণের জ্বালানি সংগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া হল। ভোরে তীব্র ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করতে বয়োবৃদ্ধ ইয়াহইয়া বারমাকির অনেক কষ্ট হতো।

তাই তার রাত গভীর হলে এবং পিতা ঘুমিয়ে পড়লে খালিদ একটি পাত্রে পানি দিয়ে ওপরে টানানো বাতির নিচে ধরে রাখত। এভাবে দীর্ঘসময় ধরে রাখার ফলে পানি খানিকটা গরম হতো। ফজরের আজান হলে পিতার সামনে ওযু করার জন্য সেই পানি পেশ করত। জেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনে গেল। এতটুকু সুবিধা প্রদানেও তাদের আপত্তি ছিল। তাই তারা ওই বাতিটি খুলে নিয়ে গেল। অতঃপর খালেদ পিতার জন্য পানি গরম করতে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করল। পিতা ঘুমানেরার পর খালিদ পাত্রটিতে পানি ভরে তা পেট ও রানের সাথে লাগিয়ে সারারাত দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকত। শরীরের তাপে পানি হালকা গরম হতো। ফজরের সময় পিতাকে ওযু করার জন্য সে পানি পেশ করত।

এভাবে পিতা-পুত্র ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এতো কষ্ট তাদের সহ্য হচ্ছিল না। তাদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা ছিল। একদিন মুররাহ বিন মুসল্লি নামের খলিফার এক কর্মচারী ইয়াহইয়ার কাছে এসে বলল,

খলিফা আপনাকে দশ লাখ টাকা দিতে বলেছেন। না দিলে আপনাকে হত্যা করা হবে। কারণ, আপনি এই দশ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

ইয়াহইয়া বারমাকি কাঁদতে লাগলেন। তিনি তার ছেলেকে বললেন, দেখো তো এখানে কত আছে?

ছেলে গুনে বলল, পাঁচ লাখ আছে।

তিনি ছেলেকে বললেন, আমি শুনেছি তুমি অমুক বাগানটি কিনবে। সেই বাবদ তোমার কাছে কত জমা আছে?

ছেলে বলল, দুই লাখ টাকা।

অতঃপর তিনি তার আরেক ছেলের কাছে টাকা চেয়ে খবর পাঠালেন। মেয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে বললেন যে, আমাদের অনেক টাকা দরকার। তোমার গহনা-গাটি বিক্রি করে হলেও আমাদের সাহায্য কর। এভাবে তিনি ১০ লাখ টাকা জোগাড় করে বাদশাহের সেই বিশেষ কর্মচারীর হাতে তুলে দিলেন।

লোকটি টাকাগুলো নিয়ে খলিফার কাছে দিল। খলিফা তার হত্যার হুকুম মুলতবি করলেন। লোকটি আবার ইয়াহইয়ার কাছে এসে বলল, খলিফা তোমার সম্পর্কে কী বলেছেন জান?

কী বলেছে?

তিনি বলেছেন, আমার শক্তি ও ক্ষমতার ভয়ে তারা টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে।

ইয়াহইয়া বারমাকি লোকটিকে বললেন, আসলে সে বুঝতে ভুল করেছে। নিরুপায় হয়ে সে এখন বাহানা খুঁজছে।

বস্তুত, ইয়াহইয়া বারমাকি ছিলেন এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সম্মানিত ব্যক্তি। জেলখানার চার দেয়ালের মাঝে সীমাহীন কষ্টে তার দিন কাটছিল। যথাযথ সেবা যত্নের অভাবে তিনি দিনদিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একদিন তার পুত্র খালিদ তাকে বলল, বাবা,

আমাদের এই অবস্থা কেন? কী কারনে আজ আমাদেকে এই অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে?

তিনি জবাবে বললেন, হে আমার ছেলে, নিকষ আঁধারেও মজলুমের দোআ ছড়িয়ে যায়। আমরা বেখবর হলেও আমাদের প্রভু বেখবর নন। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন–

رُبَّ قَوْمٍ قَدْ غَدَرُوْا فِيْ نِعْمَةٍ * زمنا وَالدَّهْرُ رُبَّان غدق

سَكَتِ الدَّهْرُ زَمَانًا عَنْهُمْ * ثُمَّ أَبْكَاهَا دَمًا حِيْنَ نطق

অনেক মানুষ রয়েছে, প্রাচুর্যের মাঝে যাদের বসবাস। অথচ সময় হল প্রধান নাবিক।

কিছুকাল সে নিরব থাকে, অতঃপর যখন সে সরব হয়, তখন তাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মৃত্যুশয্যায় ইয়াইইয়া বারমাকি একটি কাগজে কিছু লিখে নিজের আস্তিনের রেখে দিলেন। অতঃপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার মৃত্যুর পর এই চিরকুটটি খলিফাকে দেবে। অসিয়ত মোতাবেক মৃত্যুর পর সেই চিরকুটটি খলিফার কাছে পৌঁছানো হল। খলিফা সেটি খুলে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে– বিবাদমান দুপক্ষের একপক্ষ আদালতে পৌঁছে গেছে। প্রতিপক্ষও শীঘ্রই এসে যাবে। অতঃপর তারা এমন এক বিচারালয়ে হাজির হবে, যার বিচারক হলেন আল্লাহ ﷻ। সাক্ষী হলেন ফেরেশতাগণ। হে হারুণ, তুমি আমার প্রতি সীমাহীন জুলুম করেছ। জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আমাকে বন্দি করেছ। সেখানে আমার সাথে জঘন্য আচরণ করেছ। তোমার অনিষ্ট থেকে আমার সন্তানরাও মুক্তি পায়নি; কিন্তু অচিরেই আমরা আল্লাহর সামনে সমবেত হবো।

মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো

মুআজ رضي الله عنه বলেন, রাসুল ﷺ আমাকে ইয়ামান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি উটের পিঠে চেপে বসলাম। রাসুল ﷺ তখন পায়ে হেঁটে চলছিলেন। সেসময় তিনি আমাকে বললেন–

মুআজ, সম্ভবত এরপর তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। মুআজ, মদিনায় এটিই আমার শেষ বিচরণ।

বাস্তবিকই মুআজ ﷺ এরপর আর রাসুল ﷺ-কে দেখতে পাননি। তিনি বলতে থাকেন, সম্ভবত এরপর তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। হয়তো আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে।

এরপর তিনি মুআজ ﷺ-কে কয়েকটি বিষয়ে নসিহত করে বলেন–

মুআজ, মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো; কেননা, এই বদদোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না।

জ্ঞানীদের বাণী– ঘুমন্ত ব্যক্তির বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তোমাকে বদদোয়া দেওয়ার জন্য সে জাগ্রত।

نَامَتْ جَفُوْنَكَ وَالْمَظْلُوْمُ مَيْتَةٌ * يَدْعُوْ عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمْ

> তোমার অত্যাচার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, মজলুম হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু সে তোমার উপর বদদোয়া করেই চলছে, মনে রেখো, নিদ্রা আল্লাহকে স্পর্শ করতে পারে না।

বহু মানুষ রয়েছে যারা অন্যের ওপর জুলুম করে থাকে। অতঃপর মজলুম ব্যক্তি রাতের আঁধারে তার জন্য বদদোআ করে। ফলে সে বিভিন্ন বিপদাপদের সম্মুখিন হয়। রাসুল ﷺ বলেন–

بابانِ مَعَجَّلانِ عُقُوبَتُهُما فِي الدُّنْيا البَغْيُ والعُقُوقُ

> দুই কারণে মানুষ দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করা হয়। একটি হল জুলুম, অপরটি হল অবাধ্যতা। [মুস্তাদরাকে হাকিম : ৭৩৫০]

জুলুমের শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়। কখনও সেটা হয় হার্ট এ্যাটাকের মাধ্যমে, কখনও ব্যবসায় লোকসানের মাধ্যমে, কখনও প্যারালাইসিসের মাধ্যমে, কখনও সন্তানদের সাথে বিবাদের মাধ্যমে, কখনও অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে, কখনও স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার মাধ্যমে, কখনও শারীরিক ক্ষতির মাধ্যমে, কখনও রক্ত, কিডনি কিংবা কলিজায় সমস্যার মাধ্যমে। মজলুমের অভিশাপ ভেদ করতে পারে রাতের আঁধারকেও। তুমি বেখবর হলেও তোমার রব বেখবর নন।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ ﷻ বলেন–

يَا عِبَادِي ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا

> হে আমার বান্দাগণ, আমি নিজে অন্যের ওপর জুলুম করাকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্য তা হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা জুলুম করো না। [মুসলিম : ৬৭৩৭]

অর্থাৎ, মনিব তার অধীনস্ত কর্মচাদের ওপর জুলুম করবে না। স্বামী তার স্ত্রীর ওপর জুলুম করবে না। ভাই বোনের ওপর জুলুম করবে না। শিক্ষক ছাত্রের ওপর জুলুম করবে না। ইমাম তার মুসল্লির ওপর জুলুম করবে না। বিচারক তার নিকট বিচারপ্রার্থীর ওপর জুলুম করবে না। শাসক জনগণের ওপর জুলুম করবে না।

অনেক সময় দেখা যায় কোনো কর্মচারীর ভালো কোথায় চাকরি হয়। তখন অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের জন্য সে তার মালিকের কাছে আসে। তখন মালিক তাকে তাড়িয়ে দেয়। বলে, আমি তোমাকে কোনো সার্টিফিকেট দেব না।

তখন কর্মচারী বলে, আমি তো এতদিন আপনার অধীনে কাজ করেছি। সব দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছি। কাজ ফাঁকি দিয়ে আপনার প্রতি কখনও জুলুম করিনি। তাহলে আজ কেন আপনি আমাকে আমার অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট না দিয়ে জুলুম করছেন?

মালিক বলে, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে রাজি নই। তুমি চলে যাও।

এটা সম্পূর্ণরূপে জুলুম। হাদিসে এসেছে, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে রাসুল ﷺ ১৫ দিন বিছানায় ছিলেন। এ অবস্থায় একদিন তিনি খুব কষ্ট করে মসজিদে যান। মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন–

লোকসকল, তোমাদের মধ্য হতে আমার একজন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার সময় এসে গেছে। আমি যদি কারও পিঠে আঘাত করে থাকি,

এই আমার পিঠ, সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। আমি যদি কারও সম্পদ নিয়ে থাকি, এই যে আমার সম্পদ, সে যেন এখান থেকে নিয়ে নেয়। আমি যদি কাউকে গালি দিয়ে অপমান করে থাকি, সে যেন আমার সাথেও একই আচরণ করে। সে যেন হিংসা-বিদ্বেষকে ভয় না করে; কেননা, এটা আমার শান নয়।

এতটুকু বলার পর তিনি দেখলেন, সাহাবিরা সবাই কাঁদছে। হৃদয়ের অস্থিরতার কারণে তারা নিজেদেরকে স্থির রাখতে পারছে না। তখন তিনি বললেন–

তিনি আমাকে বৈধতা দিয়েছেন এবং ক্ষমা করেছেন। কিংবা বলেছেন– তিনি আমাকে বৈধতা দিয়েছেন এবং আমি আমার রবের সাথে প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাত করব। অথবা তিনি বলেছেন– (আমি আমার রবের সাথে সাক্ষাত করব) এমতাবস্থায় যে, আমার ওপর কারও কোনো ঋণ নেই। [মুজামুল কাবির তাবরানি : ২৮০]

তাই, হে কোম্পানির মালিকগণ! হে কর্মচারীদের বেতন অপরিশোধকারীগণ! হে ওই সকল নারীগণ, যারা তোমরা চাকর-বাকরদের ওপর জুলুম করছ, সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ। হে ড্রাইভারের বেতন অপরিশোধকারীগণ! হে ওই সকল পিতাগণ! যারা সন্তানদের ওপর জুলুম করছ। তোমার ছেলের স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল, গাড়ির প্রয়োজন ছিল, লেখাপড়া শেষ করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তুমি তার ওপর জুলুম করেছ। হে ওই সকল স্ত্রীগণ! যারা তোমরা তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে চাপ দিয়ে যাচ্ছ– তোমাদেরকে বলছি, তোমরা জুলুমের পথ পরিহার করো। রাসুল ﷺ-র এই বাণী মনে রাখো–

> নিশ্চয় আমার ওপর আমি জুলুমকে হারাম করেছি, তাই তোমরা জুলুম করো না। [মুসলিম : ৬৭৩৭]

যে মানুষ অন্যের ওপর জুলুম করা থেকে নিজেকে নিবৃত রাখে, সে আল্লাহ ﷻ-র সামনে নিষ্পাপ অবস্থায় উপস্থিত হবে। তার থাকবে না কোনো অসহায়ত্ব। থাকবে না সম্মানের কোনো কমতি। থাকবে না

অত্যাচারিত হবার কোনো ভয়। চিরস্থায়ী সাফল্য তার জন্য রয়েছে অপেক্ষমান।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন–

আল্লাহ ﷻ ন্যায়পরায়ণ শাসককে সাহায্য করেন, যদিও সে কাফের হয়। আর অত্যাচারী শাসককের ধ্বংস করেন যদিও সে মুসলিম হয়।

এবার ভেবে দেখো, জুলুম কী ঘৃণ্য ও জঘন্য জিনিস! তাই নিজেরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকবে। পাশাপাশি জালেমদেরকেও বোঝাবে। তাদেরকে জুলুমের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। কোনো মালিক যদি তার কর্মচারীদের ওপর জুলুম করে, কোনো স্ত্রী যদি তার সতীনের সন্তানের প্রতি জুলুম করে, কোনো ভাই যদি তার বোনের ওপর জুলুম করে, কোনো প্রতিবেশি যদি তার প্রতিবেশির ওপর জুলুম করে তাহলে সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে বোঝাবে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে জুলুম থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন। আমাদের জীবনকে বরকতময় করুন। আমিন।

পাপের কলকাঠি হয়ো না

ইয়ামামার নজদ এলাকায় এক বৃদ্ধ ছিল। নাম তার আ'শা ইবনে কায়েস। সেসময় নজদের মানুষেরা গম, যব ইত্যাদি পণ্য মদিনায় রপ্তানি করত। আ'শা ছিল তার গোত্রের প্রধান ব্যক্তি। জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ক। পাশাপাশি তার কাব্য প্রতিভাও ছিল দারুণ। তার কাব্যের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

নব্বইয়ের ঘর অতিক্রম কারী এ বৃদ্ধটি একদিন রাসুল ﷺ-র দীনের দাওয়াতের কথা শুনতে পেলো। কোরআন নাযিলের কথাও জানতে পারল। শেষ বয়সে মূর্তিপূজা ছেড়ে রাসুল ﷺ-র হাতে ইসলাম গ্রহণ করার সাধ জাগল তার। সে ইয়ামামা থেকে রাসুল ﷺ-র সাথে

সাক্ষাত করার জন্য সফর শুরু করল। অবিরাম সফর করে মদিনার পানে এগুচ্ছিল। তার মনের পর্দায় বারবার ভেসে ওঠছিল রাসুল ﷺ নূরানী মুখচ্ছবি। তার হৃদয় নবীজীর সাক্ষাত লাভে হচ্ছিল ব্যকুল। তার জবান রাসুলের প্রশংসায় একের পর এক কাবিতা আওড়াচ্ছিল–

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدٍ * وَبِتُّ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدًا

أَلَا أَيُّهَا السَّائِلُ أَيْنَ يَمَّمْتَ * فَإِنَّ لَهَا فِيْ أَرْضِ يَثْرِبِ مَوْعِدًا

نَبِيًّا يَرى مَالَا تَرَوْنَ وَذِكْرَه * أَغَارُ لَعُمْرِيْ فِي الْبِلَادِ وَأَنْجَدَا

أجدك لم تسمع وصاة محمد * نبي الاله حيث أوصى وأرشدا

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَل بِزَادٍ مِنَ التُّقى * وَأَبْصَرتَ يَوْمَ الْحَشْرِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

نَدِمْتُ عَلى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِه * فَتَرْصُدْ لِلْأَمْرِ الَّذِيْ كَانَ أَرْصَدَا

তোমার দু’চোখ কি বন্ধ থাকেনি? তবে সুস্থ ব্যক্তির মতোই রাত্রিযাপন করি আমি।

কোথায় যাবার ইচ্ছা তোমার হে (সাক্ষাত) প্রার্থী? মদিনার ভূমিতে রয়েছে তোমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি।

তোমাদের অদেখাও দেখতে পান যিনি, তিনি এমন নবী। শপথ আমার প্রাণের, দেশে দেশে তাঁর আলোচনা ঈর্ষা জাগিয়েছে, প্রসারিত করেছে সাহায্যের হাত।

আমি তোমাকে বলছি, মুহাম্মাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা শুনতে পায় নি, তিনি সত্য নবী। তিনি উপদেশ দেন ও সুপথ দেখান।

পরকালে যদি তুমি তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে না যাও, আর সেখানে পাথেয় নেয়া কারো সাথে যদি দেখা হয়ে যায়, তাহলে সেদিন তুমি তার মতো না হতে পারার অনুশোচনায় পুড়বে।

তাই তার মতো তুমিও প্রস্তুতি নাও।

সে কবিতা পাঠ করছিল আর অবিরাম পাহাড়-পর্বত ও মরু-প্রান্তর অতিক্রম করছিল। মনে তার দৃঢ় সংকল্প– দেখা করবে নবীর সাথে। আস্তাকূড়ে ছুড়ে ফেলবে কুফর-শিরকের পঙ্কিলতা।

সম্পদের লোভে সংকল্প ত্যাগ

আ'শা বিন কায়েস যখন মদিনার কাছাকাছি পৌঁছল, তখন কিছু কাফের এসে তার পথ আগলে দাঁড়াল। তারা জানতে চাইল তার সফরের উদ্দেশ্য।

সে বলল, আমি রাসুল ﷺ-র সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

তারা ভড়কে গেল। মনে মনে ভাবল, এই কবি যদি মুহাম্মাদের সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে তো মুহাম্মাদের শান আরো বেড়ে যাবে। তিনি হয়ে উঠবেন আরো শক্তিশালী। হাচ্ছান বিন ছাবেত رضي الله عنه একাই তো তাদের অবস্থা নাজেহাল করে ছাড়ছে। এখন যদি এই কবিও ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তো উপায় নেই।

সে যুগের কবিরা কবিতার মাধ্যমে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত। দুটি ঘটনা বলছি।

ঘটনা-১.

ওমর رضي الله عنه-র খেলাফতকালে একবার গভর্ণর যিবরিকান ইবনে বদর ওমর رضي الله عنه-র নিকট একটি অভিযোগ নিয়ে এল। সে বলল, হে ওমর, কবি জারির আমার নিন্দা রটনায় কবিতা আবৃত্তি করেছে।

ওমর رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, সে কী বলেছে?

যিবরাকান বলর, সে বলেছে–

دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا * وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِيْ

তুমি সম্মানীদের সান্নিধ্য ত্যাগ করো, সে উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করো না, তুমি বসে থাকো, কারণ কেবল পানাহার ও পরিধানই তোমার কাজ।

কবিতাটি শোনার পর ওমর رضي الله عنه বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে সে এই কবিতায় তোমার প্রশংসা করছে। সে বলেছে তুমি বসে থাকো, আমরাই তোমার খেদমত করবো।

যিবরিকান বললেন, না, ব্যাপারটা এমন নয়। আপনি বরং হাসসান বিন সাবিতকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি কবিতা ভালো বোঝেন।

ওমর ﵁ হাসসান বিন সাবিত ﵁-কে জিজ্ঞেস করলেন, হাসসান, তোমার কি মনে হয়? সে কি এ কবিতায় তার নিন্দা করেছে না প্রশংসা?

হাসসান বিন সাবিত ﵁ বললেন, সে কেবল নিন্দাই করেনি; বরং তার গায়ে মলত্যাগ করছে।

একথা শোনার ওমর ﵁ জারিরকে ভবিষ্যতে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, ওমর ﵁ তাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে বলেছেন, মুসলমানদের মানহানি করা থেকে বিরত থাকো। আমি এ টাকার বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে মুসলমানদের সম্মান কিনে নিচ্ছি।

ঘটনা-২

একবার কোনো এক কবি এক নগরপিতার নিন্দায় কাব্য রচনা করল। নগরপিতা ক্ষুব্ধ হয়ে সেই কবির সারা গায়ে মল মেখে গোটা শহর ঘোরানোর শাস্তি ঘোষণা করল। হুকুম মতো তাই করা হল। তার গায়ে ও কাপড় চোপড়ে মল মেখে শহরে ঘোরানো হল। শাস্তি শেষে বাড়িতে এসে গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে সে আরেকটি কাব্য রচনা করল–

يَغْسِلُ الْمَاءُ مَا صَنَعْتَ وَشِعْرِيْ * ثَابِتٌ مِنْكَ فِي الْعِظَامِ الْخَوَالِي

তুমি আমার সাথে যা করেছ পানি তা ধুয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে লেখা আমার কবিতা ক্ষয়ে যাওয়া অস্থিতেও অবশিষ্ট থাকবে।

তাই কোরাইশরা তাকে বোঝাল, হে আ'শা! তোমার বাপ দাদাদের ধর্মের মাঝেই রয়েছে কল্যাণ।

সে বলল, না, রাসুল ﷺ-র ধর্মই অধিক ভালো।

তারা বলল, তিনি তো জিনাকে হারাম বলেন।

আ'শা বলল, আমি বৃদ্ধ। মহিলাদের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই।

তারা বলল, তিনি তো মদ পানকে হারাম বলেন।

আ'শা বলল, মদতো আকলকে বিকল করে দেয়। মানুষকে অপদস্থ করে। মদের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।

সত্যিই প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু মানুষ থাকে যারা মদ পান থেকে বিরত থাকে। অন্ধকার যুগেও এমন কিছু মানুষ ছিল যারা মূর্তিপূজারী ও কন্যা-হন্তারক হলেও মদ পান করত না। তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলত– আমরা দেখি, লোকেরা মদ পান করে তার মাকে গালি দেয়, বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাই আমরা মদ পান করি না।

সত্যিই মদ আকলকে বিকল করে দেয়। জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয়। তাই রাসুল ﷺ বলেছেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে, তারপর যদি তাওবা না করে, তাহলে সে আখেরাতে তা পান করতে পারবে না। [বোখারী : ৫৫৭৫]

তাছাড়া রাসুল ﷺ মদকে 'উম্মুল কাবাইর' (সকল পাপের মূল) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এক হাদিসে এসেছে। রাসুল ﷺ বলেন–

আমি কি তোমাদের বড় পাপের কথা বলব? আমি কি তোমাদের বড় পাপের কথা বলব? আমি কি তোমাদের বড় পাপের কথা বলব?

সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, বলুন।

তিনি বললেন, জাদু করা, শিরক করা এবং মদ পান করা। [বোখারী]

কারণ, মদ মানুষের বিবেক কেড়ে নেয়। ব্যক্তির ধর্ম কর্ম নষ্ট করে তাকে পথহারা করে। মদ্যপ ব্যক্তি কখনও কখনও এমন কাজ করে বসে যা তাকে মানুষের হাসির পাত্রে পরিণত করে।

অতএব, অন্ধকার যুগের একজন কাফের যদি মদপান থেকে দূরে থাকতে পারে, তাহলে মুসলমান হয়ে কেন তা পরিত্যাগ করা যাবে না? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ মদ সম্পর্কে বলেন–

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। [সূরা মা-য়েদাহ, আয়াত : ৯০]

লক্ষ করো, এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ মদ ও মূর্তিপূজার আলোচনা একসাথে এনেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মদপান করবে মূর্তিপূজারীর মতো সেও কৃতকার্য হতে পারবে না।

ফিরছি আ'শা বিন কায়েসের গল্পে। কোরাইশরা যখন দেখল যে, সে ইসলাম গ্রহণে দৃঢ় প্রত্যয়ী। তখন তারা তার প্রতি লোভের জাল ফেলল। তাকে বশে আনার শেষ অস্ত্রটি ব্যবহার করল। যে সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেছেন–

আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়, কিন্তু দু জিনিসের প্রতি তার তার হৃদয় পূর্ণ যৌবন লাভ করে।

এক. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা।

দুই. দীর্ঘ আশা।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সম্পদের প্রতি মুহাব্বত এবং দীর্ঘ আশা। [বোখারী : ৬৪২০]

তাই কোরাইশরা তাকে সম্পদের লোভ দেখাল। বলল, আমরা তোমাকে ১০০ উট দেব। তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও। ইসলাম গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করো। বাপ-দাদার ধর্মেই অবিচল থাকো।

সেকালে উটের অনেক কদর ছিল। উটের বহুমুখী ব্যবহার ছিল। ভ্রমনের কাজে, স্ত্রীর মহর আদায়ে, কূপ থেকে পানি উত্তোলনে, মালামাল বহনে, দিয়াত বা রক্তপণ আদায় ইত্যাদি কাজে উটের প্রয়োজন হতো। মেহমান এলেও উট জবাই করা হতো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾

তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? [সূরা গাশিয়াহ : ১৭]

তিনি আরও বলেন–

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্যে শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আরও অনেক উপকার রয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক। [সূরা নাহল : ৫]

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসুল ﷺ সাহাবাদের কাছ থেকে যুদ্ধের জন্য কিছু অনুদান গ্রহণ করতে চাইলেন। তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন–

লোকসকল, তোমরা দান করো। তখন ওসমান رضي الله عنه বললেন, আমি ১০০ উট জিন-গদিসহ দান করব। আরেক সাহাবি বললেন, আমিও অনুরূপ ১০০ উট দান করব। রাসুল ﷺ আরও দান চাইলেন। তখন ওসমান رضي الله عنه দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ৩০০ উট জিন-গদিসহ দান করব। রাসুল ﷺ বললেন, আজকের পর ওসমান যত আমল করবে, এর সমপরিমাণ হবে না। [মুসতাদরাকে হাকিম : ৪৫৫৩]

তাই কোরাইশদের প্রস্তাব পেয়ে আ'শা মনে মনে ভাবল, এতগুলো উট হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। সে বলল, আচ্ছা! তোমরা যখন বলছ ১০০ উট দেবে, তাহলে ঠিক আছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করব না। তবে প্রথমে আমার সামনে ১০০ উট হাজির করো। কোরাইশরা ১০০ উট নিয়ে এলো।

আল্লাহ ﷻ সত্যিই বলেছেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾

নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধা দান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ

> এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তা তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে; আর যারা কাফের; তাদের দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। [সূরা আনফাল : ৩৬]

অতঃপর তারা তাকে ১০০ উট দিল। উট বুঝে পেয়ে সে আর ইসলাম গ্রহণ করল না। কাফের অবস্থাতেই স্বজাতির কাছে ফিরে চলল।

সে প্রফুল্ল চিত্তে উটগুলোকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নিজ এলাকার কাছাকাছি পৌঁছার পর আচানক সে উট থেকে পড়ে গেল। ভেঙ্গে গেল তার পা ও কোমর। পরিশেষে সে মৃত্যু বরণ করল।

> ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسۡتَحَبُّوا الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا عَلَی الۡاٰخِرَۃِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۱۰۷﴾ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ وَ سَمۡعِهِمۡ وَ اَبۡصَارِهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡغٰفِلُوۡنَ ﴿۱۰۸﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمۡ فِی الۡاٰخِرَۃِ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ﴾
>
> এটা এ জন্যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শন করেন না। এরাই তারা, আল্লাহ এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ডজ্ঞানহীন। বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [সূরা নাহল ১০৭-১০৯]

যে শিক্ষা পেলাম

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে, কিছু মানুষের হেদায়াত গ্রহণের পথে তার সঙ্গী সাথীরা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণত, কিছু মেয়ে পর্দায় চলতে চায়, ছাড়তে চায় ছেলেদের সাথে গড়ে তোলা অবৈধ সম্পর্ক, অনেক মদখোর চায় মদ পান ছেড়ে দিতে, বহু বেনামাযী ও পাপী চায় তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তখন তাদের কিছু সঙ্গী তাদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা মেয়েদের বলে, পর্দা করলে তোমার চেহারা আকর্ষণ হারাবে। তোমাকে বুড়ি মনে হবে। তোমাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। তারা যুবকদের কুমন্ত্রনা দেয়, দাড়ি বড় করলে তোমার চেহারা জৌলুস হারাবে। মানুষ তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। তুমি সালাত আদায় করতে, করো।

সিয়াম পালন করতে চাও, করো। কিন্তু দাড়ি রাখার কি দরকার। এমনিভাবে কোনো সুদখোর সুদি কারবার ছেড়ে দিতে চাইলে তারা তাকে অভাব-অনটনের ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত রাখে।

যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ﴾

আমি তাদের পেছনে কতক সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সেই সঙ্গীরা তাদের সামনের ও পেছনের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে সেই শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল,যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত। [সুরা ফুসসিলাতঃ ২৫]

অতএব, অসৎ সঙ্গীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। তারা যেন তোমাকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত না করে– সে ব্যাপারে সাবধান থাকা বাঞ্ছনীয়। আবু জাহল, আবু লাহাব, উমাইয়া ইবনে খলফ– এরা প্রত্যেকেই ছিল শয়তানের চেলা। এদের মতো ইবলিস বাহিনীর সদস্য হওয়া যাবে না।

যেমন কবি আওয়াল তার এক কবিতায় বলেছেন–

وَكُنْتُ امْرَأً مِنْ جُنْدِ إِبْلِيْسَ فَارْتَقَى * بِي الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيْسُ مِنْ جُنْدِيْ

একটা সময় ছিল যখন আমি ছিলাম ইবলিস-বাহিনীর সদস্য, এখন আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে বেশ, কারণ, কারণ ইবলিস নিজেই এখন আমার বাহিনীর সদস্য। (নাউযুবিল্লাহ)

বস্তুত, কিছু মানুষ এমন রয়েছে যাদের কর্মকান্ড দেখে শয়তান করতালি দেয়। দুহাত প্রসারিত করে তাকে বুকে টেনে নেয়। খুশিতে আটখানা হয়ে বলতে থাকে, আমার আর এখানে কী কাজ? তোমরাই তো আমার কাজ যথাযথরূপে আঞ্জাম দিচ্ছ।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন। সুপথ প্রদর্শন করুন। তাঁর আনুগত্যে সদা অবিচল রাখুন।

ডাকাত যখন মুফতি

কিছু কিছু মানুষ পাপে জড়িয়ে পড়ে। তারপর বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আত্ম তিরস্কারের শাস্তি থেকে বাঁচতে নানারকম খোঁড়া যুক্তি দিয়ে নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিতে থাকে। যেমন, মা-বাবার বিরুদ্ধাচরণ করার পর যখন কারো বিবেক তাকে প্রশ্ন করে, তুমি কেন তোমার মা-বাবার অবাধ্য হলে? তুমি জানো না এটা হারাম। এর জন্যে তোমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তখন জবাবে সে নিজেই নিজেকে বলে, বাবা আমাকে ঠিকমত টাকা-পয়সা দেয় না। আমাকে গাড়ি কিনে দেয় না। অথচ আমার অমুক বন্ধুকে তার বাবা কত টাকা পয়সা দেয়। কত বিলাসিতায় লালন পালন করে। তাই আমি তাদের অবাধ্য হয়েছি। এভাবে সে তার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখার বৈধতা খুঁজতে থাকে।

অনুরূপ ধরো, কেউ কারো সম্পদ আত্মসাৎ করল কিংবা কোনো চাকরিজীব তার কোম্পানির টাকা চুরি করল। অতঃপর তার বিবেক যদি তাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি এ হারাম কাজটি কেন করলে?

তখন সে বিবেকের দংশন থেকে বাঁচতে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, আসলে তারা আমাকে দেরিতে বেতন দেয়। তারা আমাকে এক হাজার রিয়াল বেতন দেয়ার কথা বলেছিল, অথচ এখন দেয় মাত্র ৯৫০ রিয়াল। তাই আমি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি।

আসলে এ ধরনের অপব্যখ্যা মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প বলছি। গল্পটি তানুখি رحمه الله তার اَلْفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَّةِ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এক তরুণ ছাত্র ছিল। ইলম অন্বেষণে সে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করত। তখনকার দিনে তো আর বর্তমানের মতো প্রযুক্তি ছিল না। প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ইলম অর্জন কত সহজসাধ্য হয়ে গেছে। ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ছাত্রদেরকে পাঠদান করা যাচ্ছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে একটি লেকচার একইসাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনতে পারছে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন সাইটে গিয়ে যে কেউ যে কোন ইলম অর্জন করতে পারছে। কিন্তু গল্পটি তখনকার যখন ইলম অর্জন এতোটা সহজসাধ্য ছিল না। জ্ঞানের ঝুলি পূর্ণ করতে মানুষকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করতে হতো। তো সেই তরুণ ছাত্রটি এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে রওয়ানা দিল। তার সাথে ছিল ব্যাগভর্তি কিতাবাদি। যেগুলো ছিল তার কাছে অমূল্য সম্পদ।

কাফেলা চলতে শুরু করল। পথিমধ্যে সে তাদেরকে রাসুল ﷺ-র হাদিস শোনাচ্ছিল এবং সালাতের সময় হলে তাদের ইমামতি করছিল। চলতে চলতে কাফেলা যখন এক মরুভূমিতে এসে পৌঁছল তখন হঠাৎ একদল ডাকাত তাদের ওপর হামলা চালাল। তারা তাদের মালামাল, অর্থকড়ি ও বাহন সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এমনকি ছতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় ব্যতিত গায়ের অন্যসব কাপড়গুলোও খুলে নিল।

তরুণ ছাত্রটি নিরবে দাঁড়িয়ে ডাকাতদলের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন ও তা ভাগ বাটোয়ারার দৃশ্য দেখছিল। ডাকাতেরা তারও সব অর্থ-সম্পদ ও কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে তার কোনো আফসোস ছিল না। সে শুধু তার কিতাবগুলোর জন্য বিচলিত হচ্ছিল। সে ভাবছিল, আহা! এদের কাছে তো এই কিতাবগুলোর কোনো মূল্য নেই। তারা হয়তো বোঝা কমানোর জন্য এগুলো কোথাও ছুড়ে ফেলে দেবে।

আসলে বর্তমানের মতো সেকালে কিতাবাদি এতোটা সহজলভ্য ছিল না। এখন যদি তুমি তোমার 'রিয়াযুসসালেহীন কিংবা তাফসীরে ইবনে কাছীরের কপিটি হারিয়ে ফেলো, তাহলে লাইব্রেরিতে গিয়ে সহজেই আরেকটি কপি সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু সেকালে এমন ছিল না।

তখন কোনো ছাত্র একটি কিতাবের কপি পেতে চাইলে বহু দূরের কোনো লিপিকারের কাছে যেতে হতো। দিনরাত কষ্ট করে কিতাবটির কপি বানাতে হতো।

অগত্যা তরুণটি ডাকাত সরদারের কাছে এসে তাকে সালাম দিল।

ডকাত সরদার নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলল, চলে যাও। নইলে আমরা তোমাকে হত্যা করব।

ছেলেটি বিনিত স্বরে বলল, আপনারা আমার সবকিছু নিয়ে যান। কিন্তু দয়া করে এই থলেটি নেবেন না। এতে আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তাছাড়া এটা আপনাদের কোনো কাজেও আসবে না।

আচ্ছা, কি আছে এতে? কৌতুহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডাকাত সরদার।।

এতে আমার কিছু কিতাবাদি আছে। আমি বহুকষ্টে এগুলো সংগ্রহ করেছি। এগুলোর সাহায্যে আমি দীনের কাজ করি। মানুষের বিভিন্ন শরয়ী সমস্যার সমাধান দেই।

বেশ, কোন থলেটি তোমার?

এই যে এই থলেটি। ছেলেটি তার কিতাবের থলেটি দেখিয়ে দিল।

ডাকাত সরদার খুলে দেখল, সত্যিই থলেটি কিতাবাদিতে ভরা। সে তাকে তার কিতাবের থলেটি দিয়ে দিল।

আল্লাহ ﷻ আপনার প্রতি রহম করুন– এই দোআ করে তরুণ তার কিতাবের থলেটি নিয়ে এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে পড়ল।

ইলমের প্রতি তার ভালোবাসা দেখে ডাকাত সরদার অবাক হল। টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় কিছুই ফেরত না চেয়ে সে কেবল তার কিতাবগুলোই ফেরত চাইল– ব্যাপারটা তাকে বিস্মিত করল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, ছেলেটির গায়ে পর্যাপ্ত পোশাক নেই। অন্যান্যদের মতো তার কাপড়গুলোও খুলে নেওয়া হয়েছে। সে তার দলের এক সদস্যকে ডেকে তার কাপড়গুলো ফিরিয়ে দিতে বলল।

ছেলেটি কাপড়-চোপড় পরিধান করল। মাথায় পাগড়ি বাঁধল। এবার ডাকাত সরদার বলল, তার বাহনও দিয়ে দাও। তরুণটি তার বাহনও ফিরে পেল। ডাকাত সরদারের মনে তার প্রতি আরো মায়া জমে গেল। সে তার হাতে বেশকিছু টাকা দিয়ে বলল, এগুলো তোমার জন্য হাদিয়া।

ছেলেটি বলল, না, আমি এগুলো নিতে পারব না।

কেন? প্রশ্ন ডাকাত সরদারের।

এগুলো হারামভাবে উপার্জিত টাকা। তাই এগুলো গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

এই টাকাগুলো হারাম?

হ্যাঁ,

কেন?

কারণ, আপনি এইমাত্র আমার সামনে এগুলো ছিনতাই করেছেন।

কিন্তু আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই টাকাগুলো আমাদের জন্য পুরোপুরি হালাল এবং বৃষ্টির চেয়ে পবিত্র।

এটা কীভাবে হতে পারে?

হ্যাঁ। তুমি তাহলে একটু বসো। আমি তোমাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে ডাকাত সরদার এক ব্যবসায়ীকে ডাকল। তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কিসের ব্যবসা করো?

আমার উট-ছাগলের ব্যবসা।

উটের ক্ষেত্রে যাকাতের নেসাব কি, জানো?

না।

মনে করো তোমার কাছে দশটি উট, পাঁচটি ছাগল ও ছয়টি গরু আছে, তাহলে তোমাকে কয়টি পশু যাকাত দিতে হবে, জানা আছে?

না।

তার মানে তুমি জীবনে কখনও যাকাত দাওনি?

না, দেইনি।

ঠিক আছে তুমি যাও।

ডাকাত সরদার আরেকজন ব্যবসায়ীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কিসের ব্যবসা?

স্বর্ণ-রূপার।

স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নেসাব কী?

জানি না। সত্তর ভরি হতে পারে।

হয়নি।

তাহলে আশি ভরি?

হয়নি। তার মানে , তুমি জীবনে কখনও যাকাত দাওনি?

না, দেইনি।

ঠিক আছে, তুমি যাও।

ডাকাত এবার তৃতীয় আরেক ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কীসের ব্যবসা?

জি, আমি কাপড়ের ব্যবসা করি।

তাহলে তো বেশ বড় ব্যবসা তোমার। আচ্ছা, মনে করো বছরের শুরুতে তোমার কাছে যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ ছিল, এরপর তা কমে গেল, তাহলে কি তোমাকে যাকাত দিতে হবে?

সে সঠিক জবাব দিতে পারল না। ডাকাত সরদার তরুণ ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে বলল, দেখেছো, এই লোকগুলো তাদের সম্পদের এক কানাকড়ি যাকাতও দেয়নি। তাই তাদের সম্পদে অন্যের হক রয়েছে। একজনের কাছে একহাজার টাকা আছে। এক বছর অতিক্রম হওয়ার

পর তাতে ২৫ টাকা যাকাত ফরয হয়েছে। অথচ সে তা আদায় করেনি। এখন তার কাছে থাকা এই টাকাগুলো থেকে ২৫ টাকার মালিক গরিব-মিসকিন। তাই এদেরকে আদব শিক্ষা দিতে এবং তাদের সম্পদ থেকে এ প্রাপ্য আদায় করতে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে ডাকাত সদরারের যুক্তিগুলো শরীয়ত সমর্থন করে না এবং কেউ যাকাত না দিলে তার সম্পদ ছিনতাই করার বৈধতা নেই। উদাহরণত, এতিম-অসহায়দের সাহায্যার্থে কোনো নারীর জন্য পতিতাবৃত্তির পেশা গ্রহণ করাকে শরীয়ত অনুমোদন দেয় না।

চোরের যুক্তি

এক চোর জনৈক ব্যক্তির ঘরে ঢুকে মজবুত লোহার সিন্দুক ভেঙে টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেল। পরদিন সে ধরা পড়ল। লোকেরা তাকে ধরে আদালতে নিয়ে আসল। তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। বিচারক সব ঘটনা শোনার পর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার চুরির বিষয়টি আমাকে অবাক করছে না। কারণ, এরআগেও তুমি বহুবার এই কাজ করেছ এবং ধরা পড়েছ। অন্যের সম্পদের প্রতি তোমার এরূপ লালসাও আমাকে বিস্মিত করছে না। কিন্তু এতো মজবুত লোহার সিন্দুকটি তুমি ভাঙলে কি করে– সেটাই আমি ভেবে পাচ্ছি না।

চোর বলল, জনাব আপনি কি এই কবিতাটি শোনেননি?

اَلَا بِالْحِرْصِ يَحْصُلُ مَاتُرِيْدُ * وَبِالتَّقْوى يَلِيْنُ لَكَ الْحَدِيْدُ

আগ্রহ থাকলে ঈপ্সিত সবই পাবে তুমি, তাকওয়া থাকলে শক্ত লোহাও তোমার জন্য হয়ে যাবে নরম।

বিচারক বলল, আশ্চর্য! এ দেখছি দাউদ আ.'র বংশধর। লোহাও তার জন্য নরম হয়ে যায়। হে চোর, তোমার মাঝে যদি তাকওয়া থাকতো, তাহলে তো তুমি চুরিই করতে না।

অতঃপর তিনি তার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ফয়সালা দিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলো দ্বারা বোঝা যায় কিছু মানুষ অপরাধ করে তার বৈধতা প্রমাণের জন্য নানা অজুহাত দেখায়। তাদের অবস্থা ইবলিসের মতো। যে সর্বপ্রথম নিজের পাপ ঢাকতে অজুহাত দেখিয়েছিল। আল্লাহ ﷻ যখন সকল ফেরেশতাকে আদম عليه السلام-কে সেজদা করতে বললেন, তখন সে বলেছিল, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

﴿قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ﴾

> সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। [সূরা আরাফ : ১২]

অন্য আয়াতে এসেছে–

﴿قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا﴾

> সে বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব; যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? [সূরা বনী ইসরাইল : ৬১]

দেখেছো, ইবলিস আদম عليه السلام-কে সেজদা করার ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং অজুহাত তথা যুক্তি দেখিয়ে বলেছে, আমি তার থেকে উত্তম। তাই আমার থেকে নিচু কাউকে কীভাবে সেজদা করব?

আসলে তার বক্তব্য অসত্য ছিল। আদম আ. তার থেকে উত্তম ছিলেন। কারণ, মাটি আগুন থেকে অধিক সম্মানিত। তদুপরি আল্লাহ ﷻ-র সামনে কোনো যুক্তি চলে না।

ফেরআউন যখন প্রভুত্বের দাবি করার ইচ্ছা হল, তখন সে বলল–

পবিত্র কোরানের ভাষায়–

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ۚ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ﴾

> ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না, আমি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি

মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা হচ্ছে সে একজন মিথ্যাবাদী। [সূরা কাসাস : ৩৮]

অতঃপর–

﴿وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ﴾

ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? [সূরা যুখরুফ : ৫১]

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-র একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

﴿وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ٭ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ٭ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ﴾

যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম! এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি! তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তাঁর অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের এবং অন্যজন তাঁর শত্রুদলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল,

> দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। [সূরা কাসাস : ১৪-১৭]

এ থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের থেকে অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল হয়ে প্রকাশ পেয়ে গেলে, কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নেয়া উচিত। পক্ষান্তরে, স্বেচ্ছায় কোনো ভুল করে আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করানো সমীচীন নয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ জাহান্নামের আযাবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

> ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾
>
> আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরা হা মিম সেজদা : ২৫]

অর্থাৎ, বহু মানুষ রয়েছেন যারা পাপের পথ ছেড়ে সৎ পথে ফিরে আসতে চাইলেও অসৎ সঙ্গীদের কারণে আসতে পারেন না। উদাহরণত, কেউ মদ পান ছেড়ে দিয়ে তওবা করতে চাইলে তার বন্ধুরা তাকে বলে, বন্ধু, তুমি এখনও যুবক। জীবনকে উপভোগের এটাই মোক্ষম সময়। যখন বৃদ্ধ হবে তখন না হয় সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে নেবে। এভাবেই তার সঙ্গীরা তাকে গুনাহের পথ ছাড়তে দেয় না।

নারীদের বলছি

পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে আমার। ভিজিট করেছি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে মুসলিম মেয়েদের শরীরে অশালীন ও আঁটসাঁট পোশাক দেখে ব্যথিত হয়েছি। কাউকে আবার অতি সঙ্কুচিত ও

অন্তর্শোভা পরিদৃশ্যকারী হিজাব পরিধান করে পর্দার সাথে উপহাস করতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। মূল পর্দা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করেও নিজেদেরকে পর্দানশীনা প্রমাণ করার হাস্যকর প্রয়াস দেখে দুঃখ পেয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেয়েদের কেউ কেউ শরয়ী পর্দা করতে চাইলেও তাদের ক্লাসমেট কিংবা বান্ধবীদের প্ররোচনায় পড়ে তা থেকে বিরত থাকছে। দেখা যাচ্ছে সে বোরকা পরে ভার্সিটিতে আসলে তারা বলছে, তুমি আমাদের থেকে অনেক বেশি সুন্দরী। কেন তোমার সৌন্দর্যকে এভাবে ঢেকে রাখছো। তাদের কথা শোনে সেও পর্দা না করার একটা অজুহাত পেয়ে যায়।

একই অবস্থা ছেলেদের ক্ষেত্রেও। কেউ যদি বলে বন্ধুরা, ভার্সিটিতে এলে আমার মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা হয় না। আমি এখন থেকে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করব। তার বন্ধুরা তখন তাকে বলে, আরে, তুমি তো অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো। তারা সালাতই পড়ে না। তুমি তো কমপক্ষে বাসায় হলেও সালাত পড়ো। ছেলেটি তখন মসজিদের গিয়ে সালাত আদায় না করার একটা অজুহাত পেয়ে যায়।

অথচ দেখো, সাহাবায়ে কেরাম এমন ছিলেন না। তারা কোনো অজুহাতে নেক কাজ ছেড়ে দিতেন না। ইবাদত না করে তারা ভালো থাকতে পারতেন না। যেন তেন আমলে তারা সন্তুষ্ট হতেন না। সর্বদা সর্বোচ্চটা খুঁজে নিতে সচেস্ট থাকতেন। যেমন কবি বলেন–

وَنَحْنُ قَوْمٌ لَا تَوَسُّطَ عِنْدَنَا * لَنَا الصَّدْرُ دُوْنَ الْعَالَمِيْنَ اَوِ الْقَبْرُ

আমরা এমন জাতি, অজুহাত দেখানোর প্রবণতা যাদের নেই, জগত ও কবরের কাছাকাছি সদা অবস্থান করে আমাদের অন্তর।

সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা জান্নাতে যাওয়ার উপায়-উপকরণ খুঁজতেন। তাদের প্রশ্নের বিচিত্রতা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একবার এক সাহাবি রাসুল ﷺ-র কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ ﷻ-র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?

আরেক সাহাবি যুদ্ধের শুরুতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর দেয়া কোন প্রতিদান বান্দাকে আনন্দে উদ্বেলিত করবে?

অন্য এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কেয়ামত দিবসে কে আপনার সবচেয়ে বেশি কাছে থাকবে?

তাই প্রিয় বন্ধুরা, মুক্তির কোন পথে তুমি কেবল সেপথের সন্ধান করো। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে সাবধান, মিথ্যে অজুহাত দেখাবে না। কখনও ভুল হয়ে গেলে মুসা আ.'র মতো তা স্বীকার করে নাও। আল্লাহ ﷻ-র কাছে বলো, হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ ﷻ তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে...

অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করতে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই। অতীত ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে শিক্ষণীয় হাজারো বিষয়ের উপস্থিতি। এ ক্ষেত্রে কোরআনের চেয়ে উত্তম কোনো গ্রন্থ নেই। কারণ, এটি কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা একমাত্র মুজিযা। এতে উল্লিখিত পূর্বেকার জাতিপুঞ্জের ঘটনাবলিতে রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ রাসুল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ﴾

তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়। [সূরা ইউসুফ : ১১১]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র ইরশাদ করেন–

﴿كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا﴾

এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। [সূরা তা হা : ৯৯]

চলো, আমরা ইতিহাসের ভেলায় চড়ে আমরা চলে যাই হিজরি ৬৩৫ সালে। যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একজন সফল শাসকের গল্প। যিনি ছিলেন ন্যায়-ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। সৈন্য- সামন্ত ও অর্থ-সম্পদ কিছুরই কমতি ছিল না তার। প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তায়ও তিনি ছিলেন অনন্য।

আবুল ফরজ ইবনুল জাওযি ﷺ তার লিখিত আল মুনতাজামু ফি আখবারিখ মুলুকি ওয়াল উমাম–গ্রন্থে সেই চমৎকার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাটি বাদশাহ মুজাফফরের। যিনি ৬৩৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার অধীনে অনেকগুলো রাজ্য ছিল। একবার তার অধীনস্ত এক রাজ্যের গভর্নর মারা গেল। তার একটি যুবতী মেয়ে ছিল। নতুন আরেকজন গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণ করে তার সমুদয় সম্পত্তি দখল করে মেয়েটিকে নিঃস্ব করে দিল। একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা এসে বাদশাহকে জানাল, হে বাদশাহ! আপনার অধীনস্ত অমুক রাজ্যের গভর্নর মারা গেছেন। তার একটি মেয়ে আছে। পিতার রেখে যাওয়া বিপুল সম্পদের বর্তমান মালিক তিনি। কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে নিয়োজিত বর্তমান গভর্নর তার সমুদয় সম্পদ জোরপূর্বক দখল করে মেয়েটিকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সে আপনার কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে এসেছে। তাকে কি ভেতরে আসতে বলব?

বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বল।

মেয়েটি বাদশাহের দরবারে প্রবেশ করল। বাদশাহ তার শারীরিক গঠন দেখেই বুঝতে পারলেন যে, মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু সে কি বাস্তবিকই সেই গভর্নরের মেয়ে কি না, বিষয়টি যাচাই করা দরকার। সেকালে বর্তমানের মতো মানুষের কোনো আইডিকার্ড বা পরিচয়পত্র ছিল না। তাই লোকেরা যদি বলে যে, হ্যাঁ, ইনিই সেই গভর্নরের

মেয়ে, তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি যুবতীকে তার মুখের নেকাব সরাতে বললেন। সে নেকাব সরাল। তার রূপ-লাবণ্য দেখে দরবারের লোকেরা অস্থির হয়ে গেল। তাই সনাক্ত হয়ে যেতেই বাদশাহ তাকে দ্রুত চেহারা ঢেকে ফেলতে বললেন। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অভিযোগ কি?

মেয়েটি সবকিছু খুলে বলল এবং তার সমুদয় সম্পত্তি ফিরে পেতে বাদশাহর সহযোগিতা কামনা করল।

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ মেয়েটির পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ফরমান জারি করলেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার কীভাবে জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে?

মেয়েটি বলল, আল্লাহর শপথ, আমি নিজ হাতে পরিশ্রম করে রুটি-রুজি উপার্জন করছি।

একথা শোনার পর বাদশাহ তাকে কিছু হাদিয়া দিলেন এবং দ্রুত তার সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করলেন।

বৃদ্ধ মহিলাটি ভাবলেন, বাদশাহ মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই সে তাকে বলল, হে বাদশাহ, মেয়েটিকে আজ রাত আপনার প্রাসাদে রেখে দিন। রাতে তার সাথে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে পারবেন।

বাদশাহ বৃদ্ধার কথায় হ্যাঁ বলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, আমারও তো কয়েকটি মেয়ে আছে। আমার মৃত্যুর পর তাদেরও যদি এমন অবস্থা হয়। তাহলে তারাও ভিক্ষুকের বেশে বিচারের আশায় কোনো বাদশাহের দরবারে যাবে। তখন আমার মতো সেই বাদশহও তো আমার মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইবে।

দেখেছো, এতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী, সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাসকারী, জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এক বাদশাহর অন্তরের অবস্থা? তিনি চাইলেই মেয়েটির সাথে পাপাচারে লিপ্ত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি পরিণামের কথা চিন্তা করলেন। সংযমী হলেন।

নিজেকে নিবৃত্ত রাখলেন। মেয়েটিকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। আল্লাহ ﷻ তোমাকে কল্যাণ দারন করুন।

সচ্চরিত্র ও সংযমশীলতার এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শেষ পরিণামের ভয়ে তা থেকে নিবৃত্ত থাকলে আল্লাহ ﷻ-র দয়ায় অনেক পাপ থেকে বাঁচা যায়।

আরেকটি ঘটনা

আল ফারজু বা'দাশ শিদ্দাতি গ্রন্থে তানুখি সচ্চরিত্র ও সংযমের এক আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। গল্পটি এক কাতান ব্যবসায়ীর। তার গায়ের রং ছিল কুচকুচে কালো। একদিন তার ঘরে এক মেহমান এলো। মেহমান দেখল ব্যবসায়ীর সন্তানগুলো একেবারে ধবধবে ফর্সা। অথচ তাদের পিতা কুচকুচে কালো। বিষয়টি তাকে অবাক করল। মেহমান জানতে চাইল– এরা কারা?

ব্যবসায়ী বলল, এরা আমার সন্তান। এদের মা ইউরোপিয়ান। তার আর আমার সম্পর্কের একটি দারুণ গল্প রয়েছে।

মেহমান ব্যক্তিটি খুব আগ্রহভরে বলল, গল্পটি বলুন।

ব্যবসায়ী বলতে লাগল–

তখন সিরিয়ায় খ্রিষ্টীয় শাসন চলছে। আমি ও আমার কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধু ব্যবসার কাজে সে দেশে গেলাম। আমার কাতানের ব্যবসা। একদিন আমাদের পাশ দিয়ে এক বৃদ্ধা ও অনিন্দ্য সুন্দরী এক নারী অতিক্রম করছিল। তারা দুজনেই খ্রিষ্টান ছিল। তারা আমাদের কাতান ও পোশাকের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। বৃদ্ধা মহিলাটি লক্ষ করল যে, আমি তার সাথে থাকা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। তাই সে আমার কাছে এসে বলল, তোমার কি তাকে পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ।

অমুক খ্রিষ্টান নেতার স্ত্রী সে।

আমি তার রূপে মুগ্ধ। যেকোনো মূল্যে তাকে একান্তে পেতে চাই। আপনি কি একটু সুযোগ করে দেবেন?

বেশ, ১০০ দিনার লাগবে। তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। বৃদ্ধার হাতে ১০০ দিনার তুলে দিলাম। রাতে যখন আমি তার ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন আল্লাহর ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠল। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরদিন বারবার আফসোস হতে লাগল। আহা! কী সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলাম।

বৃদ্ধা এসে বলল, কি ব্যাপার, তোমাকে এতো সুযোগ করে দিলাম অথচ কিছুই করলে না?

বললাম, আসলে তখন আমার কী হয়ে গিয়েছিল বলতে পারব না। আপনি আবার একটু ব্যস্থা করে দিন না।

বৃদ্ধা বলল, ৪০০ দিনার লাগবে।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। তার হাতে ৪০০ দিনার তুলে দিলাম। কিন্তু সেদিন রাতেও তার কাছে যাবার পর আল্লাহর ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে নিল। আমি আকাশের তারকার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এ আমি কি করছি? এক খ্রিস্টান লোকের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের লিপ্ত হতে যাচ্ছি? হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করুন। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আজও আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম।

কিন্তু শয়তান আমার মনে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল, এ তুমি কী করলে? এতো মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করলে? কতগুলো টাকা দিয়েছ অথচ বিনিময়ে কিছুই নিলে না। এই রমণীর প্রেমের বিরহ তুমি সইবে কী করে?

পরদিন আমি আমার যাবতীয় মালামালসহ পুরো দোকান বিক্রি করে দিলাম। টাকাগুলো বৃদ্ধার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এই নিন আমার সমুদয় সম্পদ। আরেকবার তার সাথে একান্তে মিলিত হবার ব্যবস্থা করে দিন।

আজ রাতেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটল। রমণীর কাছে যাওয়ার পর আল্লাহর ভয় আমাকে জেঁকে ধরল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো– আসতাগফিরুল্লাহ! এ আমি কী করছি? এক খ্রিস্টান লোকের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে যাচ্ছি। এই বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

এরপর আমি চরম ক্ষতির সম্মুখিন হলাম। দোকান নেই। ব্যবসায়ী পণ্য নেই। হাতে কোনো কোনো পুঁজি নেই। সমুদয় সম্পদ তো ওই বৃদ্ধার হাতেই তুলে দিয়েছি। বিনিময়ে একমুহূর্তের জন্যেও অভিলষিত নারীটির সন্নিধ্য লাভ করতে পারিনি। হঠাৎ একদিন দেখি, একলোক বাজারে এসে চিৎকার করে বলছে, এখানকার কোন মুসলিম ব্যবসায়ীর সাথে যেন আমার চুক্তি হয়েছি? চুক্তির মেয়াদ দুদিন পরেই শেষ হয়ে যাবে। তার কাছে একটা বস্তু আছে, যা আমার কাছে বিক্রি করার কথা। সে যদি সেটি বিক্রি না করে তাহলে আমি তা কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করব।

আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। কারণ, আমি দোকানটি আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলাম। আমি দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়লাম। কিন্তু আমার মন সেই রমণীর কাছেই পড়ে রইল। দেশে এসে আমি দাস-দাসীর ব্যবসা শুরু করলাম। তখনকার দিনে মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। যুদ্ধ থেকে গনিমত হিসেবে অনেক দাস-দাসী পাওয়া যেত। মুসলমানগণ শত্রুপক্ষের অনেককে বন্দি করে নিয়ে আসত। আবার শত্রুপক্ষও অনেক মুসলমানকে বন্দি করে নিয়ে যেত। তবে বন্দিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে বিরাট ফারাক ছিল।

বদরের যুদ্ধের পর রাসুল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বন্দিদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনেক বন্দির গায়ের পোশাক ছেঁড়া ছিল। তিনি তাদেরকে ভালো কাপড় দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

পবিত্র কোরানে আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, এতিম ও বন্দিদের খাবার দান করে। [সূরা দাহর : ৮]

কাফের হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র কোরআনে তাদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। রাসুল ﷺ-ও সাহাবাদেরকে এরূপ আদেশ দিয়েছেন। সাহাবাগণও রাসুল ﷺ-র আদেশ পালনে সচেষ্ট ছিলেন। কখনও দুধ, খেজুর ও রুটির ব্যবস্থা থাকলে তারা বন্দিদের দুধ ও খেজুর দিয়ে নিজেরা পানি দিয়ে রুটি খেতেন।

এই বন্দি নর-নারী মুসলমানদের সেবক হিসেবে পরিণত হতো। মুসলমানগণ ভুলবশত কাউকে হত্যা, রমযানে দিনে বেলায় স্ত্রী সহবাস কিংবা কসম ভঙ্গ করে ফেললে গোলাম আজাদ করে দিত। তাছাড়া গোলাম আজাদের ব্যাপারে ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল ﷺ বলেন–

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম গোলাম আজাদ করবে, আল্লাহ ﷻ আজাদকৃত গোলামের প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। এমনকি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থানও। [বোখারী : ৬৭১৫] [কোন কোন রেওয়াতে শুধু গোলামের কথা উল্লেখ আছে। মুসলিম শব্দের উল্লেখ নেই।]

রাসুল ﷺ ইন্তেকালের সময়ে একটি কথাই বারবার বলেছিলেন–

তোমরা সালাত ও অধীনস্ত গোলমা-বাঁদীদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। [সুনানে ইবনে মাজা : ১৬২৫]

ইসলাম যুদ্ধবন্দিদের সেবক হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পরও তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে আজাদ করে দেওয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। বহু সাওয়াবের ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ বর্তমান যুগের কাফেরদের অবস্থা দেখো।

ইসলামের যুদ্ধবন্দিদের সাথে তাদের হাতে বন্দি মুসলিমদের অবস্থা তুলনা করো। আমেরিকা ইরাকের আবু গারিব কারাগারের বন্দিদের ওপর কী নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। সেখানে তারা মুসলিম বন্দিদের প্রতি এমন নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে, যা পশুদের সাথেও করলেও মেনে নেয়া যেতো না। কত হাফেজ, আলেম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষক আবু গারিবের সেই অন্ধকার কুঠুরীতে বছরের পর বছর ধরে নিপীড়িত হচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই। গুয়ান্তানামো কারাগারেও আমেরিকা একইরূপে নির্যাতন চালাচ্ছে। সেখানে তারা মুসলিম বন্দিদের এমন সঙ্কীর্ণ খাঁচায় বন্দি করে রাখছে যেখানে কোনো জন্তু-জানোয়ারকেও রাখা সম্ভব না। কোনো কুকুরকেও যদি বন্দিশালার সেই ছোট্ট খাঁচাতে এভাবে আটকে রাখা হতো, তাহলে বিশ্বের তাবৎ প্রাণী অধিকার-রক্ষা সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা ঠুকে দিতো। কিন্তু সেখানে মুসলিম বন্দিদের সাথে নিষ্ঠুরতম আচরণ করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনিদের সাথে ইহুদীদেরর আচরণ দেখো। তারা ফিলিস্তিনি বন্দিদের ওপর কী নির্মম উৎপীড়ন চালাচ্ছে। ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের সাথে কৃত আচরণের সাথে এগুলো মিলিয়ে দেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ-র কথাই চিরসত্য। তিনি বলেন–

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾

> আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭]

ফিরছি সেই ব্যবসায়ীর গল্পে। তিনি বলেন, আমি দাস-দাসীর ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলাম। সেই রমণীর কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। হঠাৎ একদিন খলিফার দরবারে আমার ডাক পড়ল। তিনি একটি দাসী কিনতে চান। আমি তার সামনে অপরূপ সুন্দরী এক দাসী পেশ করলাম। দাসীটি খলিফার ভীষণ পছন্দ হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটির দাম কত?

আমি বললাম, ১০ হাজার দিনার।

খলিফা রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষকে বলল, একে ১০ হাজার দিনার দিয়ে দাও।

কোষাধ্যক্ষ জানাল, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কেবল ৫ হাজার দিনার আছে।

খলিফা আমাকে বলল, তুমি কাল এসে বাকি ৫ হাজার দিনার নিয়ে যেয়ো।

আমি বললাম, আমি মুসাফির মানুষ। এদেশ থেকে ওদেশে ঘুরে বেড়াই। কাল কোথায় থাকব কে জানে? টাকাগুলো আমার আজই দরকার।

একথা শুনে খলিফা তার এক কর্মচারীকে বলল, একে ইউরোপ থেকে আগত বন্দিদের কাছে নিয়ে যাও (সেসময় খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলছিল) এবং আমাকে বললেন, এই ৫ হাজার দিনারের পরিবর্তে তুমি তাদের থেকে একজন দাসী নিয়ে নাও।

আমি বন্দিদের কাছে গেলাম। বন্দি দাসীদের মুখের নেকাব সরিয়ে সরিয়ে এক এক করে তাদের দেখতে লাগলাম। হঠাৎ তাদের মাঝে আমার কাঙ্ক্ষিত, ঈপ্সিত, অভিলষিত সেই রমণীকে দেখতে পেলাম। যাকে একান্তে পাওয়ার জন্য আমি আমার সর্বস্ব বিলীন করেছিলাম। সে আজ এখানে বন্দি হয়ে উপস্থিত। সে তার স্বামীর সাথে যুদ্ধে এসেছিল। তার স্বামীর খবর কেউ জানে না। হয়তো নিহত হয়েছে। কিংবা বন্দি হয়ে কোনো জেলখানায় পড়ে আছে। কিংবা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেছে। যাক আমার বহুলাকাঙ্ক্ষিত মানবী এখন আমার সামনে। কালবিলম্ব না করে আমি তাকেই নিয়ে নিলাম। তার সাথে একটি ব্যাগ ছিল। সেটিও সাথে নিয়ে এলাম। ঘরে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?

না, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।

তোমার কী সেই মানুষটির কথা মনে নেই, যে তোমাকে আপন করে পেতে তার সর্বস্ব লুটিয়ে দিয়েছিল? কিন্তু সে যখনই তোমার কাছে আসতো তখন আল্লাহর ভয়ে নিজেকে বিরত রাখতো, আর বলত, আল্লাহ ﷻ আমাকে দেখছেন। আমি তার কাছে আশ্রয় চাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই মানুষটি কি আপনিই ছিলেন?

হ্যাঁ, আমিই ছিলাম।

অতঃপর রমণীটি তার ব্যাগটি খুলল। সেখান থেকে তিনটি টাকার থলি বের করে বলল, আল্লাহর শপথ, আমি আপনার সেই টাকাগুলোর এক কানাকড়িও খরচ করিনি। এই বলে সে হুবহু সেই টাকাগুলোই আমাকে ফেরত দিল। সে-ই আমার এই সন্তানগুলোর মা। আপনার সামনে উপস্থিত এই খাবারগুলো তারই রান্না করা।

ঘটনাটি বলার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কোনো পাপের কাজ বর্জন করে, আল্লাহ ﷻ তাকে এরচেয়েও উত্তম বিনিময় দান করেন। বর্তমানে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া খুবই সহজ। সর্বত্র অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। নারীরা দেহ প্রদর্শনে মত্ত। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায় জড়ানো অতি সাধারণ বিষয়। আমি অনেক হাসপাতাল ও ভার্সিটিতে দেখেছি যুবক-যুবতীদের অবাধে চলাফেরা করতে। তারা একে অপরের হাত ধরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলছে। এমনকি একে অপরকে চুমুও খাচ্ছে। এই ফেতনা এখন মহামারির আকার ধারণ করেছে। সুতরাং, পাপের এই অবারিত সুযোগ পেয়েও যে আল্লাহর ভয়ে নিজেকে এসব থেকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ ﷻ তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রকার ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমিন।

সাহাবির প্রেম

জাহেলি যুগে এক সাহাবি ও এক নারীর মাঝে গভীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সেই নারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন। সম্মানিত সেই সাহাবির নাম মারসাদ ইবনে আবু মারছাদ গানাবি ﵁। রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরতের পর ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সাহাবিদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু করেন। ধীরে ধীরে একেক সাহাবির মাঝে একেক বিষয়ের প্রতিভা পরিলক্ষিত হতে থাকে। যেমন, কেউ কোরআন হিফজ করা, কেউ হাসিদ মুখস্ত করা, কেউ হাদিস লিপিবন্ধ করা, কেউ যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মারছাদ ﵁ ছিলেন দৈহিকভাবে শাক্তিশালী ও সাহসী। আবু হুরায়রা ﵁-র মতো তার ইলমি দক্ষতা না থকালেও অন্যান্য বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল ঈর্ষনীয়। একবার রাসুল ﷺ তাকে কুরাইশ কাফেরদের হাতে বন্দি মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বন্দিদের হাত পা শিকলে বাঁধা ছিল। তিনি দেয়াল টপকে বন্দিশালায় ঢুকে যান এবং সুযোগ বোঝে তাদেরকে পিঠে তুলে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। তারপর মদিনায় পৌঁছে দেন।

সেসময় মুসলমান ও কুরাইশের মাঝে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকতো। কুরাইশরা মুসলমানদের বন্দি করার জন্য সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকতো। একবারের ঘটনা। কাফেরদের একটি দল মদিনার পার্শবর্তী এলাকায় এলো। যেখানটায় রাসুল ﷺ যাকাতের উট বিচরণ করার জন্য পাঠাতেন। কাফেররা সেই উটগুলো চুরি করে নিয়ে গেল। সেগুলোর মধ্যে রাসুল ﷺ-র উট–কাসওয়াও ছিল। সাথে তুলে নিয়ে গেল উট চরানোর দায়িত্বে নিয়োজিত এক মুসলিম নারীকেও। আল্লাহর সাহায্যে তিনি পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ ঘটনায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে

কোনো বাড়াবাড়ি ছিলো না। কাফেররাই স্বপ্রণোদিত হয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾

তারা তোমাদের উপর যতটুকু বাড়াবড়ি করেছে, তোমরাও তাদের ওপর ততটুকু বাড়াবাড়ি করেছে। [সূরা বাকারা : ১৯৪]

তিনি আরো বলেন–

﴿وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾

মন্দ কাজের প্রতিদান করল অনুরূপ মন্দ কাজ। [সূরা শুরা : ৪০]

অর্থাৎ, তোমরা আমাদের সাথে যেমন আচরণ করছ, আমরাও তোমাদের সাথে তেমন আচরণ করব।

মারছাদ رضي الله عنه একবার মদিনা থেকে গোপনে মক্কায় এলেন। উদ্দেশ্য মুক্ত করে মদিনায় নিয়ে যাওয়া। ইতিপূর্বে তিনি এক কয়েদিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তিনি রাতের আঁধারে মক্কায় প্রবেশ করলেন। ধীরপদে গন্তব্য পানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি মক্কার এক ব্যভিচারিণী নারীকে দেখতে পেলেন। তাকে ইনাক নামে ডাকা হতো। অজ্ঞতার যুগে সে তার বান্ধবী ছিল। তাকে দেখে তিনি একটি দেয়ালের ছায়ায় লুকিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই নারীটি তাকে আগেই দেখে ফেলেছিল। সে তার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে তাকে চিনে ফেলল।

বলল, আরে মারছাদ নাকি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সে বলল, ধন্যবাদ ও অভিবাদন তোমাকে। এসো আজ আমার সাথে একটি রাত কাটিয়ে যাও।

মারছাদ رضي الله عنه সেসময় দেয়ালের অন্ধকারে ছিলেন। আল্লাহ ﷻ ছাড়া পৃথিবীর কেউ তাকে দেখছিল না। তিনি চাইলে সেই নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তাকে স্পষ্ট বলে দিলেন– ইনাক, আল্লাহ ﷻ এটাকে হারাম করেছেন।

সে বলল, তুমি আমার সাথে রাত কাটাবে, নয়তো তুমি যে উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছ, আমি সেকথা ফাস করে দেব।

তিনি বললেন, না, আমি কিছুতেই এ কাজ করব না।

একথা শোনার পর সে চেচিয়ে বলতে লাগল, হে কুরাইশগণ! এই ব্যক্তি তোমাদের বন্দিকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে।

তাকে চিৎকার করতে দেখে মারছাদ ﵁ সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আট ব্যক্তি তার পিছু নিল। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। আত্মগোপন করলেন বাগানের এক গুহায়। তার পিছু ধাওয়াকারীরাও সেখানে প্রবেশ করল। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাদের চোখকে পর্দাবৃত করে দিলেন। ফলে তারা বিফল হয়ে তাদের ঘরে ফিরে গেল।

এরপর মারছাদ ﵁ সেখানে কিছু সময় আত্মগোপন করে থেকে তার কয়েদি সাথীর কাছে গেলেন।

দেখো, ঈমানের বলে বলিয়ান এক সাহাবীর কী সাহস! কী বীরত্ব! কাফেরদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে তিনি ভাবেননি যে, যাক বাঁচা গেল। আলহামদুলিল্লাহ। এ অবস্থায় আর সামনে এগুনো সমীচীন হবে না। মদিনায় ফিরে যাই। এরকম কোনো চিন্তাই তার মনে আসেনি। তিনি আবার সেখানে গেলেন। দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে তাকে মুক্ত করে মক্কার বাইরে নিয়ে এলেন। তার শিকল খুলে দিলেন। অতঃপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উভয়ে মদিনাতে এসে পৌঁছলেন। মদিনায় আসার পর মারছাদের অন্তরে বারবার সেই ব্যভিচারিণী নারীর ছবি ভাসছিল। তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি রাসুল ﷺ-র কাছে এসে বললেল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি ইনাক কে বিবাহ করব?

রাসুল ﷺ তার কথা উপেক্ষা করলেন।

তিনি আবার বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কি ইনাক কে বিবাহ করব?

রাসুল ﷺ কিছুই বললেন না। অতঃপর আল্লাহ ﷻ ওহি নাযিল করলেন–

﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

> ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মোশরেকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী মোশরেক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। [সূরা নূর : ৩]

এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ মারছাদের বিষয়টি মীমাংসা করে দিলেন। মারছাদ رضي الله عنه রাসুল ﷺ-র কাছে এসেছিলেন পরামর্শ নিতে। এটিও শরীয়তের একটি বিধান। মানুষ যখন কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়, তখন সে তার কোনো মুরুব্বী, শিক্ষক, বাবা-মা কিংবা বড় ভাইকে সেটি জানায়। তাদের কাছে বিষয়টির সমাধান চায়। মারছাদ رضي الله عنه-ও যখন বুঝতে পারলেন যে, তার হৃদয় ইনাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন তিনি রূহানী চিকিৎসক রাসুল ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এক হৃদয়ঘটিত বিপদে পড়েছি। আমি কি ইনাককে বিবাহ করতে পারব? রাসুল ﷺ তখন তাকে আল্লাহর আদেশ জানিয়ে দিলেন। বললেন, মারছাদ, জিনাকারী পুরুষই বিবাহ করে জিনাকারীনীকে অথবা মোশরেক মহিলাকে। আর জিনাকারীনীও বিবাহ করে শুধু জিনাকারী পুরুষ অথবা মোশরেককে। তাই তুমি তাকে বিবাহ করো না।

মারছাদ রাসুল ﷺ-র কথা মানলেন। আল্লাহ ﷻ মারছাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

উপর্যুক্ত আয়াতে বর্ণিত– ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করতে পারবে– এর মর্মার্থ হল, যারা সর্বদা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, কখনও তওবা করে না, তারাই ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য। পাশাপাশি বিবাহের পরেও যাদের আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, চাল-চলন অশ্লীলতা মুক্ত হয় না, তারা সরাসরি ব্যভিচারী না হলেও ব্যভিচারীর মতোই। তওবা করে এসব পথ পরিহার করা ব্যতিরেকে

তাদেরকেও বিবাহ করা যাবে না। হ্যাঁ, তওবা করে ফিরে আসার পরেও যদি তারা পূর্বের কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-ই ব্যবস্থা নেবেন। উত্তমরূপে তওবা করলে তো আল্লাহ ﷻ শিরকের গোনাহও মাফ করে দেন, তাহলে ব্যভিচারের গোনাহ মাফ করবেন না কেন? অবশ্যই করবেন এবং মুমিন ব্যক্তি তাকে বিবাহও করতে পারবে। আর অশ্লীল কাজে লিপ্ত নারীকে বিবাহকারী ব্যভিচারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ জাতীয় সমস্যায় পড়লে বিজ্ঞজনের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সাহাবায়ে কেরামের আমল এমনই ছিল। তাদের মনে কোনো বিষয়ে খটকা সৃষ্টি হলে তারা রাসুল ﷺ-র কাছে তা উপস্থাপন করতেন। মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হলে অন্যের নিকট খুলে বলা উচিত। আমাদের পূর্বসূরীদেরও এই রীতি ছিল। দেখা যেতো, এক ছাত্র ইমাম আবু হানিফার رحمه الله-র কাছে এসে বলছে– শায়খ, আমি মানসিকভাবে এই সমস্যায় নিপতিত আছি। দয়া করে সমাধান বলে দিন। ইমাম আহমদ, মালেক ও শাফেয়ি رحمه الله-র কাছেও তার ছাত্ররা এসে বিভিন্ন সমস্যার কথা খুলে বলত এবং সমাধান জেনে নিত।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

> ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾
>
> আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলো রটিয়ে দেয়। আর তারা যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেত, তখন তা অনুসন্ধান করে দেখত তাদের মাঝে যারা রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের ওপর না হত তবে তোমাদের অল্প লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ শুরু করত। [সূরা নিসা : ৮৩]

এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ মানুষদেরকে তাদের মনে কোনো বিষয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হলে রাসুল ﷺ-র জীবদ্দশায় তাঁকে তা জানাতে

বলেছেন। আল্লাহর এ নির্দেশ সাহাবায়ে কেরাম যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে (রাসুলের অবর্তমানে) কর্তৃত্বের অধিকারী তথা আলেম-উলামা ও বিজ্ঞজনের শরণাপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

হানজালা ﷺ একদিন অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় রসুল ﷺ-র কাছে যাচ্ছিলেন। পথে আবু বকর ﷺ-র সঙ্গে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- হে হানজালা! কি ব্যাপার, এত অস্থির কেন? কোথায় যাচ্ছ? হানজালা বললেন, হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে, তাই রসুলের কাছে অবস্থার সংশোধনের জন্য যাচ্ছি।

আবু বকর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মধ্যে নেফাকের কী পেয়েছ?

হানজালা বললেন, আমি যখন রসুলের মজলিসে থাকি আর জাহান্নাম ও জান্নাত সম্পর্কে রসুলের উপদেশ শুনি তখন এ সম্পর্কে স্বচক্ষে দেখার মতো বিশ্বাস হয়, অন্তরে নূর অনুভূত হয়। আর যখন মজলিস থেকে ফিরে

পরিবার-পরিজন এবং দুনিয়ার কাজে নিমগ্ন হই তখন আর সেই ভাব থাকে না। আবু বকর ﷺ বললেন, আমারও তো একই অবস্থা, চলো দুজনেই যাই এবং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে রসুল ﷺ-কে অবহিত করি।

বস্তুত এটি একটি স্বভাবজাত বিষয়। তুমি যখন মসজিদের সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে দু ফোটা চোখের পানি ফেলবে, তখন তোমার অন্তর অবশ্যই বিগলিত হবে। কিন্তু সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর তোমার অন্তরের সেই বিনম্র ভাব আর থাকবে না। তাই আবু বকর ﷺ হানজালা ﷺ-কে বললেন, চলো আমরা রাসুলের কাছে গিয়ে আমাদের অবস্থা জানাই।

বর্তমানে রাসুল ﷺ নেই কিন্তু আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত- কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ- তথা উলামায়ে কেরাম আছেন। তাদের শরণাপন্ন হতে হবে। বর্তমানে মোবাইল, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ডিজিটাল

যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া অনেক সহজ। এখন আর তাদের কাছে কষ্ট করে যেতে হয় না। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, একেবারে প্রসিদ্ধ আলেমের কাছেই যেতে হবে– এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং শরীয়তের জ্ঞানের ধারক এমন অপ্রসিদ্ধ কোনো আলেমের গেলেও চলবে, যিনি তোমার সমস্যার সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

এরপর দুজনই রাসুলের দরবারে হাজির হয়ে নিজ নিজ অবস্থান বর্ণনা করেন। তাদের অবস্থা শুনে রসুল ﷺ বললেন–

> لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدِي ، وَفِي الذِّكْر ، لصَافَحَتْكُمُ الملائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً
>
> আমার কাছে থাকাকালে যে অবস্থা হয়, এটা যদি তোমাদের সবসময় বহাল থাকত, তাহলে ফেরেশতারা চলার পথে ও বিছানায় তোমাদের সঙ্গো মুসাফাহা করত। হে হানজালা, এরূপ অবস্থা মাঝে মাঝে হবে। [সুনানে ইবনে মাজা : ৪২৩৯]

অর্থাৎ, রাসুল ﷺ হানজালা رضي الله عنه-কে বোঝালেন, অন্তরের পরিবর্তন প্রাকৃতিক বিষয়। মানুষ একসময় ভীত হয়ে কাঁদে, আরেকসময় খুশি হয়ে হাসে।

অতএব, আমাদেরও উচিত মারছাদ رضي الله عنه-র মতো বিজ্ঞজনের কাছে নিজের সমস্যার কথা শেয়ার করা। যে কোনো পেরেশানী বা অস্থিরতায় ভুগলে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া। তবে যে কারও কাছে নিজ সমস্যার কথা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। সর্বদা জবান ও গোপন বিষয় হেফাজতে সচেষ্ট থাকবে।

আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে পদস্খলন থেকে নিরাপদ রাখুন। আমাদেরকে উভয় জাহানের সফলতা দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

হুদহুদ প্রকাশন-এর কিছু বই

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক	ধরণ
০১	Enjoy Your Life	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০২	মহাপ্রলয়	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০৩	পরকাল	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০৪	ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০৫	মৃত্যুর বিছানায়	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০৬	কবরপূজারি কাফের	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০৭	আপনি কি জব খুঁজছেন	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০৮	তোমাকে বলছি হে যুবক	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
০৯	এসো অবদান রাখি	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১০	হাসপাতালে ডাক্তার ও রোগী	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১১	নারী যখন রানি	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১২	তোমাকে বলছি হে বোন	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১৩	রাগ করবেন না	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১৪	মৃত্যুর বাগিচায়	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১৫	আপনার যা জানতে হবে	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১৬	রামাদান	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১৭	এখনই ফিরে এসো	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১৮	শুধু তাঁরই ইবাদাত	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
১৯	তাওবাতান নাসূহা	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
২০	আল্লাহ প্রেমের সন্ধানে	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
২১	যেভাবে আল্লাহর দিকে ডাকবেন	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক	ধরণ
২২	হতাশ হবেন না [কালার]	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
২৩	হতাশ হবেন না [সাধারণ]	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
২৪	প্রিয় বোন হতাশ হয়ো না	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
২৫	আমি যেভাবে পড়তাম	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
২৬	মুনাফিক চিনবেন যেভাবে	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
২৭	ছোট কাজের বড় ফল	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
২৮	তুমিও পারবে	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
২৯	আল্লাহকে মানুন নিরাপদ থাকুন	ড. আয়েয আল করনী	অনুবাদ
৩০	কী পড়বেন কীভাবে পড়বেন	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩১	নিজে বাঁচুন পরিবার বাঁচান	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩২	এসব গুনাহ হালকা মনে করবেন না	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩৩	তাওবা তো করতে চাই কিন্তু	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩৪	বিলাসিতা করবেন না	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩৫	গাফলতি ছাড়ুন	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩৬	মুনাফিকি পরিহার করুন	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩৭	আসক্তিকে না বলুন	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৩৮	হে আমার মেয়ে	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৩৯	হে আমার ছেলে	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪০	হে আমার যুবক ভাই	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪১	হে আমার মুসলিম ভাই	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪২	যুবকদের বাঁচাও	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪৩	রিযিক নির্ধারিত	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪৪	জান্নাত জাহান্নাম	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪৫	বিয়ে নিয়ে কিছু কথা	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪৬	এ গল্প কোন মানবের নয়	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪৭	ছাত্রদের বলছি	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক	ধরণ
৪৮	আলেম ও খতীবদের প্রতি	ড. আলী তানতাবী	অনুবাদ
৪৯	নারীসমাজের ভুলসংশোধন	মুহাম্মাদ আবদুল আলীম	মৌলিক
৫০	লেখালেখির পহেলা সবক	মুহাম্মাদ আবদুল আলীম	মৌলিক
৫১	ইতিহাসের সূর্যোদয়	মুহাম্মাদ আবদুল আলীম	মৌলিক
৫২	বেদআত ছাড়বেন কেন?	মুফতি আবদুল মালেক	মৌলিক
৫৩	যেভাবে যোগ্য আলেম হবেন	মুফতি আবদুল মালেক	মৌলিক
৫৪	সুদ থেকে বাঁচুন	মুফতি সাইফুল ইসলাম	মৌলিক
৫৫	শুধু তোমার কাছেই সাহায্য চাই	মুফতি সাইফুল ইসলাম	মৌলিক
৫৬	যে আমলে আল্লাহকে পাওয়া যায়	মুফতি সাইফুল ইসলাম	মৌলিক
৫৭	আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ	মুফতি আনোয়ার হোসাইন	সংকলন
৫৮	মোবাইলের ধ্বংসলীলা	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	সংকলন
৫৯	ফেসবুকের ধ্বংসলীলা	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	সংকলন
৬০	ইন্টারনেটের ধ্বংসলীলা	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	সংকলন
৬১	ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেলের ধ্বংসলীলা	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	সংকলন
৬২	যেভাবে আত্মা শুদ্ধ করবেন	ড. নাসির ইবনে সুলাইমান	অনুবাদ
৬৩	আম কারো মেয়ে নই	এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ	অনুবাদ
৬৪	মুসলিম ইতিহাসের সোনালী বিচার	শায়খ আবদুল মালেক	অনুবাদ
৬৫	সাইয়্যেদা খাদিজা (রাঃ)	শায়খ আবদুল মালেক	অনুবাদ
৬৬	সাইয়্যেদা ফাতিমা (রাঃ)	হাকীম আবদুল মাজীদ	অনুবাদ
৬৭	মাকে খুশি করার ১৫০ উপায়	ড. সুলাইমান সাকির	অনুবাদ
৬৮	ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অসিয়ত	ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)	অনুবাদ
৬৯	তুমিও পারবে আরবী ইবারত পড়তে	মাওলানা আবদুর রহিম	মৌলিক
৭০	উর্দু, ফার্সি, আরবি কবিতা	মাওলানা আনোয়ার	সংকলন
৭১	ওরা কাফের কেন?	আল্লামা আনোয়ার শাহ	অনুবাদ
৭২	আল্লাহ ও তাঁর রসূল যাদের অভিশাপ করেছেন	শায়খ দোস্ত মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত	অনুবাদ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক	ধরণ
৭৩	কিতাবুল ফিতান	আল্লামা ইবনে কাসীর	অনুবাদ
৭৪	স্ত্রীকে ভালোবাসুন	মাওলানা দিলাওয়ার	মৌলিক
৭৫	মুখের উপর লাগাম	ইমাম নববী ﵀	অনুবাদ
৭৬	আপনি যখন মা	দুআ আবদুর রউফ	অনুবাদ
৭৭	গল্পের তুলিতে নবীচরিত্র	শায়খ আবদুল মালেক	অনুবাদ
৭৮	ভুল সংশোধনে নবীজির পদ্ধতি	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৭৯	এসো হাদিসের গল্পশুনি	আবু মালেক মুহাম্মাদ	অনুবাদ
৮০	মুসলিম ইতিহাসের সোনালী পাতা	শায়খ আবদুল মালেক	অনুবাদ
৮১	আপনি কি এসব হাদিস পড়েছেন	মুহাম্মাদ আবদুল আলীম	সংকলন
৮২	বাইতুল্লাহর ভাষণ	শায়খ ড. সুদাইস	অনুবাদ
৮৩	হাইয়্যা আলাস সালাহ	ড. মুহাম্মাদ আরিফী	অনুবাদ
৮৪	সৎ কাজের আদেশ করুন	ইবনে তাইমিয়া ﵀	অনুবাদ
৮৫	নেতৃত্বের লোভ করবেন না	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৮৬	অবৈধ প্রেম করবেন না	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৮৭	ঝগড়া বিবাদ করবেন না	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ
৮৮	অহঙ্কার করবেন না	শায়খ সালেহ আলমুনাজ্জিদ	অনুবাদ

বর্তমান আরব জাহানের বিশিষ্ট দাঈ ডক্টর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী। খুব কম বয়সেই তিনি বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে আরব-অনারব সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায়ও তিনি এখন এক নামে পরিচিত।

ডক্টর আরিফীর জন্ম ১৯৭০ সালের ১৬ জুলাই। বংশ পরিচয়ে তিনি ইসলামের বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র উত্তরসূরী। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন দাম্মামে। এরপর সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করেন এবং রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি'র বিষয় ছিল– The Views of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah on Sufism – a Compilation and Study.

মুহাম্মাদ আরিফীর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ, শায়খ আবদুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক প্রমুখ। তিনি ইলমে ফেকাহ ও ইলমে তাফসীর শিক্ষা করেন শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহ.-এর কাছে। ইবনে বায রহ.-এর সোহবতে তিনি প্রায় পনেরো/ষোলো বছর থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ডক্টর আরিফী জীবনের মূল কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'কে। এই লক্ষে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে থাকেন। এরপরও তিনি রাজধানী রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং আল-বাওয়ারদী জামে মসজিদের খতীব। শুক্রবার জুমার সময় তাঁর মসজিদে তিল ধারণের ঠায় থাকে না।

ডক্টর আরিফী দাওয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য। একইভাবে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইসলামী অর্গানাইজেশনেরও মেম্বার। এসূত্রে রাবেতা আলমে ইসলামী ও বিশ্ব মুসলিম উলামা ঐক্য পরিষদে তাঁর সদস্যপদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুসাহিত্যিক ডক্টর আরিফী একজন সুবক্তা। তাঁর বক্তৃতার কয়েক ডজন অডিও-ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে মুসলিম সমাজ অনেক উপকৃত হচ্ছে।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞ আলেম প্রায় বিশ/পঁচিশটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি বিক্রির বেলায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তবে বক্ষমাণ পুস্তকটি তাঁর অন্যান্য বইয়ের রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে। দুনিয়ার অনেক ভাষায় অনূদিতও হয়েছে এই বইটি।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।

رِحْلَةُ حَيَاةٍ

باللغـة البنغاليّـة

অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করতে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই। অতীত ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে শিক্ষণীয় হাজারো বিষয়ের উপস্থিতি। এ ক্ষেত্রে কোরআনের চেয়ে উত্তম কোনো গ্রন্থ নেই। কারণ, এটি কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা একমাত্র মুজিযা। এতে উল্লিখিত পূর্বেকার জাতিপুঞ্জের ঘটনাবলিতে রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ রাসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়। [সূরা ইউসুফ : ১১১]

আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করেন–

> এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। [সূরা তা হা : ৯৯]

ঘটনা বলার পেছনে উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কোনো পাপের কাজ বর্জন করে, আল্লাহ তাকে এরচেয়েও উত্তম বিনিময় দান করেন। বর্তমানে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া খুবই সহজ। সর্বত্র অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। এই ফেতনা এখন মহামারির আকার ধারণ করেছে। সুতরাং, পাপের এই অবারিত সুযোগ পেয়েও যে আল্লাহর ভয়ে নিজেকে এসব থেকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

978-984-90011-0-1
978-984-90011-0-1

বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত